মানুকে
যেটা আমাকে সব চেয়ে বেশি জ্বালায়,
আর যেটাকে অনেক বেশি
ভালবাসি।

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

গল্প সংকলন ঃ অগ্নি-স্বাক্ষরা

উপন্যাস ঃ ঘর-ভাঙা-ঘর, উত্তর পুরুষ, রক্তের অক্ষর, বং থেকে বাংলা শিলায় শিলায় আগুন, অরণ্যের কাছে, অলিখিত উপাখ্যান, ধবল জ্যোৎস্না।

প্রকাশনার অপেক্ষায় অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

উপন্যাস ঃ একাল চিরকাল, একটি ফুলের জন্য, সেই অরণ্যে, রমণী তোমার নাম ভালবাসা, ঝড়ের মুখোমুখী, প্রেম আমার প্রেম, শুধু তোমাদের জন্য।

গল্প সংকলন ঃ স্বনির্বাচিত গল্প।

কিশোর গ্রন্থ ঃ

কাব্যোপন্যাস ঃ টুনটুনির বন্ধুরা।

কিশোর নাটক ঃ আমরা সবাই রাজা।

কাব্যগ্রন্থ ঃ রিজিয়া রহমানের কবিতা।

মংলা ছড়ির চা বাগানের বড় বড় গাছগুলোর ওপর এখন বেশ বড় একটা চাঁদ। একটু কালচে মরা আলো হলেও জ্যোৎস্নাটা মন্দ ফোটেনি। চাপলাইশ মালাক্কা আর লুবেক গাছের ভূতুড়ে চেহারায় নরম আলো। পুরোন কুলি লাইন ক্লান্ত নেশাখোরের মত ঝিম মেরে আছে। অর্জুনের বাড়ির পেছনের জমিতে মোটা গলায় ব্যাঙ ডাকছে অনেকগুলো। হরিয়া চাটাইর ওপর শুয়ে বালিশের তলা থেকে আধ পোড়া বিড়ি আর ম্যাচ বের করল। বিড়িটা ধরাল. মুণ্ডাপাড়ার ভুলু আজ ম্যাচটা দিয়েছে। ভুলু বাগানের পাতা তোলার কুলির কাজে নাম লিখিয়েছে। তিন টাকা রোজ পায়। হরিয়ার এখনও কুলির খাতায় নাম ওঠেনি। মুলি-বাঁশের বেড়ার সরু সরু ফাঁক গলিয়ে কিছু চাঁদনী ঘরটাকে আলো দিয়েছে। হরিয়া পুবের ভাঙা বেড়া দিয়ে বাইরে তাকাল। সারাটা পৃথিবী শুনসান্। কৃষ্ণ-পক্ষের দুঃখ দুঃখ জ্যোৎস্নায় ভারি মন খারাপ করা রাত। ছাগলের চোনা আর নাদার গন্ধে ঘরের বাতাসটা ভারি। হরিয়া বিড়িটা কয়েক টান দিয়ে নিভিয়ে ফেলল। ঘরের কোণে ছাগলগুলো একবার হুটোপুটি করল। হরিয়া আস্তে ধমক দিল—এইও. র. র. ঝামেলা করিস না।

সন্ধ্যায় একটু ঝড় ঝাপটা হয়েছে। এখন বেশ শীত শীত করছে। পায়ের কাছ থেকে ছেঁড়া দোলাইখানা তুলে শরীরে জড়াল হরিয়া। শালার ঘুমটা যেন বাগান পালান কুলির মত কোথায় গিয়ে লুকিয়ে আছে। কিছুতেই বুঝি আর ফিরে আসবে না। অথচ ভোরের আলো ফুটবার আগেই হরিয়াকে কাজে যেতে হবে। বাইরে আবছা একটু হাওয়া উঠল। পাশের চালায় বিষ্ণুকাকার শুয়োরগুলো থেকে থেকে ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করছে। ঘুম আসবে কি! হরিয়ার পেটের মধ্যে বিশ্রী খিদের মোচড় থেকে থেকে পাক দিচ্ছে। অর্জুন কাকার বউ চণ্ডলা সন্ধ্যায় একটা রুটি আর লবণ গোলা রং চা দিয়েছিল হরিয়াকে খেতে। সে তো কখন হজম হয়ে গেছে। পাজী এই খিদেটাই তাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না। হরিয়ার মা বাবা কেউ নেই। দুবোন ছিল। বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা এখানে থাকে না। একজন বালি-শিরা আর একজন রাজঘাট বাগানে কাজ করে। দুর্গাপুজোর সময় হরিয়া বোনদের কাছে যায়। ভাল মন্দ খায়। যাত্রা দেখে, ফুর্তি করে, তারপর

ফিরে আসে। বড় বোন বলেছে আর ক'টা দিন গেলে হয় তো হরিয়া পাতা তোলার খাতায় নাম লেখাতে পারবে। বাইরের কুলিদের আবার সব সময় সব বাগানে কাজে নেয় না। অথচ এ বাগানে হরিয়া এখনও কাজ পায় নি। হরিয়ার বয়স চৌদ্দ। হরিয়ার বয়সের অনেক ছেলেমেয়েই পাতা তেলার কাজ করে। কিন্তু হরিয়ার তেমন মুরুব্বী কোথায় যে পাতা তোলার নবিশীতে ভর্তি করে দেবে। চিনাবাবুর কাছে যেতে যা ভয় পায় সে। হরিয়ার অল্প অল্প মনে পড়ে মা যখন বাগানে পাতা তুলত মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে যেত হরিয়া। মা দ্রুত হাতে পাতা তুলত। হরিয়া একটু দূরে বসে দ্রুত ছন্দে পাতা তোলা হাতগুলোর দিকে তাকিয়ে আপন মনে গুন্ গুন্ করত, এক কুঁড়ি, দো পাত্তি ঢাই পাত্তি। মায়েদের অনুকরণে নাজুনী লতার নয় তো ঘাসের পাতা ছিঁড়ত ছোট্ট হাতে। খুব সাবধানী সতর্কতায় নিজেকে সর্দারের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখত। সর্দারকে ভারি ভয় পেত তখন হরিয়া। কাজের সময় বাচ্চা-কাচ্চারা বাগানে ঘোরাঘুরি করলে সর্দার ক্ষেপে উঠে গালাগাল দিত কামিনদের। সর্দার একটু দূরে গেলেই হরিয়া চা গাছের ঝোপ ঠেলে মায়ের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াত- এ মা। ভোক লাগছে।

মা এদিক ওদিক তাকিয়ে মাথার পোটলা থেকে এক মুঠো চাল ভাজা গুজে দিত হরিয়ার হাতে। বলত -যা, যা, লাইনে যা, সর্দার দেখলে মারবে।

সর্দারদের অবশ্য এখন আর অত ভয় পায় না হরিয়া। এ পাড়ার সর্দারের একটা গরু থাকে তার তত্ত্বাবধানে। এ লাইনের অনেকগুলো গরুর রাখালী করে সে। ভোরে উঠে গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, ফুলছড়ি বাগানের পেছনের জংগলে। সারাদিন গরু চরায়। একটি নারী কণ্ঠের ঝংকার আছড়ে পড়ল রাত্রির নিস্তব্ধতায়- হামাক মারবি কেনে তুই! সরম করে না?

কণ্ঠটা বিন্দিয়ার। হরিয়া বুঝল বিন্দিয়ার স্বামী রাজিন্দর এখন বাড়ি ফিরেছে। তলবের দিন তো ও বাড়িতেই ফেরে না। পড়ে থাকে পাট্টায়। অন্যদিনও বেশি রাতে টলমল পায় বাড়ি ফেরে। কমলীর ঘরের চুয়ানী খেয়ে নেশা করে আধ রাত কাটায়। কমলীর নামে জ্বলে ওঠে বিন্দিয়া। এই নিয়ে রোজ রাতে ওদের ঝগড়া। মারপিট। রাজিন্দর বিন্দিয়াকে পেটায়। মুখ খারাপ করে গালি দেয়, ঘরের থালা বাসন আছড়ায়। বিন্দিয়া ছাড়ে না। চিল চিৎকারে রাজিন্দরের চৌদ্দ গুষ্ঠীর বাপান্ত করে। পঞ্চায়েতে নালিশ দেবার শপথ করে শ'বার। ব্যস, এই পর্যন্তই। পরদিন সকালে দু'জনেই ভাল মানুষ। যেন কোনকালে ওদের মধ্যে ঝগড়া মারপিট হয় নি। বিন্দিয়া দ্রুত হাতে সকালের ঘরের

দোকান খুইয়ে সর্বস্বান্ত হল। রামচন্দরের লাশটা পাওয়া গেল একদিন দোলাই বাগানের ধারে। কিসের নেশায় রুগ্ন শরীর নিয়ে সে বগানে রওয়ানা দিয়েছিল। রাতের বেলা একা একা। পথে জঙ্গলে কি এক বুনো জন্তু আঁচড়ে কামড়ে তার মুখের মাংস খুবলে নিয়েছে। সবাই বলে বাগানের দেবতার শাপ লেগেছিল রামচন্দরের।

বিষ্ণু আর অর্জুন কুলি লাইনে এসে উঠল। বিষ্ণু বলল--এবার যে কি কারবার হল। আকাশ তো জল ঢালছে না। কুলিদের অবস্থাটা ভেবে দেখ। অনেক কুলিই তো ছাঁটাই হয়ে বসে আছে। যারা কাজ করছে তাদের তো বাধা চার টাকা পাঁচ পয়সা রোজের কাজ। সব পাড়াতেই অভাব। মহাজন ফয়েজ আলীর পোয়া বারো। পুরো হফ্তাই প্রায় সবার চলে যাচ্ছে ওর বাক্সয়।

অর্জুন তিক্ত হাসল—মহাজনের সুদিন কবেই বা না বল! শালা একটা কুমীর। ওকে ধরে যদি একদিন ভাটি ঘরের চুলোয় ভরে দিতে পারতাম।

বিষ্ণু আবার বিরক্ত হল- তুই একটা বিগড়া লোক। ফয়েজ আলী আছে বলেই না কুলিরা এই দুর্দিনে খেয়ে পরে বাঁচছে। বাগানের পাতা আর মহাজনই তো কুলিদের বাঁচিয়ে রাখে।

অর্জুন মৃদু হাসল—তা বটে। কুলিরা মহাজনের ধার মাথায় নিয়ে জন্মায়। আবার ধার নিয়েই মরে:

বিষ্ণু খুব জোরে হেসে উঠল-তুই শালা কথা বলতে পারিস খুব ভাল। একেবারে লিখা পড়া আদমীর মত।

বিষ্ণুর খোশ মেজাজটির সুযোগ নিয়ে এবার অর্জুন বলল বিষ্ণু দাদা! শুনলাম তোমার গরু হারিয়েছে বলে হরিয়ার নামে পঞ্চায়েতে নালিশ দিচ্ছ?

বিষ্ণু ক্ষেপে উঠল- আর বলিস না। কত ভাল গরুটা আমার। ওর দাম আদায় না করে আমি ছাড়ছি না।

—শোন বিষ্ণু দাদা। নালিশটা তুমি তুলে নাও। না খেতে পাওয়া রাখাল হরিয়া কোথা থেকে দেবে তোমার গরুর দাম। তুলে নাও দাদা। তুলে নাও।

বিষ্ণু রেগে উঠল -কেন তুলে নেব! পয়সা লাগে নি গরু কিনতে?

—সে তো লাগবেই। গরু হারানর জন্য পঞ্চায়েত ডেকেছে কেউ কোনদিন বাগানে বল তুমি?

বিষ্ণু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল. তারপর বলল—আমার গরু হারিয়েছে, যা করতে হয় আমি করব। তোর মাথা ঘামাতে হবে না। যা কামে যা।

বিষ্ণু তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কারখানার সামনে কুলিরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। গুন্‌তির টাইম এ বাগানে সকাল আটায়। অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার আজকের কাজের বিবরণ জানিয়ে দিয়েছে টিলাবাবুকে। টিলাবাবুর কাছ থেকে শুনে নিয়ে চৌকিদার হাঁকছে—চঞ্চলা-হরমতী-বিন্দিয়া—পাত্‌ি—তোলা সরদার শিউরাম বাইশ লম্বর মোকাম। —বাইশ লম্বর। বাইশ ল বর।

চৌকিদারের হাঁক চলতে থাকল। অনেকেই এর মধ্যে এসে পেঁছিল। রাজিন্দর বিষ্ণু—ভাটিঘর—।

চৌকিদার হাঁকতে লাগল...অর্জুন...রুকমিনি...নিতাই...চালনী...তে...।

চারাবাড়ী...। রংঘর...

হাঁক শেষ হল অল্পক্ষণের মধ্যেই। যার যার সর্দারের খবরদারিতে নিজ নিজ এলাকায় কাজে চলে গেল সবাই।

শিউরাম তার অধীনের মেয়েদের নিয়ে চলে এল বাইশ নম্বর মোকামে। বাইশ নম্বর মোকামে পাতা তোলা চলছে। শেষ চৈত্রের রৌদ্রের যেন কোন রাগী সাহেবের মেজাজের ঝাঁঝ। তবু এই বিরাট বিশাল চা বাগান শেড-ট্রির ছায়ার আশ্রয়ে স্নিগ্ধ। মাঝে মাঝে এক আধ ঝলক হাওয়ার ঝাপটায় টুপটাপ করে মালখানা গাছের ফুল ঝরছে। ফাঁড়িগুলোতে এখন প্রায় কাজ বন্ধ। শুধু কয়েকটি মোকামে পাতা তুলছে কামিনেরা। অনেকে কাজ করছে নার্সারীতে আর সীডবাড়িতে। চঞ্চলা পাতা তুলছে বাইশ নম্বর মোকামে। চঞ্চলাদের দলে পঞ্চাশজন কামিন। সেই সকাল আটটা থেকে পাতা তুলছে সবাই। এখন তো প্রায় দুপুরের ছুটির সময় হয়ে এল। মালখানা আর লুবেক গাছের পাতার আড়াল ছিঁড়ে হলুদ রঙের তীরের মত ছিটকে এসে পড়া আলো দেখে চঞ্চলা অনুমান করতে পারছে বেলা এখন প্রায় বারোটা। চঞ্চলার কাছ থেকে একটু দূরে কোমর পর্যন্ত চায়ের জংগলে ডুবিয়ে পাতা তুলছে মাদ্রাজী মেয়ে শ্রীমতী। শ্রীমতীর ঝকঝকে ছাপা শাড়ি আঁট করে বাঁধা খোঁপার ফুলে তাকিয়ে বিন্দিয়া আস্তে একবার বলেছিল—ঢেমনিটার রং দেখলে গা জ্বলে। এমন বাহার করে বাগানে আসে যেন ফাগুয়ার পরবের নাচ চলেছে।

চঞ্চলা বিন্দিয়ার মন্তব্যের জবাব দেয় নি। এখন তাকিয়ে দেখল পানিওয়ালা বৃন্দাবন ছত্রির সঙ্গে রসের কথায় বার বার খিল খিল করে হেসে উঠছে শ্রীমতী। বৃন্দাবন পানি নিয়ে বসেছে বাগানের ধারে অনেকক্ষণ। অথচ ঘণ্টাখানেক আগেও যখন রজর মা পাতা তুলতে তুলতে ডাকছিল—ও বিন্দা! পানি দিয়ে যা।

বৃন্দাবন তখন ঝাঁঝাল উত্তর দিয়েছে- তোর এত ঘন ঘন পিয়াস লাগে কেন রে? দুটো গাছ না ছাড়াতেই গলা শুকায়।

রজর মা শুকনো লম্বা শ্রীহীন মেয়েমানুষ! যৌবন বিদায় জানিয়েছে অনেক দিন। কিছুদিন আগে ওর একটা বেমার হয়েছিল। এখন দাঁড়িয়ে পাতা তুলতে ওর মুখ শুকিয়ে ওঠে অল্পতেই। বার বার জল পিপাসা পায়। রজর মা চটে গিয়ে জবাব দিয়েছিল--ছত্রিবাবু! তুই তো আরামের কাম করিস, সারাটা দিন দাঁড়িয়ে পাতা তুলতে হলে বুঝিত।

কথা বাড়ায় নি রজর মা। ছত্রিরা কুলিদের মধ্যে কুলীন শ্রেষ্ঠ জাত। একমাত্র ছত্রিদের হাতের ছোঁয়া সব জাতে খায়। বাগানে পানি বিলির কাজটা তাই ছত্রিদের একচেটিয়া। তাছাড়া সমাজে, পঞ্চায়েতে ওরা মাতবর। ছত্রিদের সহজে কেউ চটায় না। পুজোর ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের পরই ছত্রিদের সম্মান। বৃন্দাবন কিন্তু ঝাঁঝিয়েই বলছে---বাগানে পা না দিতেই সব পানি পানি করে বুক ফাটাচ্ছিস। কলে পানি এলে তবে তো পানি দেব।

বিন্দিয়া চঞ্চলারা যেখানে পাতা তুলছে তার পাশেই একটা কল আছে। টিউবওয়েল নয়। যেমন থাকে সাহেবদের বাংলায়, কারখানায় তেমন। বিন্দিয়া ছেড়ে কথা বলবার মেয়ে নয়। ছত্রি পানিওয়ালার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে বলেছে মুখপোড়া। গিজড়া (বাচাল)।

লছমী সতর্ক চোখে চারিদিকে তাকিয়ে বলেছে- চুপ, চুপ, সর্দার শুনবে।

মুখ ঝাড়া দিয়েছে বিন্দিয়া -শুনুক, শুনল তো আমার কি হল। সত্যি কথা বলব না তাই বলে! ওই ঢেমীন শ্রীমতীটাকে খুশি রাখতেই ও পেরেশান। এমন কি সর্দারটা পর্যন্ত।

রাগের ঝাঁঝে বিন্দিয়া আরো দ্রুত হাতে পাতা ছিঁড়তে লাগল। সর্দার ডরিস গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁতে খৈন টিপছে। খরগোশের মত দ্রুত সতর্ক দৃষ্টি তার। চেঁচিয়ে উঠল -হেইও বিন্দিয়া, ক' পাত্তি তুলছিস তুই? লজর দে। হাতে লজর দে। কামে মন দে।

বিন্দিয়া হাত সংযত করল। চোখের আগুন সর্দারের দিকে ছিটিয়ে বলল হামি কি করবেক। গাছে তো পাত্তিই নাই।

সর্দার শিউরাম ধমকে উঠেছে বড় জিভের ধার তোর রেন্ডী।

কিন্তু এ মোকামের সব কামিন তো চোখ বন্ধ করে বসে নেই। যদিও তাদের দ্রুত সঞ্চালিত হাত আর চোখের দৃষ্টি গাছের পাতায় নিবদ্ধ। তাই বলে কানও কি তাদের কালা হয়ে গেছে না কি? তারা কি দেখছে না সর্দার শিউরাম কাজ তদারকী উছিলায় শ্রীমতীর আশে পাশেই ঘুর-

ঘুর করছে। আর ছত্রিটা তাতে উঁচু হলে কি হবে। শ্রীমতী একবার মুখ দিয়ে পানি উচ্চারণ করতেই বৃন্দাবন পাড়ি মরি করে শ্রীমতীকে পানি খাওয়াতে ছুটছে। এখন শ্রীমতীর হাসির ঠমকে সারাটা বাগানে যেন ঢেউ উঠছে। চঞ্চলার চোখে ক'দিন আগে দেখা একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। সন্ধ্যায় কারখানা থেকে ঝুড়ি নিয়ে ফিরছিল চঞ্চলা। পাঁচ নম্বর মোকাম ছাড়িয়ে সীড বাড়ির ধারে থেমে পড়তে হয়েছিল তাকে। বীজ তোলার দীর্ঘ লম্বা চা গাছগুলোর নিচে রাজু আর শ্রীমতী খুব মাতোয়ারা হাসি হাসছিল। তলবের দিন তো ছিল না সেটা যে দু'জন পাট্টা থেকে নেশা নিয়ে ফিরেছে। অথচ ওরা কি এক নেশায় ডুবে ছিল। চা-ফুলের মিষ্টি গন্ধমাখা বাতাসটা বার বার কেঁপে উঠছিল শ্রীমতীর নেশাল হাসিতে। চঞ্চলা দ্রুত ছাড়িয়ে গেছে দৃশ্যটাকে। রাজুটা মরেছে। এর আগে কত ঘটাপটা করে শ্রীমতী সুরেশের ঘরে গিয়ে উঠেছিল সেটা কি জানে না রাজু। এদিকে রাজুর মা ওদের পাড়ার মুরলীকে রাজুর বউ করে ঘরে নেবার জন্য কথা বার্তা চালাচ্ছে। চঞ্চলা এখন শ্রীমতীর দিকে তাকাল। চিরল চিরল রোদের ফালি ওর বুকে মুখে ফাগুয়ার রঙের মত ছোপ ধরিয়েছে। শ্রীমতীর টান টান কাল মসৃণ চামড়া যেন ঝলক দিচ্ছে। এতটা বেলা পাতা তুলেও শ্রীমতীর খোঁপার ফুল মুখের হাসি একটুও ম্লান হয় নি। সাদা ঝকঝকে দাঁতে ঝিলিক তুলে ভারি চমৎকার হাসে ও। সবাই বলে শ্রীমতীর শরীরে নয় যাদু আছে ওর হাসিতে। ওই হাসি শুনেই সব মরদগুলো নেশাল হয়ে ওঠে। পাগল হয়। ছত্রি বৃন্দাবন শ্রীমতীর কাছ থেকে সরে যেতে চঞ্চলা বলল কারখানা ঘর থেকে গাড়ি বেরিয়েছে না কি রে শ্রীমতী?

শ্রীমতী একবার রোদের দিকে আর একবার বাগানের বুক চিরে বেরিয়ে যাওয়া সড়কটার প্রান্তে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল-- না চঞ্চলা দিদি।

নতুন একটা গাছ ধরল চঞ্চলা। আঙুলের ডগাগুলো অসাড় হয়ে এসেছে। আঙুলের ডগা অসাড় হলেই চঞ্চলা বুঝতে পারে দুপুরের ছুটির সময় হয়ে গেছে। ক্লান্ত আঙুলে পাতা ছিঁড়তে লাগল চঞ্চলা। হঠাৎ দেখল আঙুলের ডগা ফেটে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। কচি চা পাতা ছিঁড়ে কাটা আঙুলে গাছের কষ ঘসে দিল চঞ্চলা। চা পাতার কষে রক্ত বন্ধ হয়। আঙুলগুলো ভীষণ জ্বলছে চঞ্চলার। মুখ তুলে দুপুরের আকাশ দেখল সে। বলল ছুট্টির টাইম তো হয়ে গেছে, গাড়ি আসছে না কেন?

ওধার থেকে বিন্দিয়া বিদ্রূপ ঝরাল---চিন্তা করিস না। এ মোকামে সবচেয়ে আগে আসবে গাড়ি।

কথা শেষ করে অপাঙ্গে একবার শ্রীমতীকে দেখে নিয়ে অর্থপূর্ণ হাসল বিন্দিয়া। অবশ্য হাসির কারণ আছে। পাতা টানবার গাড়িটায় ড্রাইভার রাজু। বিন্দিয়ার খোঁচা গায় মাখল না শ্রীমতী।

রজব মায়ের কোমর টন টন করছে। গাছের ছায়া থাকা সত্ত্বেও গলা বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। দূরের বাগান একটা সবুজ আয়নার মত চোখে ধাঁধা লাগাচ্ছে। চোখের দৃষ্টিটা নিষ্ঠুর সবুজে কেমন অন্ধ হয়ে আসছে। সর্দার হুশিয়ারী ছাড়ল- হে রজ কি মাই! কি হৈল বা? মালখানা গাছের মত দুলছিস কেন? হাত চালা।

ঝাপসা দৃষ্টিটা পাতা ধরা হাতের উলটো পিঠে মুছল রজর মা। দুর্বল কণ্ঠে বলল- গাড়ি কেনে আসে নাই রে? পা দুটো যে আর খাড়া থাকছে না।

লছমী করকর করে উঠল একটু দূর থেকে পাও টলছে তো কামে কেনে আসিস? সিক্‌মালের (সিকম্যানের) ছুটি নিয়ে বসে থাকলেই তো পারিস। ডাক্তর বাবু চিঠ্ লিখ্‌খে দিবে আর বসে বসে তিন রুপিয়া পাবি। রজর মার দুর্বল কণ্ঠ একটু সবল হল--তুহাদের কি! মরদ আছে। বেটা আছে। এখন কি বুঝবি। তিন রুপেয়ায় এদিনে কারো চলে। বুড়োকে কি খাওয়াব। আর আমি কি খাব! তাগদ তো আমাদেরও একদিন ছিল। এমন গরম কথা বলি নাই। হাতের যওয়ানকী তোদের একদিন যাব ভগওয়ানের ইচ্ছায়।

রজর মার কথা শেষ হল না। লছমী দ্রুত হাতে ছেঁড়া পাতাগুলো ঝুড়িতে ছুঁড়ে দিয়ে চা গাছের ঝোপ ঠেলে তেড়ে এল--কেড়ে মকে গালি দেউচি রে বুড়িয়া হারামী! রাগে লছমী বাগানী বুলি ছেড়ে নিজের বুলি বলতে শুরু করেছে।

সবাই সচকিত হল। লছমীর স্বভাব সকলের জানা। এখুনি হয় তো রজর মার সঙ্গে একটা লংকাকাণ্ড বাধিয়ে বসবে। শিউরাম কর্তব্য তৎপর হয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে এল--এই রেণ্ডীরা.. চুপ সব।

ঠিক তখনি দূরে বোলতার গুঞ্জনের মত শব্দ ধ্বনিত হল। কামিনদের মুখে যেন এক ঝলক খুশি রোদ এসে পড়ল। সবাই প্রায় বলে উঠল গাড়ি আসছে। গাড়ি আসছে।

শ্রীমতী দ্রুত হাতে শাড়ির আঁচলে মুখ মুছল। খোঁপাটা ঠিকঠাক করল। পেছনে ভ্যান লাগান হলুদ ট্রাকটরের শরীরটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল গাড় পালার আড়ালে। শিউরাম ছড়ি বগলে নিয়ে হাঁক ছাড়ল লাইন কর সব। লাইন কর। গাড়ি এসে গেছে।

সারিবদ্ধ কামিনরা ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাগান থেকে বাগানের ঢাল থেকে

রাস্তায় নেমে এল। এতক্ষণে প্রায় নীরব কর্মমগ্ন বাগানটা নারী কণ্ঠের বিচিত্র কলধ্বনিতে সজীব হয়ে উঠল।

তিন রাস্তার মোড়ে একটা টুল পেতে টিলাবাবু বসেছে। ওদিককার সেকশানগুলোর পাতা নিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ তুলে বিরাট গাড়িটা এসে থামল। এখানে ছায়া নেই। চড়বড়ে রোদে শরীর জ্বালা ধরছে। টিলাবাবু ওজন লিখবার খাতা দিয়ে কয়েকবার মুখে বাতাস দিল। পাতা ওজন করবার মেশিনে তাকিয়ে তাড়া দিল—কই রে কালুয়া, ঝুড়ি বসা।

তিন দিকের বাগান থেকে কামিনরা নেমে এসে লাইন করে দাঁড়িয়েছে। কালু বলল বাবু সর্দারদের তো এখনও পাত্তি বাছাই হয় নি।

বিশ্রী রোদে টিলাবাবুর মেজাজ খারাপ লাগছিল। তার ওপর আজ অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার সকালে এক চোট মেজাজ ঝেড়েছেন। বাগানে পাত্তি উঠছে না। ম্যানেজার থেকে শুরু করে সবাইর মেজাজ মর্জি খারাপ। কাজ নেই বলে কিছু কুলি ছাঁটাই হয়ে বসে আছে। প্রডাকশন কম। পাঁচ সের পাতার বদলেও বাঁধা রেটের পয়সা দিতে হচ্ছে। ম্যানেজার সাহেব তো ক্ষেপেই আছেন, সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের আফিসে গিয়ে কাল সারাদিন মিটিং করেছেন। শিঘ্রি না কি বিলেত থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসছেন। ওদিকে আবার গোদের ওপর বিষফোড়া। ছ'নম্বর সেকশনে বুশগুলো হলুদ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে।

তিন জন সর্দার মিলে ঝুড়িগুলোর পাতা উলটে পালটে দেখছে। এখন অবশ্য আড়াই পাত্তি কমই উঠছে। তবু মোটা পাকা পাতা শক্ত ডাটাগুলো দেখে বেছে ফেলে না দিলে কারখানা ঘরে ঝামেলা হবে। চালনীতে চালবার সময় অর্ধেক পাতাই বাতিল হয়ে যাবে। জবাবদিহি করতে হবে সর্দারদের। শিউরাম লছমীর ঝুড়িতে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আরে লছমী। তুই দেখি সব চার পাঁচ পাত্তি করে তুলেছিস। খাবলা খাবলা পাতা এলোপাথাড়ি তুলে দিলেই হল? এদিকে তলব নেবার বেলা তো কমতি নেই।

টিলাবাবুর সামনে কণ্ঠের পুরো ঝাঁঝ ছাড়ল না লছমী। তবু করকরে গলায় বলল খালি আমার ঝুড়ির দোষ হল! কার ঝুড়িতে চাই পাত্তি আছে শুধু দেখাও দেখি।

শ্রীমতীর ঝুড়ির পাতায় আলগা হাত চালিয়ে বিন্দিয়ার ঝুড়ি ধরল শিউরাম- এই বিন্দিয়া তুই দেখছি মোটা পাত্তি দিয়ে ঝুড়ি ভরে ফেলেছিস।

লছমী চঞ্চলার কানের কাছে ফিস ফিস করল দেখলি তো সর্দারের

কান্ডটা। শ্রীমতীর ঝুড়িতে শুধু হাত বুলিয়েই গেল। যত চোটপাট আমাদের সঙ্গে।

কালু বাছাই হয়ে যাওয়া ঝুড়িগুলো মাপের মেশিনে বসাতে শুরু করেছে। ...বিনি...দশ সের...চঞ্চলা...পনের। লছমী...বারো। শ্রীমতী ...পনের।

টিলাবাবু খাতার নামের পাশে পরিমাণ লিখতে লাগল মাথা নীচু করে। দেশোয়ালী পাড়ার হরমতীকে নিয়ে একটা গোলমাল লাগায় টিলাবাবু মুখ তুলল। কালু হৈ চৈ করে উঠল বাবু হরমতী বস্তায় করে পাতা তুলেছে। টিলাবাবু কড়া চোখে হরমতীকে দেখল। লম্বা পাঁজর সর্বস্ব হরমতীর ন্যাকড়া পরা শরীরে চোখ রেখে টিলাবাবু ধমকে উঠল কি রে! ঝুড়ি কি হল তোর?

পানের ছোপ ধরা বড় বড় দাঁতের হরমতীর মুখ শুকিয়ে উঠল হারাইয়া গেছে রে বাবু। সরদারকে তো সকালেই বললাম রে হামি। যে হামার ঝুড়ি হারাইয়া গেছে।

ধমক দিয়ে হরমতীকে থামাল টিলাবাবু এই নিয়ে ক'বার ঝুড়ি হারাল তোর?

মুখ কাচুমাচু করল হরমতী কি করব হামি। কাল বাগান থেকে ফিরবার পথে লাকড়ী টোকাইতে গেলাম। তুফান আইল। টোকরিটা গাছের ধারে থুইয়ে গেছি। কে লিয়ে গেল কামনে বলব বাবু!

টিলাবাবু কিছু বলবার আগেই কালু বলে উঠল - তিনবার ঝুড়ি হারাইল রেন্ডীটা। ও আসলে ঝুড়ি বেঁচিয়া দেয় বাবু!

বিগত যৌবনা শ্রীহীনা হরমতী মুখরা হয়ে তেড়ে উঠল কালুর ওপর - তুই কেনে কথা বলিস রে ড্যাকরা। হামি তো টিলাবাবুর লগে নালিশ করছি।

পেছন থেকে কে বলল- ও তো ঝুড়ি বেঁচে চাল কিনে আনে।

হরমতী গলা তুলে চেঁচিয়ে উঠল- দেখেছিস তোরা? ভগওয়ান তোদের চোখ আন্ধা করুক। মা বিষহরির শাপ লাগুক তোদের বালবাচ্চার ওপর। কেন আমার পিছে লাগতে আসিস তোরা?

সর্দার চেঁচিয়ে উঠল - হৈ হরমতী। চুপ হো যা। গোলমাল লাগাবি না।

টিলাবাবু বলল কালুয়া। ওর বস্তাটা মাপের মেশিনে বসা। তারপর হরমতীর দিকে তাকিয়ে বলল-- আজকের রোজ কাটা যাবে তোর। মাগী তুই ভারি চালাকি পেয়েছিস।

হরমতী হাউমাউ সোর তুলে টিলাবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ল হেই

বাবু। রোজ কাটিস না হামার। রোজ কাটলে হামি খাবেক কি। মহাজনের পয়সা দিতে পারব না। মা কালীর দিব্যি বাবু, কাল আমি ঝুড়ি বেচি নাই। জোরে বাতাস উঠল, কোথায় উড়ায়ে লিয়ে গেল ঝুড়িটা। সারা সকাল তালাশ করলাম বাবু। হেই বাবু। তোর পাও ধরি। হামাকে মাফ করে দে বাবু।

টিলাবাবু বিরক্ত হয়ে উঠল সর মাগী। হফতা নেবার সময় বড়বাবুকে বলিস। তা না হলে ঝুড়ি কিনে আনবি। ফ্যাক্টরীতে কি ঝুড়ির হরিলুঠ লেগেছে যে রোজ তোকে ঝুড়ি দেবে।

হরমতীকে সরিয়ে রজর মার ঝুড়ি বসাল কালু। চেঁচিয়ে বলল- বিশ সের

টিলাবাবু খাতা থেকে চমকে দৃষ্টি তুলল- বি- শ সের!

ওজনের কাঁটা থেকে চোখ সরিয়ে চোখ কুচকে রজর মাকে দেখল টিলাবাবু। কালকেও তো রজর মা সারা দুপুরে পাতা তুলেছে মাত্র দু সের। পাতা তুলবার ক্ষমতা কার কত তা টিলাবাবুর নখদর্পণে। এমন কি সীজনের সময় বাড়তি কমিশনের আশায় কে কতটা পাতা তুলতে পারে সেটাও তার এক রকম মুখস্থ। রজর মা লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো গরুর মত টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। ওর ঘর্মাক্ত চিটচিটে কালো মুখটায় তাকিয়ে টিলাবাবু বলল কি রে আজ কি লেক কাট মেশিন হয়ে গেছিস না কি? একেবারে দু সের থেকে বিশ সেরে উঠে গেছিস।

রজর মাকে কাল হুঁশিয়ার করেছিল টিলাবাবু। বলেছিল 'এমন এক পোয়া দেড়পোয়া পাতা তুললে আগামী তলবের পর তোকে ছাঁটাই করে দেব।' এখন ঘর্মাক্ত ক্লান্ত মুখটায় বেপরোয়া ঝামটা দিল রজর মা- মেশিনে যে হিসাব উঠবে তাই ঠিক, হামাকে কেনে ডাটছিস বাবু।

টিলা বাবু উঠে এসে রজর মার ঝুড়িটা হাতে তুলে নীচে নামাল। বলল--কালুয়া। ওর ঝুড়িটা ভাল করে চেক কর তো।

রজর মা কিছুটা ভয় পাওয়া কণ্ঠে চেঁচিয়ে বাধা দিল আবার কেন চেক করবি রে বাবু? সর্দার তো চেক করেই দিয়েছে।

রজর মার কথায় কান না দিয়ে কালু ঝুড়ির ভেতর হাত ডুবিয়ে দিল। টেনে বের করল ভাঙ্গা থান ইটের টুকরো আর মাটির ঢেলা। অভুক্ত রুগ্ন রজর মার পা দুটো কাঁপছিল। চোখের সামনে চায়ের বাগান ঝাপসা হয়ে গেল। হঠাৎ গোড়া ক্ষয় হয়ে যাওয়া গাছের মত ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল ওর দেহটা। টিলাবাবু মহা বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল- এই চণ্ডলা। লছমী! মাগীটাকে সরা। সময় মত ভেল্কি দেখাতে জানে হারামজাদীরা। এক একটা রাম ঘুঘু।

চঞ্চলা বিন্দিয়া লছমী এসে রজর মার অচৈতন্য দেহটা ধরাধরি করে এক পাশে নিয়ে গেল। বৃন্দাবণকে ডাকল মুখে পানির ছিটা দেবার জন্য। রজর মাকে নিয়ে একটা হৈ চৈ শোরগোলের জটলা লেগে গেল। টিলাবাবু ধমকে উঠল -এই রেন্ডীরা, সব কাকের মত কা কা শুরু করলি কেন? উঃ মাথাটা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। এমন চ্যাঁচাতে পারে মেয়েলোক-গুলো। এই শিউরাম!

শিউরাম অপরাধী মুখে সামনে এসে দাঁড়াল। টিলাবাবু হুমকী ছাড়ল--করিস কি ব্যাটা সারাদিন? বাগানে পড়ে পড়ে ঘুম দিস না কি যে দেখতে পাস না পাতার ঝুড়িতে ঢ্যালা পাথর চালান হয়ে যাচ্ছে।

শিউরাম নীচু স্বরে বলল ওর তো বেমারী আছে।

চুপ কর। বেমারী তো কাজে আসে কেন। সিকলীভ নিলেই তো হয়। যত ঝামেলা। তোর নামে আমি রিপোর্ট করব ছোট সাহেবের কাছে।

রাগে গরমে ঘামে টিলাবাবুর বিরক্তি চরমে উঠল। শিউরাম হাত কচলালো গলতি হয়ে গেছে বাবু।

কড়া রোদ যেন মাথায় কামড় বসাচ্ছে। টিলাবাবু চিড়বিড়িয়ে উঠল যা যা ব্যাটা। এখন সাফাই গাইতে হবে না। সারাদিন থাকবি ছুকরী-গুলোর সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করবার তালে।

ওজন করা ঝুড়িগুলোর পাতা নিয়ে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে গাড়িতে। খালি ঝুড়ি নিয়ে অনেকেই এসে দাঁড়াল রজর মার পাশে। কে যেন বলল ও আর কিছু না। সন্ধ্যাবেলা ঝড়ের মধ্যে একা একা গেছে লাকড়ী কুড়োতে। খারাপ বাতাস লেগেছে। প্রাণের ভয়ও নেই বুড়িটার। গাড়ির পেছনের ভ্যানে কাঁচা পাতা স্তূপ হয়ে গেছে। পাতাগুলোকে পাতলা করে বিছিয়ে দিচ্ছে কালু। হালকা করে না বিছালে পাতার গুণ নষ্ট হবে। চায়ে ভাল স্বাদ আসবে না। গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে রাজু শ্রীমতীকে ডাকল হেই শিরিমতিয়া---!

শ্রীমতীর ঝুড়ির ওজন করা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রজর মার কাছে একটু দাঁড়িয়েছিল সে। কিন্তু মনটা চঞ্চল হয়ে উঠছিল একটা মুগ্ধ দৃষ্টির লুব্ধ আশায়। রজর মাকে নিয়ে গোলমালে এতক্ষণ সে রাজুর কাছে যেতে পারে নি। খালি ঝুড়ি হাতে নিয়ে একটা হলুদ কালো ছোপের প্রজাপতির মত উড়ে এল শ্রীমতী। মোহিনী রং ঠোঁটে ছড়িয়ে হাসল শ্রীমতী কেন ডাকছিস?

রাজু মুগ্ধ হাসল-তোর শিরিমুখ দেখব বলে।

হাসির ঠমকে শরীরে ঢেউ তুলল শ্রীমতী শুধু মুখ দেখলেই মন ভরবে? আমার জন্য তুই...

থেমে গেল শ্রীমতী। দেখল ওদিকে মালখানা গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে মুরুলী। কেমন এক ধারাল তীব্র দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করছে শ্রীমতীকে। শ্রীমতীর শরীর জ্বলে উঠল। রাজু কি মুরুলীর যে মুরুলী ও রকম বিষ ঝরা চোখে শ্রীমতীকে বিঁধবে। রাজু বলল- কি রে এ রকম চুপ হয়ে গেলি কেন? একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে আবার বলল- সন্ধ্যায় বীজতলা বাগানে আসিস। তোর জন্য একটা রুপোর হাঁসুলী গড়িয়ে এনেছি। আসবি তো?

শ্রীমতী একটু অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে হাসল। চোখের কোণে মুরুলীকে দেখে নিয়ে বলল রুপোর হাঁসুলী হলে শুধু হবে না রে। আরো কিছু চাই?

- বল কি চাই? রাজু ব্যাগ্র প্রশ্নে শুধোল।

তোকে গলার হাঁসুলী বানাতে চাই। খিল খিল করে হাসতে লাগল শ্রীমতী। হাসতে হাসতে শ্রীমতীর দৃষ্টি মুরুলীকে ঝাপটা দিয়ে উড়িয়ে দিল। রাজু বলল--এমন হাসছিস যেন পাগলা পানি খেয়েছিস। যা ওদিকে যা। দেখছিস শিউরাম আর ছত্রিটা কেমন গোল চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে।

পাতার গাড়ি আর টিলাবাবু চলে যেতে ভিড়টাও পাতলা হয়ে গেল। বেলা দুটো থেকে আবার কাজ শুরু হবে। চলবে বিকাল পর্যন্ত। এই অবসরটুকুর মধ্যে হাত পা গুলোকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না দিলে আর ও বেলায় পাতা তুলবার তাগদ আসবে না। গাছের ডালের দোলনায় যাদের বাচ্চা ঝুলান ছিল তারা বাচ্চা কোলে তুলে নিল। কাঁচুলী খুলে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে বসল। রজর মা উঠে বসেছে। চঞ্চলা বলল কাকী তুমি আমার হাত ধরে উঠে এস। চল ছায়ায় গিয়ে বসি।

রজর মায়ের হাত ধরে চঞ্চলা গাছের ছায়ায় নিয়ে বসিয়ে দিল। মাথা থেকে বিড়ে পাকনা শাড়ি নামিয়ে আঁচলের গিট থেকে চাল ভাজা বের করল চঞ্চলা। বলল- তুমি খাবার আনো নি কাকী?

রজর মা বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে দূরে। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল কোথা থেকে জুটাব রে রোজ দুপুরে খাবার।

লছমী ছাতু এনেছে। বিন্দিয়া বুটভাজা আর চাল ভাজার গুড়ো। আঁচল খুলে কাঁচা পেঁয়াজ কুচি আর শুকনো লংকার গুড়ো ছাতুর ওপর ঢেলে লছমী বলল তুই একবার ওঝার কাছে যা রজর মা। কোথায় কোন খারাপ বাতাস লেগেছে। আজ না কি ঝড়ুর বউকে ওঝার কাছে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে চলে যা।

বিনি চাল ভাজা চিবোতে চিবোতে বলল -ঝড়ুর বউকে দেখে এলাম সকালে। হাত পা ফুলে একেবারে কলাগাছ হয়েছে।

বিন্দিয়া উঠে এল রজুর মার পাশে। আঁচল থেকে চাল ভাজা এগিয়ে দিল--নাও খাও। ভূত না ছাই। না খেয়ে খেয়েই বুড়িয়া মরছে। তার ওপর বেমারী।

রজুর মা চঞ্চলা লছমী একই জাতের। পরস্পরের ছোঁয়া খেতে অসুবিধা নেই। চঞ্চলা বলল -দাঁড়াও কাকী। আমি কটা পাত্তি তুলে আনি। চাটনী বানিয়ে দিই। খেলে এখন শরীরের কমজোরি কিছু কমবে।

চঞ্চলা উঠে গিয়ে বাগান থেকে এক মুঠো কচি চা পাতা তুলে নিয়ে এল। কাঁচা চা পাতার চাটনী টোটকা হিসেবে খুব ভাল। অনেকেই খায়। শরীরটার অবসন্নতা কেটে শরীর ঝরঝরে লাগে। বুধুয়া হবার পর আতুড়ঘরে চঞ্চলার মা রোজ চা পাতার চাটনী করে খাওয়াত চঞ্চলাকে। চা পাতার চাটনী আর চুয়ানী অবসন্নতায় না কি ভীষণ উপকারী। কচিপাতা গুলো ছাতুর সংগে চটকিয়ে চাটনী তৈরি করে রজুর মায়ের সামনে ধরল চঞ্চলা খাও কাকী।

রজুর মা আবার ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছিল। আস্তে আস্তে উঠে বসল। দু'তিন গ্রাসে খাবারটুকু খেয়ে ফেলল। সত্যি বলতে কি আজ এক সপ্তাহ সে ভাত চোখে দেখে নি। বেকার স্বামী বুড়ো রজুর বাবার কথা মনে পড়ে তার চোখ ছল ছল করে উঠল। হায় রে রজু। বুড়ো অক্ষম মা বাবার কথা কি তোর একটুও মনে পড়ে না! এতই স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর এ পৃথিবী! হাতের উল্টোপিঠে ঝাপসা হয়ে ওঠা চোখ মুছল রজুর মা!

তিন

পুরোন ধুপ ঘরের জালিতে গাড়ি গাড়ি পাতায় এসে স্তূপ হয়েছে। বিরাট লম্বা চালা ঘরটায় পাশাপাশি অনেকগুলো তারের চালনী। ধুপ ঘরের কুলীরা কাজে ব্যস্ত। অর্জুন নেটের ওপর পাতা বিছিয়ে দিচ্ছিল। চার পাঁচ জন কামিন পাতা এনে ঢেলে দিচ্ছে নেটের ওপর। রুক্মিনি এক ঝুড়ি পাতা এনে ঢেলে দিল অর্জুনের সামনে। অর্জুন রেগে উঠল—এই রুকমিনি এমন করে মাঝখানে পাতা জমা করছিস কেন? চোখে দেখিস না। ওদিকে জালির মাথায় ঢাল। মাঝখানে কেন ঢালছিস!

রুকমিনিও সকাল থেকে ধুপ ঘরে কাজ করছে। কালকের পাতা ও বেলা উঠিয়ে দিয়েছে কারখানায়। সকালের পাতা ওদিকের চালনীতে

বিছান হয়ে গেছে। এ বেলা পাতা খুব বেশি নয়। রুকমিনি বলল ছড়িয়ে দে না পাতাগুলো। ব্যাস হয়ে গেল। এত রাগারাগি করছিস কেন?

দ্রুত হাতে পাতাগুলো বিছিয়ে দিতে দিতে অর্জুন বলল -এতদিন ধরে ধুপ ঘরে কাজ করছিস জানিস না এরকম চাপে পাতা রাখলে চা নষ্ট হয়ে যায়।

রুকমিনি মুখ ঝামটা দিল- জানব না কেন? আমরা পাতা ঢালি.. বিছানোর কাজ তো তোদের। হাত ভাল চললে আবার পাতা জমা হয়ে থাকে না কি।

অর্জুনের মেজাজ খারাপ হল। কিন্তু কথা বাড়াল না সে আর। ধুপ ঘরে কাজ করতে তার ভাল লাগে না। যত সব মেয়েলী কাজ। নাজুক পাতাগুলোকে আলগা হাতে হালকাভাবে দ্রুত ছড়িয়ে দেবার ক্ষিপ্রতা তার আসে না। এতদিন সে বুশে ছাঁটাইর কাজ করেছে। হালকা ছাঁটাই কলম ছাঁটাই করতে অর্জুনের হাত চলে দ্রুত। ছাঁটাই কাজ থেকে তাকে দেওয়া হল চা গাছের পানি দেবার কাজে। সেটাও মন্দ নয়। গাছের শুকনো গোড়া বিছিয়ে দিতে দিতে গাছের ওপর কেমন একটা মমতা ছড়িয়ে পড়ত। মনে হত গাছগুলো যেন তৃষ্ণার্ত শিশুর মত নীরব প্রার্থনায় হাত বাড়িয়ে আছে। বিল্লু বুধুয়ার মত বলছে বাবা আমাদের ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। হঠাৎ সারাটা ঘর তটস্থ হয়ে উঠল। ঘরে ঢুকছেন ছোট ম্যানেজার সাহেব। সর্টস ফেল্টপরা ছোট সাহেবকে দেখে সবার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেল। কাজ থেকে চোখ না তুলে সবাই সালাম দিতে লাগল। সালামের জবাব দিতে দিতে ছোট সাহেব এগিয়ে এলেন। অর্জুনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন -ও কি রে! ও রকম থোবা থোবা করে পাতা রাখছিস কেন! পচে গোবর হয়ে যাবে যে. দিন দিন কাজ ভুলে যাচ্ছিস না কি?

অর্জুন দ্রুত হাতে পাতাগুলো হালকা করতে করতে বলল- জী হুজুর। এখনি ঠিক করে দিচ্ছি।

ছোট সাহেব সামনের নেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। সারি সারি দাঁড়িয়ে পাতা বিছিয়ে দিচ্ছে সবাই। সবার কাজ তদারক করে দু'চারটে মন্তব্য করে ছোট সাহেব ধুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অর্জুন পাশের কুলিকে বলল দেখলি তো রুকমিনির জন্য আমি দোষী হলাম। এমন পাজী মেয়েমানুষ।

রুকমিনি ঝুড়ি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে পড়ল -এই অর্জুন। কেন আমার দোষ দিচ্ছিস রে। হাত চলে না তোর। আর দোষ হল আমার পাতা ঢালার। যে কাজ পারিস না. আসিস কেন সে কাজে। বাবুকে

বলে চলে যা তোর ছাঁটাই কাজে।

অর্জুন রেগে উঠল কারখানা কি তোর বাবার, যে তোর ইচ্ছে মত কাজ করবে সবাই।

এবার রুক্মিনিও রাগল- অত বড় বড় কথা শোনাচ্ছিস কেন রে? বাগানে কাম কম বলেই তো তোরা এখানে এসে জুটেছিস! না পারিস ছাঁটাই হয়ে যা। অন্যকে দোষ দিস কেন। তর তর করে সামনে এগিয়ে গেল রুক্মিনি।

অর্জুন দাঁতে দাঁত চেপে নীচু কণ্ঠে বলল- শালির বেটি! কথায় কথায় ছাঁটাই দেখাতে আসে।

হাত অবসর হতে একটা বিড়ি ধরাল অর্জুন। পাতার যোগান কম। তিনটে জালি খালি পড়ে আছে। আজ সকালে ওগুলো থেকে কালকের পাতা তুলে পাঠান হয়েছে কারখানায় রোলিং মেশিনে। চব্বিশ ঘণ্টা এই নেটের ওপর শুয়ে থেকে নরম হয়ে যাওয়া পাতা যায় রোলিং মেশিনে। বিড়িটা ভাল লাগল না। নিভিয়ে ফেলল অর্জুন। কি যেন ছোট সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েছেন কি না। যদি অর্জুনকে ছাঁটাই দলে ফেলে দেন!

ধূপ ঘরের সুপারভাইজার শুকলাল এল অর্জুন! কাল থেকে কাম বদলে তুই বরং রং ঘরে চলে যা।

অর্জুন চুপ করে রইল। শুকলাল আবার বলল আজ পঞ্চায়েত আফিসে আসিস সন্ধ্যার পর।

অর্জুন তাকাল শুকলালের দিকে কেন? কি হয়েছে।

শুকলালের মেজাজটা ভালই আছে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলল শুনিসনি কিছু তুই?

অর্জুনের যেন হঠাৎ মনে পড়ল। বলল -ও বুঝেছি! হরিয়ার সেই গরু হারাণর বিচার বুঝি?

শুকলাল হাসল আরে সে তো চুকে বুকে গেছে। নালিশ তুলে নিয়েছে বিষ্ণু। .

অর্জুন খুশি হল। যাক, বিষ্ণু তাহলে অর্জুনের কথাটা মেনেছে। বলল -তাহলে কিসের জন্য ডেকেছে পঞ্চায়েত?

শুকলাল বেশ চিন্তিত কণ্ঠে বলল দেখছিস না বাগানের অবস্থা। এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই পাতা উঠছে না। কুলিরা সব বেকার হয়ে গেছে। রামবুনিয়া বাগানের পঞ্চায়েত না কি পন্ডিত আনিয়েছিল। পন্ডিত বলেছে সব বাগানে যজ্ঞ করতে হবে।

—তাহলে সব বাগানেই যজ্ঞ হচ্ছে?

—সব বাগানে হচ্ছে কি না জানি না। তবে আমাদের বাগানে হবে।

আমাদের কোম্পানীর বাগান বেশি। কুলিও বেশি। পাতা না উঠলে সব মারা পড়বে যে। তাছাড়া কুলি লাইনের ঘরে ঘরে যেমন বেমার পড়ছে সবাই। কিছু একটা দোষ হয়েছে নিশ্চয়ই।

অর্জুন চুপ করে রইল। শুকলালের কথাটা মন্দ নয়। বাবার কাছে অর্জুন শুনেছে আগেকার দিনের কুলিরাও যজ্ঞ করত। তখন তো অবস্থাও ছিল অন্যরকম। পাঁচ পয়সা চার পয়সা হফতা ব তলব ছিল। কুলিও খুব বেশি ছিল না। তখন ছাঁটাই হওয়া কি ব্যাপার জানত না কুলিরা। রোগ ব্যাধির হাত থেকে ভালো থাকবার জন্যই যজ্ঞ করা হত। বাগানে বাগানে তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল খুব বেশি। ম্যালেরিয়া আর কলেরা কত কুলি লাইন সাফ করে দিয়েছে। গুনতির টাইমে হাজিরা দিতে কুলি পাওয়া যেত না। নতুন চালান আনতে হত। সেই সব দুর্দিনে যজ্ঞ করত কুলিরা। যজ্ঞের খরচও ছিল তখন কম। চার পাঁচ পয়সা এলেবে যজ্ঞের খরচ কুলিয়ে যেত।

অর্জুন হঠাৎ বলল --যজ্ঞ করতে তো খরচ কম নয়। ঘি লাগবে। লাকড়ী লাগবে মণ কে মণ। পন্ডিতের সেলামী। পাঁঠা কাটতে হবে। এত খরচ দেবে কে এই মাগ্গার দিনে ?

শুকলাল রেগে উঠল—কে আবার দেবে, তোরা দিবি। আমরা দেব। বাগানের সব কুলিরাই দেবে। পাতা কম উঠলে লোকসান যে আমাদেরই। যজ্ঞ করলে কুলিদেরই অবস্থা ভাল হবে। ঠাকুর দেওতার জন্য খরচ করতে হবেই তো।

পাশের একজন কুলি ভক্তি ভরে কপালে জোড় হাত ঠেকাল। 'রাম রাম, দেওতার সঙ্গে কি কঞ্জুসি চলে।'

অর্জুন ভাবল কুলিদের অবস্থা আবার ভাল ছিল কবে। আর কিই বা ভাল হবে। তারা বেঁচে থাকে ঠিকই। তবু সারা জনমের অভাব আর কষ্ট সঙ্গী হয়েই থাকে। কথাটা মুখে বলল না অর্জুন। শুকলাল পঞ্চায়েতের মেম্বার। পঞ্চায়েতকে চটিয়ে অর্জুন কি বাগান ছাড়া হবে না কি!

অর্জুন উঠে দাঁড়াল। ধুপ ঘরে কাজ কম বলে এখানকার লেবারদের দু' জায়গায় কাজ করতে হচ্ছে। পাতা বিছিয়ে দিয়ে যেতে হবে প্যাকিং ঘরে। পাতাগুলো আর একবার হাত দিয়ে হালকা করে ছড়িয়ে অর্জুন বাইরে এল। সামনেই খালি পড়ে আছে নতুন ধুপ ঘরটা। মাত্র কয়েকদিন আগে এ ঘর তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। বিরাট লম্বা ঘর। দু' তিন থাক লম্বা জালির মাথায় বসান হয়েছে বিরাট বিরাট পাংখা। শুকলাল বলেছে ওগুলোকে ইংরেজীতে ব্লোয়ার বলে। ওই পাংখা দিয়ে না কি অনেক বেশি পাতা অনেক তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলা যাবে। চব্বিশ ঘণ্টা ফেলে রাখতে

হবে না জালিতে বিছিয়ে রোদ আর হাওয়ার ওপর নির্ভর করে। বৃষ্টির ঝাপটায় রোদের অভাবে পাতা পচবে না, খট খটে রোদের তেজে শুকিয়ে জ্বলে যাবে না।

নতুন ধুপ ঘর ছাড়িয়ে কারখানার দিকে যেতে যেতে অর্জুনের হরদেও বুড়োর কথা মনে পড়ল। হরদেও বুড়ো তো বলতে গেলে চা বাগানের জন্মের ইতিহাসটা মুখস্থ করে রেখেছে। পুরোন কালের কত গল্প যে তার জানা। আগে না কি চা বাগানে এত বড় বড় মেশিন পত্র কিছুই ছিল না। পাতা তুলে রোদে শুকিয়ে ভাটিতে দিয়ে চা তৈরি করা হত। তারপর যত দিন যেতে লাগল, নতুন নতুন মেশিনও বের করতে লাগল সাহেবরা। লেক কাট মেশিন যে সাহেব তৈরি করল তার নাম ছিল লেগ সাহেব। বুশ মেশিন তৈরি করল বুশ সাহেব। মাথা খাটাত বটে ইংরেজ সাহেবরা। এক এক সাহেবের নামে এক এক মেশিন। যেমন কুলিদের রয়েছে অনেক কথা যার ইতিহাস হরদেও বলতে পারে। বাগানের শুরুর দিকে কুলিরা চালানে এসে এখানে মন বসাতে পারত না। দেশে ফিরে যাবার জন্য হা পিত্যেস করত। অনেকে পালিয়ে যেত। কুলিরা যাতে পালিয়ে না যায় তার কড়া ব্যবস্থা ছিল। সকালে সবাইকে এক এক করে গুণে দেখা হত। সেইজন্য আজো কাজের জন্য সকালে সবাই যখন কারখানা আফিসের সামনে জমা হয় সেই সময়টাকে বলে গুনতি কা টাইম। সেই যুগে কুলিরা একদিন যখন বাগানের কাজে ব্যস্ত, খবর এল সবাইকে যেতে হবে আফিস ঘরে। তলব করা হয়েছে সবাইকে। তলব শুনে এসে সবাই যার যার কাজের বিনিময়ে প্রথম কিছু জলপানির পয়সা পেল। সেই থেকেই তাদের হফ্তার পয়সার নাম হয়ে গেল তলব।

কারখানায় ঢুকল অর্জুন। এইমাত্র ভাটি ঘরের ড্রায়ারের চুলো নিভেছে। প্রচণ্ড শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর ভাটি ঘর থেকে। ন্যাচ ঘরে গোলাকৃতি রোলিং মেশিনগুলো নিস্তব্ধ হয়ে আছে। রং ঘরে এল অর্জুন। সিমেন্টের ওপর চায়ের পাতাগুলো রং ধরাবার জন্য বিছিয়ে রাখা হয়েছে। খয়েরী রং হয়ে ওঠা পাতার পাশে বিষ্ণু দাঁড়িয়েছিল। অর্জুন বলল- বিষ্ণু দাদা কাম শেষ?

বিষ্ণু একটু হাসল- না শেষ কোথায়। এখনও কিছু পাতা ঢালা বাকি রয়েছে।

অর্জুন বলল- খবর শুনেছ?

—কি খবর?

- বাগানের না কি যজ্ঞ হবে। সবাইকে পঞ্চায়েতে ডাকা হয়েছে। পুরো ঘরটা রং ধরা চায়ের মত খয়েরী অন্ধকার হয়ে আছে। আরো কিছু

পাতা এল ফারমেন্টিংয়ে। পাতাগুলো সাবধানী সমতায় ছড়িয়ে দিতে দিতে বিষ্ণু বলল- শুনেছি। দুই দিনের রোজ দিয়ে দিতে হবে চাঁদায়।

-বল কি দু দিনের রোজ। এখনও তো তলবই পাই নি।

তলব পেলেই তো দিবি।

-তাই বা দেব কেমন করে। মহাজনদের টাকা না দিলে সামনের হফ্-তায় সে কি আর হাওলাতে মাল দেবে!

বিষ্ণু সারাদিন কাজের ক্লান্তিতে খিঁচিয়ে উঠল- যা তো গিজড়া। সব ব্যাপারেই তোকে সর্দারী করতে হবে। ঠাকুর দেওতার ব্যাপারে কথা বলতে আসবি না।

অর্জুন রং ঘর থেকে চলে এল। প্যাকিং ঘরটা চায়ের গন্ধে মৌ মৌ করছে। ঘরের মাঝখানে শুকনো তৈরি চা পাতা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে। বেলচা দিয়ে প্যাকিং বাক্সে চা ভরছে একদল। আরেক দল চা ভর্তি প্যাকিং বাক্সগুলোর মুখে সীসার পাত বসিয়ে পেরেক গাঁথছে। রোটার ভেন আর ড্রায়ারের তুমুল শব্দ এখন নেই। হাতুড়ী ঠোকার শব্দ কারখানার দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। নাকে গামছা জড়িয়ে বাক্সে চা পাতা ভরছে রাজিন্দর। অর্জুন তার পাশে গিয়ে বেলচা হাতে তুলে নিল। ধুপ ঘর থেকে আরো অনেক কুলি আসছে একে একে। রাজিন্দর বলল তোরা এবার বাক্স ভর। আমি যাই বাক্সগুলো ট্রাকে তুলে দেই। এতক্ষণ বেলচা টেনে টেনে হাত জ্বালা করছে। শালা টিফিনের সময় আজ খেতেও পারি নি। হারামী বিন্দিয়াটা আজ ঝগড়া করে খাবার দেয় নি।

বেলচা করে চা পাত্তি তুলতে তুলতে অর্জুন অল্প হাসল। বিন্দিয়া আর রাজিন্দরের ঝগড়া হওয়াটাই স্বাভাবিক। না হলেই অবাক হবার কথা। রাজিন্দর চটে উঠল—দাঁত বের করে খুব তো হাসছিস। আমার মত খান্ডারনী বউ নিয়ে তোকে তো কাজ করতে হয় না।

মুখের গামছা খুলে শরীর থেকে চায়ের গুড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে রাজিন্দর প্যাকিং বাক্স তুলতে গেল। রং ঘরের পেছনে ট্রলি লাইনের ধারে বিরাট বিরাট ট্রাক থেমে আছে। আগে ট্রলি চলত এ লাইনে। চায়ের বাক্স বোঝাই ট্রলি কুলিরা ঠেলে নিয়ে যেত। অর্জুনের শ্বশুর ছিল ট্রলির কুলি। ট্রলি ঠেলত। শুধু চায়ের বাক্সই নয়। অনেক সময় সাহেবদেরও। অর্জুনের শ্বশুর যে বাগানে কাজ করত সে বাগানের সাহেবের না কি ভীষণ ক্লাবের নেশা ছিল। ট্রলিতে বসে শিলচরের বড় ইংরেজী ক্লাবে যেত। সারা রাত সেখানে পাগলা পানি খেয়ে ফূর্তি করত। এক সময় সাহেবকে ধরাধরি করে ট্রলিতে তুলে দিত। কুলিরা রাতের অন্ধকারে

নিবিড় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে মাতাল অচৈতন্য সাহেবকে ঠেলে নিয়ে আসত। সকালে উঠে সাহেব বাগানের বাংলোয় নিজেকে না দেখলে ক্ষেপে অস্থির হবে। ট্রলি কুলিদের দুর্দশার সীমা থাকবে না। একবার না কি সাহেবকে নিয়ে আসবার সময় করিমগঞ্জ এসে দেখা গেল সাহেব ট্রলিতে নেই। ট্রলি খালি। কুলিদের তো মাথায় হাত। কোথায় পড়ে গেল সাহেব! রাস্তায় বাঘে খেয়েছে কি না কে জানে। আবার ট্রলি পেছনে ঠেলে নিয়ে চলল কুলিরা। লাইনের ধারেই পড়েছিল সাহেব। নেশার ঘোরে ট্রলি থেকে কখন পড়ে গেছে। মাথা নীচু করে ট্রলি ঠেলায় শ্রান্ত কুলিরা খেয়াল করে নি। সাহেবকে তুলে ট্রলিতে ফেলে নিয়ে আসা হল। সে সাহেব যত-দিন ছিল কুলিরা নিজেদের ভাষায় তার নামকরণ করেছিল টরল-গিরা সাহেব। ট্রলি-গেটে থেমে থাকা ট্রাকে চায়ের বাক্স বোঝাই হচ্ছে। ট্রাক বোঝাই বাক্স শ্রীমংগল স্টেশনে গুড্স ট্রেন বোঝাই হবে। তারপর চলে যাবে চিটাগাং। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে চলে যাবে কোথায় কোথায় সব অজানা অচেনা দেশে। অর্জুন মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে কারা খায় এত চা! তারা বোধহয় জানেও না কতগুলো কালো মানুষের রক্ত জল করা পরিশ্রমকে পানীয় করে পান করছে তারা। বাইরে রোদ ম্লান হতেই ছুটির ঘণ্টা বাজল। কারখানা থেকে রাজিন্দর আর অর্জুন এক সংগে বাইরে এল। চা পাতার গুঁড়ো নাকে-মুখে ঢুকে গেছে। গলা দিয়ে খুস-খুসে কাশি উঠে আসছে। অর্জুন কয়েকবার কাশল। রাজিন্দর বলল - কি রে গলা বুজে গেছে না কি? চল পাট্টায়। হাঁড়িয়া খেলেই গলা খুলে যাবে।

অর্জুন মাথা নাড়াল—এখন না, বাড়ি যাবো। বাড়ি থেকে আবার পঞ্চায়েত আফিসে যেতে হবে।

রাজিন্দর রেগে উঠল—তুই শালা একটা রেণ্ডী। সন্ধ্যায় পাট্টায় না গেলে আবার মরদ কিসের রে।

রাজিন্দরের রাগ দেখে অর্জুন হেসে ফেলল- পাট্টায় কেন? তোর কমলীর চুয়ানী কি হল!

কমলীর হাতের চুয়ানীটা মিঠা। তবে মাঝে মাঝে কড়া জিনিস লাগে রে। দিলটা তখন দরাজ হয়ে যায়।

—বাড়ি গেলে তো বিন্দিয়ার গালি খাবি। তোর জন্য পিঠা ভেজে বসে থাকে।

-আরে রাখ! আজও ক্ষেপে আছে। আজ গেলে দেবে একটা শুখা রুটি আর লবণ গোলা রং চা। ওই রং চা দেখলে আমার শরীর জ্বলে যায়।

রাজিন্দর আর দাঁড়াল না। পাট্টার পথ ধরল। সামনে কোমল রোদ নিয়ে হাসছে স্নিগ্ধ চা বাগান। কামিনেরা ঝুড়ি পিঠে ফেলে অনেকেই বাড়ির পথ ধরেছে। এরই মধ্যে চঞ্চলাও আছে। হয়তো বাগানের ধারের ছড়ি থেকে স্নান সেরে ফিরছে। নিজে হাত তোলা চা পাতা রোদে শুকিয়ে হাঁড়িতে ভরে রাখে চঞ্চলা। বাড়ি ফিরে হয় তো সেই পাতা জ্বাল দিয়ে রং চা তৈরি করতে বসবে অর্জুনের জন্য। কারখানার তৈরি চায়ের স্বাদ কেমন তা অর্জুন চঞ্চলা কুলি লাইনের কোন কুলিই জানে না।

ক্লান্ত পা ফেলে ঘর ফিরতি কুলিদের ভিড়ে মিশে গেল অর্জুন।

চার

অজস্র ফুলে ভরা জারুল গাছের মাথার ওপর আকাশটা ফিকে বেগুনি রং ধরেছে। ক্রটোলারিয়া গাছের ছায়া মেলে রাখা পথটা দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আশরাফ খুব অবিন্যাস্ত বোধ করল। বিকেলে সে নিজে ছয় নম্বর সেকশানের বুশ দেখে এসেছে। চা বুশে কেমন হলুদ রং পাতা-গুলোকে রুগ্ন করে তুলেছে। রবার্টকে লোক পাঠিয়েছে সকালে। এতক্ষণ বোধহয় সে পৌঁছে গেছে। খবরটা ঠিক সময়ে পৌঁছলেই হল। রবার্ট নিজের গরজে এসে উপস্থিত হবে। সামনের টিলার ওপরেই বাংলো। প্যাট্রিয়ার ঝাড়টা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। হ্যাংগিং ব্রীজটা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল আশরাফ। অনেক নীচে পাহাড়ী ছড়াটার ক্ষীণ-ধারা তির তির করে বয়ে চলেছে। জংলী ফার্ণ আর লেমন গ্রাসের গুচ্ছের পাশে বিরাট একটা সাদা রঙের মথ বসে আছে। আশ্চর্য তো! এত বড় জাতের মথ এতদিনে একবারও চোখে পড়ে নি। আশরাফের মথ কালেক-শানের একটা অদ্ভুত নেশা আছে। ড্রইংরুমটার পাশের ছোট ঘরে একটা বড় কাচের কেসে অনেক ধরনের মথ প্রিজার্ভ করে রেখেছে। কিন্তু এ জাতীয় মথ সুরমা ভ্যালির কোন জায়গায় দেখে নি সে। বড় বড় পা ফেলে ব্রীজ পার হল আশরাফ। টিলায় উঠবার বাঁধান সিঁড়ি টপকে লনে উঠতে উঠতে মনটা হঠাৎ খুব উৎফুল্ল লাগল। লণে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকল—বেয়ারা। বে-য়া-রা।

বেয়ারা ছুটে বেরিয়ে এল—সাহাব!

আশরাফ উৎফুল্ল কণ্ঠে হিন্দীতে বলল—জলদি জালি লে আও।

বেয়ারা ঠিক বুঝতে না পেরে আবার প্রশ্ন করল—জী হুজুর?

আশরাফ জোর গলায় ধমক দিল—কি হুজুর হুজুর শুরু করেছিস

ব্যাটা। যা, দৌড়ে জালি নিয়ে আয়। ওই নালাটার ধারে একটা বড় সাদা প্রজাপতি বসে আছে। এখুনি ধরতে হবে।

বেয়ারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটল। আশরাফ আবার ডাকল—শোন, মালী কোথায়? চৌকিদার কোথায়? সবাইকে সংগে নিবি। এতক্ষণ আছে কি না ওটা কে জানে।

বেয়ারা চলে যেতে আশরাফ বাংলোর টানা বারান্দায় নেমে পায়চারী করল। ইচ্ছে হচ্ছে নিজেই জামা জুতো খুলে নেমে পড়ে মথটাকে ধরে আনে। রবার্ট হলে হয় তো এতক্ষণ নেমে পড়ত। রবার্ট অবশ্য অনেক কিছু করে। অনেক কিছু করেছে। রবার্ট যা পারে আশরাফ তা পারে না। তার অনেক স্বাধীন ইচ্ছাকে কবে থেকে যেন সে নির্বাসন দিয়ে বসে আছে। সেই কবে কত বছর আগে জুনিয়র অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার হয়ে এসেছিল বোটানীর ছাত্র আশরাফ আহমেদ। একটা অন্যজগতে অন্য জীবনে আশরাফ আহমেদ ক্রমে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। দিন রাত এক-টানা সবুজের মধ্যে তার বাস। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহ করে। নিজের ওপর অত্যন্ত রাগ হয়। সে রাগটা বোধহয় চেহারায় ফুটে ওঠে। তখন বেয়ারা আর্দালী খানসমা থেকে অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার পর্যন্ত তাকে অতিমাত্রায় সমীহ করে। ব্রীজের নিচে থেকে মালী চৌকিদারের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। আশরাফ লণে নেমে এল। সুইমিং পুলের পাশে দাঁড়াল। এখান থেকে নালার গভীর খাদটা দেখা যায় না। শুধু বেতঝোপ সরুসরু ডগার বাঁশ ঝাড়টা চোখে পড়ে। একটু পরেই চৌকিদার উঠে এল। পেছনে বেয়ারা আর মালী। শূন্য জালিটা হাতে নিয়ে বেয়ারা জানাল-সাহাব। ওটাকে ধরা গেল না, উড়ে জঙ্গলের ভেতরে কোথায় যেন পালাল।

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মালী আর চৌকিদার। যেন আসন্ন একটা ঝড়ের অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। উত্তেজিত হতে গিয়ে আশরাফ হঠাৎ খুব ক্লান্ত হয়ে গার্ডেন চেয়ারে বসে পড়ল। একটা সাদা আনন্দের ঝলক যেন অনেক দিন আগের স্বাধীন ইচ্ছার মত ঝলক দিয়ে মিলিয়ে গেল। সাহেবের উদাস অন্যমনস্কতার সুযোগে বেয়ারা সন্তর্পণে এসে পায়ের কাছে বসে জুতোর ফিতেয় হাত লাগাল। বেয়ারা জুতোয় হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে আশরাফ এই বড় বাংলোর মালিক অনেকগুলো বাগা-নের ওপরের বড় সাহেব অর্থাৎ স্পেন্সার চা বাগানের দন্ডমুন্ডের কর্তার খোলসে ফিরে এল। বাংলো কাঁপিয়ে ডাকল—খানসমা।

বুড়ো খানসমা ছুটে এল—সাহাব!

আশরাফ যুদ্ধের সেনানায়কের মত হুকুম দিল—বিয়ার।

বেয়ারা পা থেকে জুতো খুলে চপ্পল এনে রাখল। বিনীত কণ্ঠে

জানতে চাইল—গরম পানি লাগাব বাথটাবে?

—এখন না।

আশরাফ বুকের কাছে শার্টের বোতাম আলগা করল। খানসমা ট্রেতে বিয়ারের বোতল এনে সাজিয়ে দিল সামনে। চিন্তাবিক্ষিপ্ত মন, ক্লান্ত শরীর বিশ্রী অনুভূতি ছড়াচ্ছে যেন। ঢাকার অফিস থেকে রেসিডেণ্ট ডাইরেক্টর জানিয়েছেন শীগগির লণ্ডন থেকে ডাইরেক্টর আসছেন। নতুন উইদারিং হাউসে উইণ্ড ব্লোয়ারগুলো তাড়াহুড়ো করে লাগান হল। অথচ পাতাই উঠছে না। উঠবেই বা কি! পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে এক একটা সেকশানে একই গাছ থেকে পাতা তোলা হচ্ছে। গাছের নিউট্রেশন কমে এসেছে। পাতার পরিমাণ কম। ওগুলো রিপ্লেস না করলে কিছুদিন পরে হয় তো যা পাতা উঠবে তা দিয়ে ফ্যাক্টরী চলবে না। আসুক ডিরেক্টর! নিজে চোখে এসে দেখুক। ইংরেজ ম্যানেজার চলে যাবার পর তিন বছর থেকে আশরাফ অ্যাকটিং ম্যানেজার হয়েছে। ফলে প্রডাকশন ফল করবার দোষটা তার ওপরেই পড়েছে। আশরাফের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। বাগানে কাজ কম বলে বহু কুলি ছাঁটাই হয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যেও অসন্তুটির গুঞ্জন। ডিরেক্টর এসে কি করে দেখা যাক। বেয়ারা আস্তে ডাকল—হুজুর! গ্লাস?

এতক্ষণে খেয়াল হল বেয়ারা বিয়ারের মগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। বিয়ারে চুমুক দিলো আশরাফ। দু'চার চুমুকের পর বিষণ্ণ ক্লান্ত স্নায়ুগুলো উৎফুল্ল হল। চাপ ধরা মাথাটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে এল। খানসমা এল আবার—সাহাব! চা?

আশরাফ বেশ ভাল বোধ করছে। বেয়ারাকে বলল—গরম পানি লাগাও। গোসল কে বাদ টি।

একটু থেমে আবার বলল—মেম সাহেব কোথায়?

বেয়ারা উত্তর দিল—আপনা কামরেমে।

—ওঃ আচ্ছা। যা।

বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে বিরাট ড্রইংরুমে এল আশরাফ। ঘর সাজানোর পারদর্শিতায় রিণার সুনাম আছে। গতবার রেসিডেন্ট ডিরেক্টর এসে আশরাফের বাংলোকে সুন্দর গোছান এবং কালারফুল বলে তারিফ করে গেছেন। আগেকার দিনে তো ম্যানেজারদের বাংলোর পারিপাট্যের ওপর নম্বর দিতেন উর্ধ্বতন বসেরা। প্রমোশনের কাগজে সে নম্বর যোগ হত। ড্রইংরুম পেরিয়ে বেডরুমের সামনে এল আশরাফ। ঘর থেকে মিউজিকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রিণা বোধহয় টেপ চালু রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বেচারী যা বোর হয়। রিণার জন্য হঠাৎ খুব মমতা বোধ করল

আশরাফ। পরদা সরিয়ে ভেতরে এল। রিণা বিছানায় কাত হয়ে একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিন দেখছে। আশরাফকে দেখে উঠে বসল। এক হাতে রিণাকে বুকে আকর্ষণ করল আশরাফ—কি ব্যাপার। খারাপ লাগছে?

ববছাঁটা চুলগুলো রিণার মুখের অর্ধেক ঢেকে আছে। আশরাফের হঠাৎ মনে পড়ল রিণার আগে খুব ঘন লম্বা চুল ছিল। কোমর ছাপিয়ে নামত চুলের ঢল। রিণা নিশ্চুপ। কিছুটা শীতল। গ্লাসটা বেড সাইড টেবিলে রেখে দুহাতে রিণাকে আরো কাছে আনল আশরাফ—কি হয়েছে? বোর লাগছে না কি?

আমার বোরডমেকার কি আসে যায়।

এতক্ষণে কথা বলল রিণা।

আশরাফ রিণার পাশে বসল—কি করব বল। এমন বিশ্রী টেনশানে আছি।

- আজ দুপুরে লাঞ্চে আস নি।

—ওঃ তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম। ছ'নম্বর সেকশানে বুশগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভীষণ চিন্তায় আছি।

—হু! তাই তো ফিরেই কোথাকার ফড়িং না প্রজাপতি ধরবার জন্য হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছ। তারপর এখন আবার বোতল নিয়ে বসেছ। ভুলে গেছ আজ ক্লাব ডে। ভ্যালি ক্লাবে হাউসী হবে।

ওঃ! সো সরি ডার্লিং। তুমি তৈরি হতে বসে যাও। তোমার তো মেকআপ নিতে দু'ঘণ্টা লাগবে। আমি চট করে বাথ সেরে নিচ্ছি। আশরাফ ঝরঝরে হয়ে উঠল।

রিণা এতক্ষণে হাসল—তোমার জীপ কোথায়?

কৌতুক নিয়ে হাসল আশরাফ—কেন জীপে চড়ে ক্লাবে যাবে না কি?

—জী না। স্পেন্সার কোম্পানীর গার্ডেনের ম্যানেজারের বউ জীপে চড়ে ক্লাবে যায় না। তুমি যে হেঁটে এলে। জীপের শব্দ শুনলাম না। তাই বলছি।

ওঃ। জীপটা ওয়ার্কশপে গেছে।

পরদার ওধারে আয়া এসে দাঁড়াল। জানাল বাথরুম তৈয়ার।

রিণাকে এক পশলা আরো আদর উপহার দিল সারাদিনের ব্যস্ত কাজ অন্ত প্রাণ মানুষটি। রিণা উপভোগ করল। আশরাফকে এমন মুডে খুব কম পাওয়া যায়। রিণা তো কতদিন অনুযোগ করেছে। তুমি তো এখন ওই চা গাছগুলোকেই আমার চেয়ে বেশি ভাল বাস।

আশরাফ তখন জবাব দেয় না। হাসে। আর তখনি আশরাফকে কেমন অচেনা আর দূরের মানুষ মনে হয়। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে

উঠে দাঁড়াল রিণা।

বাথটাবের উষ্ণতায় শরীর ডুবিয়ে পুরোন টাইম ম্যাগাজিনে চোখ রেখে অন্যমনস্ক হল আশরাফ। রিণার ভীষণ ক্লাবের নেশা। ভ্যালি ক্লাব গলফ্ ক্লাব সব ক্লাবে তার যাওয়া চাই। তা ছাড়া নিজেই মাঝে মাঝে ক্লাবে কফি মর্নিংয়ের আয়োজন করে। দশ বছর আগের রিণাকে কি এখন ভাবা যায়। ভাববার অর্থও হয় না। চা বাগানের জীবনে এলে সবাই বোধহয় এমন একটা আলগা পালকের পোশাকে নিজেকে মুড়ে ফেলে। রিণা এখন্ বেয়ারা খানসমা আয়াদের সামনেও আশরাফের সঙ্গে বাংলা বলে না। নিজের অজান্তে আশেপাশের সাধারণ জগৎ থেকে একটা দূরত্বের সীমানা তৈরি করে ফেলেছে সে নিজেকে ঘিরে। এমন কি অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজারের বউর সঙ্গে কথা বলে না রিণা। স্ল্যাকস পরে রিণা যখন লন টেনিস খেলে তখন মনেই পড়ে না রিণা এক কালে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে ভালবাসত। কত সন্ধ্যায় রমনা মাঠে আশরাফের পাশে ঘাসের ওপর হাঁটত। রিণার স্যান্ডেল কেমন মৃদু শিহরণ তুলত।

বাথরুমের দরজায় নক। রিণার সুরেলা কণ্ঠ বাজল এই! ইট'স হাফ পাসড সিক্স। আর কত টাইম নেবে তুমি।

রিণার সুরেলা কণ্ঠের ইংরেজী শব্দগুলো আশরাফকে বর্তমানে ফিরিয়ে নিয়ে এল। টাওয়ালে শরীর মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল আশ-রাফ। স্পেন্সারের কর্মঠ অভিজ্ঞ যুবক ম্যানেজার।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে দু'জন বাংলোর বাইরে এল। সোফার ঝকঝকে টয়োটা গাড়িটার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কোম্পানীর অ্যাডভান্সে মাত্র কিছুদিন আগে গাড়িটা কিনেছে আশরাফ। আশরাফ সোফারকে বলল--তোমার দরকার হবে না। আমিই চালাব।

রিণা আঁকা ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত করল--তুমি তো গিয়েই বারে বসবে। তার-পর বেশি হাই হয়ে গেলে ফিরবার সময় গাড়ি চালাবে কে?

আশরাফ হাসল। রিণা ভাল করেই জানে দু'চারটে পার্টি ছাড়া খুব কমদিনই আশরাফ ক্লাব ডে তে মাতাল হয়। মাতাল না হয়ে ড্রিংক করবার সুখ্যাতি আছে তার। বলল--তেমন যদি হয় তো তুমি চালাবে।

মাসকারা আর বেগুনী শ্যাডো লাগান চোখে কপট কটাক্ষের ঝিলিক তুলল রিণা- ইস, বয়েই গেছে আমার। রাত দুপুরে আমি গাড়ি চালাতে পারব না।

--রাতেই তো গাড়ি চালাতে মজা।

রিণার পাতলা শরীরটা ভীষণ মোহিনী লাগছে। লাল টুকটুকে ঠোঁটে ঢেউ তুলল রিণা—গাড়ি চালাচ্ছি সেটা যদি কেউ নাই দেখল তো গাড়ি চালাবার সুখ কোথায়। চল আর দেরি কোর না।

রিণার মতটাকেই প্রাধান্য দিল আশরাফ। সোফার পেছনের সীটে বসল। হেয়ার স্প্রে আর পারফিউমের সুগন্ধ ছড়িয়ে সামনে আশরাফের পাশে বসল রিণা। গাড়ি নিঃশব্দ মসৃণতায় টিলার ঢালু পথ দিয়ে নিচে নামতে লাগল। রিণা এবার ঢাকায় গিয়ে চাইনিজ দোকান থেকে নতুন ফ্যাশনে চুল সেট্ করে এসেছে। চা বাগানের সোসাইটিতে ম্যানেজার গৃহিণী মহলে ফ্যাশন আমদানীর ব্যাপারে রিণার নাম ডাক আছে। শিরীষ আর জারুল গাছের মাথায় ঝুলে আছে ম্লান জ্যোৎস্নার পান্ডুর চাঁদ।

ভ্যালি ক্লাব এখান থেকে গাড়িতে পঁচিশ মিনিটের পথ। আশরাফ বলল—তোমার হাউসী নিশ্চয়ই এখনও শুরু হয় নি।

আলো ছায়ায় লুফে নিয়ে গাড়িটা যেন ভেসে চলেছে। রিণা জবাব দিল না। আশরাফ আবার বলল রবার্ট আজকে আসতে পারে। ওকে খবর দিয়েছি।

রিণার বিরক্ত কণ্ঠ বাজল—রবার্টকে আবার কেন? জানো ওকে নিয়ে সবাই হাসে।

আশরাফ মুখ ফেরাল। এক টুকরো জ্যোৎস্না ফ্লাশ গানের সবুজ আলোর মত চকিত বিদ্যুৎ হয়ে ঝলক দিল রিণার মেকআপ চর্চিত মুখে। আশরাফ মুখ ফিরিয়ে নিল। গাছের ছায়ায় জ্যোৎস্না আবার হারিয়েছে। গাড়িটা এখন অন্ধকার—রবার্টকে নিয়ে যারা হাসে তারাই হাসির পাত্র। কারণ তারা জানে না, কেন তারা হাসছে। হাসিটাও অনেকটা সপ্তাহের ক্লাব-ডের মত গতানুগতিক। রবার্টকে ইংরেজ ম্যানেজমেণ্টের লোকেরা পছন্দ করত না। তাই বাঙালী ম্যানেজার সম্প্রদায়ও পছন্দ করে না। ইংরেজরা হাসত। তাই বাঙালীরাও হাসে।

রিণা হার মানল না—কি বিদ্ঘুটে জীবন লোকটার। হি ইজ ক্রেজী। এবার আশরাফ হাসল—আসলে ও একটা জিনিয়াস।

রিণা উত্তর দিল না। বুঝল আশরাফ এখন তর্কের মুডে। রবার্টকে নিয়ে তর্ক তুলে শুধু শুধু তিক্ততা নিয়ে ক্লাবে যাবার অর্থ হয় না।

ভ্যালি ক্লাবের আলো ঝলমল টিলাটায় উঠে এল গাড়ি। খেলার মাঠ নানা রঙের গাড়িতে ভরে গেছে। উর্দি পরা দারোয়ান ছুটে এল। সালাম দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল। রিণাকে খুব উজ্জ্বল দেখাল আলোর মধ্যে। নানা রঙের ঝলক দিয়ে একটা স্পটেড ডিয়ারের মত রিণা দ্রুত ছন্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। গাড়ির চাবি সোফারের হাতে দিয়ে রিণার

পেছনে পেছনে উঠল আশরাফ। বারান্দার একধার থেকে ভারি কণ্ঠ বাজল —হ্যালো।

আশরাফ দাঁড়িয়ে পড়ল। আলো ছায়ায় এক মুহূর্ত তাকিয়ে দীর্ঘ মূর্তিটিকে চিনে ফেলল। উষ্ণ হাত বাড়িয়ে বলল—হ্যালো। বব যে।

রবার্ট আন্তরিক উত্তপ্ততায় আশরাফের হাতে ঝাঁকুনি দিল -কি খবর দা পপুলার ম্যানেজার?

আশরাফ হাসল—খবর আমার নয়। চা গাছের। সে কথা বলব পরে। কখন এলে?

—এই তো কিছুক্ষণ আগে। কি ব্যাপার বল?

—বলব। চল ভেতরে গিয়ে বসা যাক।

দুজন ভেতরে এল। বিলিয়ার্ড রুমে আমজাদ আর ইফতেখার বিলিয়ার্ড খেলছিল। স্পোর্টিং গেঞ্জি আর সাদা ট্রাউজারস পরা ইফতেখার কোণাচে চোখে একটু তাকাল। আমজাদ বলল—হ্যালো বিজি ম্যানেজার!

ইফতেখার হাসল—ম্যানেজার বোল না বরং সুপারেনটেনডেণ্ট বলতে পারো। ওই পোস্টটাই তো হোল্ড করছে আশরাফ।

আমজাদ স্টিকার দিয়ে বলে টোকা দিয়ে মুখ তুলল -খেলবে না কি এস।

আশরাফ উত্তরে হাসল। টেবিল থেকে এক ঝলক তাকিয়ে ইফতেখার বলল—ও এখন রবার্টকে পেয়েছে। ওর কি কোন দিকে তাকাবার সময় আছে!

আশরাফ হাত তুলে ওদের উইশ করে পাশের কামরায় এল। এ ঘরটায় কাচচু আর রামির দল বসেছে। এক ধারে ফ্লাশ চলছে।

ও পাশের ঘর থেকে হাউজীর ডাক শোনা যাচ্ছে—এইটি এইট। টু ফ্যাট লেডীজ...।

আশরাফ বেয়ারাকে ডেকে হুইস্কী আনতে বলল। রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলল চল আমরা বলরুমে গিয়ে বসি। ও ঘরটা খালি আছে। বোধ হয়।

রামছড়ির ম্যানেজার গোমেজ চেঁচিয়ে ডাকল—হাই। দা লাকি গাই। এসো আমাদের সঙ্গে। আমরা আজকে হাইয়েষ্ট স্টেকে খেলছি।

আশরাফ আবার হাসল—থ্যাংক ইউ মিঃ গোমেজ। আসছি একটু গলাটা ভিজিয়ে।

ভ্যানকনের ম্যানেজার ইরশাদ পর পর অনেক পয়েণ্ট জিতে ফুর্তিতে টগবগ করছে। বলল—ওঃ হেল। বস বস। গলা ভেজাবার জন্য বারে যাবার দরকার কি! বেয়ারাকে অর্ডার দাও। এখানে দিয়ে যাবে।

আশরাফ আবার ধন্যবাদ দিল। তার সঙ্গে রবার্টের উপস্থিতিটা ইচ্ছে করেই যেন খেয়াল করছে না কেউ। আশরাফ জানে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই সবাই রবার্টকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করবে। বোধ হয় রবার্টও সেটা জানে। এ বিষয়ে আশ্চর্য নির্লিপ্ততা ওর।

বলরুমের এক ধারে একটা বড় পিয়ানো। বহুদিন ওটা অব্যবহৃত পড়ে আছে। এ হলটাও এক রকম অব্যবহৃতই পড়ে থাকে। ব্রিটিশ প্ল্যান্টাররা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এ ঘরটার জৌলুশ গেছে। ক্রিসমাসে নিউইয়ারে ক্লাবে বড় পার্টি হয় বটে। তবে বলরুমে আর ফক্সট্রট ওয়ালজ নাচের পদক্ষেপ ধ্বনিত হয় না। সোফায় বসল দু'জন। বেয়ারা ট্রেতে সোডা বরফ আর হুইস্কী নিয়ে এল। বড় খালি ঘরটার মৃদু আলোয় রবার্টকে দেখল আশরাফ। রবার্টের মাথার লালচে চুলগুলো একটু পাতলা হয়েছে বটে। চোখের নীল তারা আগের মতই উজ্জ্বল। শরীরটা বয়সের তুলনায় আশ্চর্য মজবুত। শুধু চিবুকের নিচে চামড়া একটু শিথিল হয়েছে। এখনও বোঝা যায় যে রবার্ট এক কালে আর্মিতে ছিল। গ্লাস হাতে তুলে টোস্ট করল দু'জন। 'লং লীভ দা টি প্ল্যানটেশান।'

গ্লাস সীপ করে হাসল আশরাফ—আগে বলা হত 'লং লীভ দা কুইন।' এখন চা বাগানের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

—চা বাগান কি কুইনের চেয়েও গ্লোরিয়াস নয়? রবার্ট হাসিমুখে তাকাল।

—ও সিওর। অন্তত রবার্ট হলের কাছে তো বটেই।

রবার্ট মৃদু হাসি নিয়ে বলল—জানো এবার ইরান থেকে কতগুলো রেয়ার ফটোগ্রাফ নিয়ে এসেছি। তোমাকে দেখাব।

আশরাফ জানে রবার্ট কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল। বোধ-হয় পঁচিশ বছর পরে সে নিজের মাতৃভূমিতে ফিরেছিল। ইন্ডিয়া, আফ-গানিস্তান, তুরস্ক ইরান ঘুরে ইস্টার্ণ ইয়োরোপের ওপর দিয়ে সারাটা পথ গাড়িতে গেছে সে। রবার্টের সব কিছুই খাপছাড়া। গ্লাস নামিয়ে আশরাফ প্রশ্ন করল—কিসের ফটোগ্রাফ?

রবার্ট উচ্ছ্বসিত হল—ইরানের টি-বুশের ছবি। তুমি দেখলে আশ্চর্য হবে ওদের গাছগুলো ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট বা সীলোনের মত নয়। একেবারে ছোট। ঠিক এক একটা ফুলকপি গাছের মত। ওদের সীড বুশও সাইজে ছোট।

—রিয়েলী! দেখব তো তা হলে।

—ও নিশ্চয়ই দেখাব তোমাকে। এবং এদের চায়েরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। রাশিয়া চায়না আমেরিকার চা থেকে তা একদম আলাদা।

রবার্ট ইরানের চা থেকে আফ্রিকার চায়ের গল্পে মেতে উঠল। মধ্য পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাওয়া রবার্টকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। রবার্টের পরনের টি শার্ট আর ট্রাউজারস একেবারেই সাধারণ। পায় কমদামি স্যাণ্ডেল সু। রবার্ট এক সময় স্পেন্সারের বাগানের কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল একথা যেন ভাবাই যায় না। অবশ্য সব সময়েই ও সমাজ ছাড়া। ব্রিটিশ সুপারিনটেনডেণ্ট ও অন্যান্য সিনিয়র ইংরেজ ম্যানেজাররা রবার্টের আচরণে সন্তুষ্ট ছিল না। অসামাজিক রবার্ট কোনদিন ক্লাব আসত না। রাগবী পলো গলফ্ খেলার মাঠে তাকে দেখা যেত না। সারাদিন কাজের পরও একা একা ঘুরত বাগানে। চা গাছের মাটি আর চায়ের বুশ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করত ওর নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে। ছুটির দিনগুলো ডুবে থাকত বইয়ের জগতে। সুরমা ভ্যালির চা বাগানগুলোতে যত রকমের ঘাস অর্কিড পোকা মাকড় আর পশু পাখি আছে তার স্পেসিমেন জোগাড় করে বিরাট একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন আর জু তৈরি করেছিল লণের টেনিস কোর্টের পাশে।

আশরাফ হঠাৎ বলল বব! তোমার এবার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। সমাজ ছাড়া লোনলী হয়ে সারাটা জীবনই তো কাটিয়ে দিলে। শেষ বয়সটায় একটু রিল্যাক্স কর। স্থির হও।

রবার্ট ঠোঁটের কাছ থেকে গ্লাস সরাল—কেন বল তো! আমি চমৎকার আছি।

আশরাফ জবাব দিল না। আসলে রবার্ট চমৎকার নেই। স্পেন্সারের পেনশনে ওর দিন খুব একটা সচ্ছলতায় যায় না। তার ওপর আছে বই কিনবার নেশা। আর ল্যাবরেটরীর খরচ। জাফলংয়ের ওদিকে একটা টিলা কিনে খাসিয়া বাংলো তৈরি করেছে। নানা জাতের সীড জোগাড় করে চারা তুলছে। কলম কাটছে। এক্সপেরিমেণ্ট করছে। পোকা মাকড় ঘাস পাতা যা চাগাছের ক্ষতি করতে পারে এসব নিয়ে ইদানীং ভীষণ মেতে উঠেছে। চা গাছের সয়েল ময়েসচার সীড নিয়ে একটা থিসিস লিখবার পরিকল্পনাও আছে রবার্টের। রবার্টের বিশ্বাস আসাম টি, সীলোন টি আর ওয়েস্টার্ণ টির মিক্স ব্রিডিংয়ে ও না কি একটা নতুন ধরনের উন্নত চা আবিষ্কার করে ফেলবে। অথচ আশরাফ জানে মাঝে মাঝে ভীষণ আর্থিক কষ্ট যায় ওর।

বলরুমের মৃদু আলোয় রবার্টের মুখটা একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তবু মৃদু হাসি ওর ঠোঁটে। বলল—ওয়েল ইয়ং ম্যান। আমি জানি তুমি আমার জন্য ভাব। কিন্তু বলতে পারো পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে ইংল্যাণ্ড আমি ছেড়ে এসেছিলাম। সেখানে আমি কি পাবো এখন। ইউ নো

সারা পৃথিবী কত বদলে গেছে। ব্রিস্টলে আমাদের সেই বাড়িটা গতবার গিয়ে আমি চিনতে পারি নি। আমার কি মনে হয়েছে জানো?

আশরাফ কথা বলল না। রবার্ট ওর গ্লাসটা ভরে নিল—মনে হয়েছিল ও দেশটা আর আমার দেশ নয়। সেখানে আমি বিদেশী। সত্যি কথা বলি—আই'ইল বি অ্যান আপ রুটেড প্ল্যান্ট দেয়ার।

রবার্ট হাসতে লাগল—বাট আই'ম ফাইন হিয়ার। চায়ের পাতার গন্ধের একটা অ্যাডিকশান আছে। এই সবুজের নেশা মানুষকে গ্রাস করে ফেলে।

রবার্টের কথাটার সূত্র আশরাফকে অন্যমনস্ক করল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শেষ যুগে এদেশে ইংরেজরা চায়ের চাষে উৎসাহী হয়ে ওঠে। তখন অর্থগৃধ্নু পরিশ্রমী অ্যাডভেঞ্চারাস ইংরেজ যুবকেরা আসত প্ল্যানটেশানে। প্রচুর অর্থ রোজগার করে দেশে ফিরে লর্ড ডিউকদের মত আয়েশী জীবনে স্বপ্ন ছিল তাদের গন্তব্য। কিন্তু সবাই ফিরে যেতে পারে নি। এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে রাজঘাট বাগানের দিকে গেলে চোখে পড়ে অসংখ্য কবর। কবরের ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে অনেক নাম। পাওয়েল ১৮৬০। আর্থার বুশ ১৮৫৪। সিম্পসন টেলর ১৮৯০ এমনি অনেক অচেনা নাম। তারা অনেকেই ছিল বাগানের বিভীষিকা। অসুরের মত পরিশ্রম করত। শয়তানের মত করত অত্যাচার। অনেকে লাম্পট্যের চূড়ান্ত কলংকিত ইতিহাস রেখে গেছে।

আবার বহু প্ল্যান্টার কর্মঅন্তে ইংল্যান্ডে ফিরে গেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে প্রচুর সম্পদ ইন্ডিয়ার এই পূর্বপ্রান্তের রেয়ার কালেকশান, চায়ের দুর্লভ ইতিহাস আর কালো মানুষগুলোর প্রতি ঘৃণা দেখানোর ব্রিটিশ সুলভ স্নবারি। কোন সবুজ নেশায় আসক্ত হয়ে তারা তো থেকে যায় নি। তবু কেউ কেউ থাকে।

রবার্ট ডাকল হ্যালো বয়! কি হল তোমার? টিপসী ফিল করছ?

আশরাফ ঝরঝরে হাসল ওঃ নো। নট অ্যাট অল। আচ্ছা শোন এবার কাজের কথায় আসি। আমাদের ছ'নম্বর সেকশানে বুশগুলোতে সিকনেস দেখা দিয়েছে। সেইজন্যই তোমাকে খবর দিয়েছি।

রবার্ট মনোযোগ নিবদ্ধ করল আশরাফের কথায়। বলল—তোমার ছ'নম্বর সেকশানের বুশের বয়স তো বেশি নয়।

আশরাফ বলল—না খুব বেশি নয়। বছর দুয়েক হবে। কয়েকটা সেকশানেই তো মাত্র নতুন প্ল্যানটেশান করা হয়েছে।

—পাতার রং কেমন মনে হচ্ছে?

—পাতাগুলো হলুদ হয়ে যাচ্ছে। ডালের ওপর লালচে গুটি বের

হয়েছে।

—বুঝেছি। আমার মনে হয় ছ'নম্বর সেকশানের বুশে রেড রাস্ট ডিজিজ দেখা দিয়েছে। ওখানে সম্ভবত গাছগুলো রোদ দরকার মত পাচ্ছে না। কাল ওর ড্রেনেজ সিস্টেমটা একটু দেখতে হবে।

কলবল করতে করতে রিণা এল—এই। এখানে কি করছ? এদিকে আমি তোমাকে খুঁজে সারা।

আশরাফ রিণার দিকে তাকাল—তোমার হাউসী শেষ হল?

—ওঃ। ডিনার সার্ভ করা হচ্ছে ওদিকে। অথচ তুমি যে কি মানুষ। এখানে একা এসে বসে-আছ।

—একা কোথায়। ববের কম্পেনী খুব চমৎকার ভাবে উপভোগ করছিলাম।

এতক্ষণে যেন রবার্টকে লক্ষ্য করল রিণা। নিরুত্তাপ হাসিতে বলল - হ্যালো!

তারপর আশরাফের দিকে ফিরল-জানো আজ আমি লাকী প্রাইজ উইন করেছি।

আশরাফ উৎসাহিত হল—বটে!

—ওঃ নিশ্চয়ই। এখনি দেখাব তোমাকে।

রিণা মিহি কণ্ঠ তুলে ডাকল—বেয়া...আ-রা।

যাও পিকচার ঠো লে কে আও।

হিন্দীতে হুকুম দিয়ে রিণা বলল—গাড়ির চাবি কার কাছে? পেছনের বুটটা খুলে দিতে হবে।

আশরাফ খালি গ্লাসটা রাখল—আছে সোফারের কাছে। কি এমন বিরাট বস্তু তোমার উইনটা শুনি?

রিণা লাল ঠোঁটে হাসির ঝিলিক তুলল—দেখবে। দেখবে।

বেয়ারা বিরাট একটা অয়েল পেইন্টিং নিয়ে এল। রিণা নিজেই উঠে গিয়ে দু'হাতে ছবিটি উঁচু করে ধরল।

—জাস্ট হ্যাভ এ লুক।

রিণার প্রসাধিত মুখ হাল্কা শরীর ছবিটার ব্যাকগ্রাউণ্ডে সুন্দর একটা ফ্লগসের মত তীব্র উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ছ'ইঞ্চি স্লীভলেস ব্লাউজের নিচে ওর ফরসা মোমের মত সাদা পেট পিঠ আর উন্নত গ্রীবা যেন মায়াবী নেশা ছড়াচ্ছে। রিণার সৌন্দর্য এই মুহূর্তে আশরাফকে মুগ্ধ করল। রিণার দিকেই তাকিয়ে রইল সে। রবার্ট উঠে মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। হৈ চৈ করতে করতে এল ইফতেখার, ইরশাদ আর গোমেজ্। ইরশাদ বলল—ভাবী ইজ আ ওয়ান্ডারফুল উইনার। আশরাফ ইজ রিয়েলী

আ লাকি গাই ফর হ্যাভিং সাচ আ নাইস ওয়াইফ।

ইরশাদের ইয়াংকী মার্কা ইংরেজীতে বাধা দিল ইফতেখার--এমন চার্মিং প্যারসোন্যালিটিকে গৃহিণী পেয়েছে বলেই তো চাকরিতে এত চমৎকার লিফট...।

কথার গতির রশি টানল রিণা নিজেই--তোমরা সব হাই হয়ে আছ। তাই সবাইকেই হাই প্লেনে তুলে ফেলছ।

গোমেজ হেসে উঠল--ও, কে। ইট'স অল রাইট। লেট'স গো টু দা ডাইনিং টেবল। রাত হয়েছে।

ছবিটা গাড়ির বুটে তুলে দিয়ে ডাইনিং হলে এল রিণা। হলটা হাসি গল্পে গম গম করছে। প্লেট হাতে রিণার পাশে এল মিসেস জুবেরী --রিণা! আজ কি কান্ড করেছে জান মিসেস ইরশাদ।

রিণার প্লেটে খাবার সার্ভ করল বেয়ারা। টেবিল থেকে ফর্ক নিয়ে রিণা প্রশ্ন করল কি ব্যাপার?

--ওঃ ফানি ব্যাপার। এমন একটা ইংরেজী বলল! আমার তো হাসি চাপা দায়।

--রিয়েলি?

--তবে আর কি বলছি।

--মিসেস গোমেজকে ওর কুকের গল্প করছিল। কুকটা না কি একেবারে ওয়ার্থলেস। কোন স্পেশাল ডিশ করতে পারে না। তার ওপর প্রচন্ড কুড়ে। ফাঁক পেলেই না কি ঘুমায়।

রিণা প্লেটে মনোযোগ দিল--ওঃ। এই ব্যাপার।

মিসেস জুবেরী খুক খুক করে হাসল--আমাদের মিসেস ইরশাদ বলছে 'কুকটাকে তাড়িয়ে দিতাম' কিন্তু তাড়াই না এইজন্য যে চাকরি গেলে ও খাবে কি! হু উইল গিভ হিম রাইস।

প্লেট হাতে নিয়ে হাসিতে দুলতে লাগল মিসেস জুবেরী। হাসতে হাসতেই বলল--কি নেটিভ ইংলিশ! হরিবল।

রিণা অল্প হাসল। মিসেস জুবেরী পুরোনা গার্ডেনারদের রীতিনীতি অনুকরণ করতে ভীষণ যত্নশীলা।

দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী মিসেস গোমেজ এল--হ্যালো! কি এত গোপন শলা পরামর্শ হচ্ছে। জানতে পারি কি?

মিসেস হেলেন গোমেজ আজ শাড়ি পরেছে। রিণা বলল হেলেন! শাড়িতে তোমাকে যা চমৎকার লাগছে। একেবারে হেলেন অব ট্রয়।

হেলেন বৃষ্টি ধোয়া লিলির মত হাসল--থ্যাংক ইউ ফর দা কমপ্লিমেন্টস। কিন্তু ইওর হাইনেস, তোমাকে কি তা হলে ক্লিওপেট্রা বলব?

ভ্যালি ক্লাবে তোমার পদক্ষেপ ঘটলেই ইয়ং চ্যাপগুলো উইথআউট ড্রিংকসে মাতাল হয়ে যায়।

হেলেনকে কপট তাড়না করল রিণা—ওঃ নটি গার্ল! বেশি বাজে বোক না। তুমি তো একেবারে স্কচ হুইস্কী।

মিসেস জুবেরী কষ্টে হাসি ধরে রাখল মুখে। এত ডায়াট করেও শরীরটা বশ মানছে না। জীনস পরতে পারে না। বেলবটম পরলেও কিম্ভূতকিমাকার দেখায়। হঠাৎ বলল আচ্ছা, শুনেছি ঢাকায় বিউটি পারলারে ফিগার ট্রিম করবার ব্যবস্থা আছে। গেছ না কি তোমরা?

ওদিকে তখন আরেকটা চক্র তৈরি হয়েছে মিঃ অ্যান্ড মিসেস হাশেমকে নিয়ে। আজকের ক্লাব-ডে তে সিলেট থেকে গেস্ট হয়ে এসেছেন তারা। মিঃ হাশেম দীর্ঘকাল চা বাগানে কাটিয়েছেন। এখন নিজে একটা বাগানের মালিক। ভ্যালি ক্লাবের মেম্বারশীপ আছে তার।

মিঃ হাশেম নতুন ম্যানেজারদের উদ্দেশ্য করে বললেন— লুক ইয়ং মেন। চা বাগানের চাকরিটা হচ্ছে একটা স্পোর্ট। তবে এর একটা আলাদা ডিসি-প্লিন আছে। আগে তো এসব ক্লাবে ইয়োরোপীয়রা অন্যদের এলাউ করত না। বিকজ দে নিউ হাউ টু রান এ গার্ডেন। এই যে আজকাল ক্লাবে কে রু র ড্রিংকস বিক্রি হয়। ওঃ হরিবল। রিয়েলি আমি খুব হার্ট হই। যখন বাগানের সোসাইটির এই অধঃপতন দেখি।

কে যেন বলল -মিঃ হাশেম। এটা তো প্রলেতারিয়েতের দেশ। মিঃ হাশেম উদ্দীপ্ত হলেন -দেয়ার ইউ আর। আসলে এই প্রলেতারি-য়েতের ভূতটা আমরা এখনও ঘাড় থেকে নামাতে পারি না। আমার গার্ডেনে কড়া হুকুম আছে মাই ম্যানেজার উইল নেভার ভিজিট অ্যাসিস-ট্যান্ট ম্যানেজার। ডিসিপ্লিন না থাকলে...

মিসেস হাশেম বললেন— সত্যি ইংরেজরা গেছে। বাগানের সে ডিগনিটি নেই। আজকাল শুনি খানসামারা পর্যন্ত সাহেব মেমসাহেবদের সামনে টুলে বসে। এটা তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আর ক্লাবগুলোর যা দুরবস্থা দেখছি। যে কেউ এসে ঢুকলেই হল।

ক্লাবের বারান্দায় একটা প্লেট নিয়ে একা একা খাচ্ছে রবার্ট। দূরের টিলাগুলো কালচে জ্যোৎস্নার চাদর মুড়ে থমথমে নিস্তব্ধতায় নিশ্চুপ। বাঁশ ঝাড়ের ওপরে চাঁদটা ভারি বিষণ্ন। দূর থেকে বার্কিং ডিয়ারের ডাক ভেসে আসছে। কি একটা পাখি করুণ সুর টেনে ডাকছে। পাখির ডাকে এক পলক মনোযোগ রাখল রবার্ট। বোধ হয় কোয়েল হবে। এই সময়-টাই তো ওদের নেসটিং টাইম। বেয়ারা এল সুইটসের ডিশ নিয়ে—সাহাব। পুডিং।

মুখ তুলল রবার্ট—কাসেম আলী। কেমন আছ!

কাসেম আলীও বুড়ো হয়েছে। রবার্টের বাংলোয় বিশ বছর কাজ করেছে। এই কাজ পাগলা একটু অন্য ধরনের সাহেবের প্রতি তার ভীষণ মায়া আর আনুগত্য। ভ্যালি ক্লাবে রবার্টই তাকে বহাল করে গেছে। কাসেম আলী পুডিং এগিয়ে দিয়ে বলল—আছি সাহাব ভাল। বুড়ো হয়েছি। আর ক'দিন কাজ করতে পারব জানি না। আমার ছেলেটা বেকার বসে আছে প্রায়ই পেটের ব্যথায় আধমরা হয়ে পড়ে থাকে।

—ওঃ। ভেরি স্যাড। রবার্ট দুঃখ জানাল।

কাসেম আলী সালাম দিয়ে চলে গেল। খুব উদ্বিগ্ন মুখে দূরের জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন টিলায় তাকিয়ে রবার্ট বিষণ্ণ বোধ করল। কি করা যায় কাসেম আলীর ছেলেটার জন্য। এই মুহূর্তে রবার্ট ভুলে গেল চা বাগানে সে একটি অতীত ইতিহাস মাত্র। এখানে এখন আর তার কোন ক্ষমতা নেই। বাসা বাঁধায় উদ্‌গ্রীব কোয়েলটা সুর টেনে ডেকেই চলেছে। সুরটা দিগন্ত বিস্তৃত চা বাগানে দূরের বনে করুণ নিঃসঙ্গতা ছড়াচ্ছে।

গাড়িতে উঠে রিণা সরাসরি আক্রমণ করে বসল আশরাফকে তোমার এমন অদ্ভুত ব্যবহারের কোন অর্থ হয় না। সবাই তো রীতিমত হাসা-হাসি করছিল।

চাঁদ ঢেকে আছে এক টুকরো মেঘ। চারিদিকে চাপ চাপ অন্ধকার। গাড়ির ভেতরেও অন্ধকার। গাড়ি চালাচ্ছে সোফার। আশরাফ প্রশ্ন করল—হাসির কারণটা?

রিণার কন্ঠের ক্ষোভ অন্ধকারের বুকে আঘাত করল এতদিন বাগানে থেকেও সোসাইটির নিয়ম কানুনগুলো তোমার কি ইচ্ছে করেই ভুল হয়? রবার্টকে নিয়ে তুমি আজ বেশি বাড়াবাড়ি করেছ! জানো সবাই ওকে পাগল বলে। কারো গেস্ট না হয়েই ও ক্লাবে এসে উপস্থিত হয়েছে।

—ও তো আমার গেস্ট ছিল।

- কই তুমি তো বল নি সে কথা!

—সব কথাই বলতে হবে এমন কোন নিয়ম করে দিয়েছে না কি? কবে থেকে?

—আসলে তুমি সব জায়গায় একটা অন্যরকম কিছু করে বাহবা পেতে চাও। তুমি কি জান না ম্যানেজারদের সিনিয়রিটির র‍্যাংকে উঠতে হলে কত নিয়ম কানুন এটিকেট মেনে চলতে হয়।

আশরাফের কণ্ঠ এবার কঠিন হল—রিণা। ইংরেজ আই. সি এস-দের

অনুকরণে আমাদের সি. এস. পি-রা অনেকে নিজেদের একটা মেকী বুরো-ক্রেসীতে আইসোলেট করে রেখেছে। কিন্তু আসলে তারা তো রুলার নয়। তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আর চা বাগানের ইংরেজদের আমদানী করা কতগুলো বিদেশী ঔপনিবেশিক এটিকেটের অন্ধ অনুকরণে আমা-দের প্ল্যান্টাররাও নিজেদের ওই শ্রেণীতে তুলতে পাগল। ইট'স অ্যাবসার্ড।

রিণা ক্ষেপে আগুন হল—তুমি বলতে চাও কি?

—বলতে চাই আমরা প্ল্যান্টার হতে চাই। রুলার নয়। হতে চাই বোতলের হুইস্কী। ব্রাট নট দা এম্প্টি বট্ল। কারণ আমরা এ দেশের শাসক নই। এদেশ আমাদের। গার্ডেনাররা শুধু চা বাগানের নয় ছিল সারা দেশের শাসক। তাদের মত অন্তত আমি নই।

রিণা ক্লান্ত পরাজিতা ভূমিকা নিল—তোমার মত অত কথা আমি জানি না। তবে সার্ভিসের ক্ষতি করে লাভ কি।

আশরাফ প্রায় ধমকে উঠল—দ্যাট'স মাই বিজনেস। রিণা তুমি অ্যাব-জরব করতে চেষ্টা না করে অ্যাবজরবড হয়ে যাচ্ছ। ভুলে যেও না তোমার আমার দু'জনেরই একটা অতীত ছিল। আর তা ইংল্যাণ্ডের নয়।

রিণা আর জবাব দিল না। গাড়িটা নিঃশব্দে রাতের পরদা ছিঁড়ে ছুটছে। আশরাফের খোঁচায় ক্ষোভে জ্বলছে রিণা। আশরাফ রেগে গেলেই রিণার অতীতটা মনে করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের শতকরা কত জনেরই বা রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয়! হতে পারে রিণার বাবা এমন কিছু বড় চাকুরে ছিলেন না। কিন্তু মেয়েদের কি বাবার পরিচয়ই সব? স্বামীর গৌরবটা কি কিছু নয়? ক্ষোভ রাগ ছাপিয়ে হঠাৎ অভি-মানে মন ভরে উঠল রিণার। অন্ধকারে ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল সে। আশরাফ অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টানছে। রিণার মনে পড়ল বিয়ের পর চা বাগানে এসে প্রতিপদে কত ধাক্কা খেতে হয়েছে। এমন কি আশরাফের সঙ্গে চাকর বাকরদের সামনে বাংলায় কথা বললেও তাকে অপদস্ত হতে হয়েছে। বেয়ারা হাসাহাসি করেছে—ই কেমুন মেম-সাহাব আছে রে? অংরেজী ভি বলে না। হিন্দী ভি জানে না। টেব্ল লাগাও বলে না। বলে 'খাবার দাও।' টেবিলে খাবার সময় মাছের পেয়ালাটা দু'বার চেয়েছিল রিণা। পরদিন আয়া গল্পে গল্পে শুনিয়েছিল —হামরার আগের সাহাব বিলকুল মছ্লী খাইত না। মেমসাহাব তো আরো বেশি খুঁত খুঁত করত। কেলাব-ডের পরের দিন বেলা বারোটা তক ঘুম যাইত রে।

ক্লাবে গিয়েও প্রথম প্রথম কম নাজেহাল হতে হয় নি। অনেকের চোখের হাসি, শীতল কটাক্ষ হজম করতে হয়েছে। ব্রিটিশ সুপারিন-

টেনডেণ্ট আর তার স্ত্রীকে উইশ করতে ভুলে গিয়েছিল বলে আশরাফই তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। বলেছে এখানকার সোসাইটির নিয়ম কানুনে অন্যরকম। এগুলোতে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আর এখন সেই আশরাফই তার অতীত মনে করিয়ে দিচ্ছে। রিণা আবার রুমালে চোখ মুছল।

পাঁচ

স্পেনসার কোম্পানীর বাগানের কুলিরা আজকে ছুট্‌টি করেছে। পাড়ায় পাড়ায় ভয়ংকর ব্যস্ততা। বিন্দিয়া স্নান করে ধোয়া শাড়িটা পরে বাড়ি থেকে বের হল। রাজিন্দর আজ ক'দিন থেকে মহা ব্যস্ত। পঞ্চায়েত থেকে কয়েকজনের ওপর যজ্ঞের ভার দেওয়া হয়েছে। কেনাকাটার দলে আছে অবশ্য ছত্রি পাড়ার পুরুষেরা। রাজিন্দর, বিষ্ণু, অর্জুন, লক্ষণ সবাই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চাঁদা তুলেছে। যজ্ঞের জোগাড়যন্ত্র করেছে। কাঠ কাটা হয়েছে প্রচুর। সবাইকে তাক লাগিয়েছে খোদাল উড়িয়া চন্দর। সে কিছু চন্দন কাঠ জোগাড় করে ফেলেছে। বিন্দিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল পাড়াটা প্রায় খালি। মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই চলে গেছে মণ্ডপ ঘরে। দ্রুত পা চালিয়ে বিন্দিয়া মণ্ডপ ঘরে এসে পেঁছিল। মাঠটা ভিড়ে গিজ গিজ করছে। মণ্ডপ ঘরের চত্বরে বড় দুটো ভারায় ঘি সাজান রয়েছে। পাশে রাখা হয়েছে কাঠের স্তূপ। ধূপ জ্বলছে চারিদিকে। ছত্রি বৃন্দাবন খুব উত্তেজিত হয়ে ডাকল—আরে পণ্ডিতকে তো নিয়ে আসতে হবে। করছিস কি তোরা?

অর্জুন পাশেই ছিল। বলল--পণ্ডিত এসে পড়বে এখনি।

শুকলাল বলল--এলেই তো হল না। লগনের আগে তো আসতে হবে।

ওদিক থেকে রাজু চেঁচিয়ে বলল—পণ্ডিত কি আর লগন জানে না ভেবেছ কাকা! এসে যাবে ঠিক।

শুকলাল চটে উঠল—তুই ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না তো ছোকরা। ঠাকুর দেওবতার দস্তুর কি সোজা ব্যাপার না কি!

রাজু আর কথা বাড়াল না। অর্জুন সুযোগ পেয়ে বলল--পণ্ডিতকে আনবার জন্য লোক চলে গেছে।

বিষ্ণু খুব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল— ও দাদা। পণ্ডিত এসে গেছে।

পঞ্চায়েতের সদস্যরা একটা চাটাইতে বসেছিল। ব্যস্ত হয়ে তারা ছুটে গেল পণ্ডিতকে এগিয়ে আনতে। কে যেন চেঁচিয়ে বলল—এই রেণ্ডীরা।

সব বসে যা। বসে যা। দাঁড়িয়ে হল্লা করিস না।

সবাই বসে পড়ল। ব্রাহ্মণকে নিয়ে পঞ্চায়েতরা এগিয়ে এল। সসম্ভ্রমে আসন পেতে দিল। সবাই এক সঙ্গে সোর তুলল--নমস্কার পন্ডিতজী। তিলক কাটা ব্রাহ্মণ বসে বললেন--এখনও কুন্ড তৈরি হয় নি যে। লগ্ন বয়ে গেলে তো কাজ হবে না।

ব্রাহ্মণের সহকারী একটা পাঁজি খুলে মনোযোগ দিয়ে পৃষ্ঠা উল্টে লগ্ন দেখতে লাগল। ছাত্র কুলিরাও কুন্ড তৈরি করতে লেগে গেল। সবাই উৎসুক আশান্বিত চোখে তাকিয়ে দেখছে। হোম কুন্ড তৈরি হচ্ছে।

একটু দূরে শিরীষ গাছটার নিচে অনেকগুলো পাঁঠা বাঁধা। পাঁঠা-গুলোকে সকালে স্নান করিয়ে তেল সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞের শেষে ওগুলোকে বলি দেওয়া হবে। হরিয়া খুব খুশি মনে পাঁঠা-গুলোর পাশে বসেছিল। ভারি আনন্দ লাগছে তার। যজ্ঞ হবে। বলি হবে। বড় বড় হাঁড়িতে ভাত আর মাংস রান্না হবে। সেই গতবার দুর্গা-পুজোর পর হরিয়া আর পাঁঠার মাংস খায় নি। সন্ধ্যার পর তো হাঁড়িয়া চুয়ানীর ঢল বয়ে যাবে। ছাগলগুলো কাঁঠাল পাতা চিবোচ্ছে। হরিয়া আপন মনে বলল--খা, খা, খেয়ে নে। এরপর আমরা তোদের খাব। কাছেই চামেলী বসে ওর সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছিল। হরিয়া হাতের ইশারায় চামেলীকে ডাকল। চামেলী জবাব দিল না। ওর বন্ধুরা হাসল। একজন বলল--যা রে চামবেলী। না হইলে উ তো নিজে বলি হইয়ে যাইবেক।

সুরেলা কন্ঠে হেসে উঠল সবাই। বড়দের মধ্য থেকে কে যেন ধমক দিল--ছোকরিগুলোর সব সময় তামাশা। এখন কি রং করবার সময় না কি রে?

হাসি বন্ধ হল। চামেলী উঠে এসে দাঁড়াল হরিয়ার সামনে--হেই ড্যাকরা। ওরকম চোরের মত ডাকছিস কেনে? লাজ শরম নাই তুহার?

চামেলী কি চমৎকার শাড়ি পরেছে। আঁটসাঁট খোঁপা বেঁধেছে। হরিয়া বিগলিত হল--রাগ করছিস কেন রে? বস। আজ লাচবি হামার সঙ্গে? হামি ঝুমুর লাচব।

চামেলীর কালো চকচকে মুখ ঠাট্টার হাসিতে ভরে উঠল--তোর সঙ্গে নাচব না আমি। ভুলুয়াকে বলেছি ওর সঙ্গে নাচব।

হরিয়ার মুখটা একটু ম্লান হল--কেন নাচবি না রে আমার সঙ্গে?

চামেলী মুখ টিপে হাসল--না খেয়ে খেয়ে তোর পা দুটো লাকড়ীর মত সরু হয়ে গেছে। ও পায়ে তাল দিবি কেমন করে?

হরিয়া রেগে উঠল--ওঃ ঠমক কত ছোকরির। জানিস আমি আর ই বাগানে থাকব না। চলে যাবো রাজঘাটে। অনেক বড় বাগান। পাতা

তুলে অনেক পয়সা কামিয়ে মহাজনের মত বড় দোকান দেব।

চামেলী ভেংচী কাটাল—হঃ রে। আমার বিশ মণ ঘি বানিয়ে রাধার লাচ দেখাবে রে। কে তোকে কাম দেবে। সব বাগানে বলে কুলি ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে।

হরিয়া বিজ্ঞ হাসল যজ্ঞ হলে সবাই কাম পাবে। আমিও পাবো।

সবারই এক আশা। যজ্ঞে দেবতা খুশি হবে। বেকার কুলিরা কাজ পাবে। বাগানে অনেক পাতা উঠবে। সকলের রুজী বাড়বে। হোম কুন্ড জ্বলে উঠেছে। ব্রাহ্মণ পঞ্জিকায় দেখেছেন সূর্য মধ্যগগনে যাবার আগে শুভযোগ রয়েছে। পন্ডিতকে তার সহকারী অনুচর যজ্ঞের আনুষঙ্গিক তর্পণ এগিয়ে দিচ্ছে। পন্ডিত খুব গম্ভীর মুখে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করছে।

ঘিয়ের ভারা এনে আগুনে ঢেলে দিল দুজন ছাত্র। ঘি আর চন্দন কাঠ পোড়ার বিচিত্র সুগন্ধে বাতাস সুরভিত। তার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে ধূপধুনার গন্ধ। বৈশাখের রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। ঘি, চন্দন কাঠ আর ধূপের গন্ধের সঙ্গে ব্রাহ্মণের দ্রুত মন্ত্র উচ্চারণ চড়া রোদের দুপুর-টায় কেমন পবিত্র আশার আবহাওয়া নেমে এসেছে। ঘিয়ের আগুনে আশান্বিত চোখে তাকিয়ে আছে কালো মানুষগুলো। রজর মা মনে মনে বলল —ভগওয়ান! আমার রজকে ফিরিয়ে এনে দাও।

বিন্দিয়া প্রার্থনা করল—রাজিন্দর যেন সংসারী হয়। ওর ওপর থেকে কমলীর যাদু ছুটে যায়।

লছমী কামনা করল তার বড় ঘরটার টালি দিয়ে জল পড়ে। ভগ-ওয়ানের কৃপায় এবার বর্ষার আগে ঘরটা সারাই করবার পয়সা যেন তারা নিজেরাই জমিয়ে ফেলতে পারে।

চঞ্চলা চাইল—ভগওয়ান আমাদের কামাইটা বাড়তি হোক। ক্ষেতের ফলন ভাল হোক। মহাজনের ধার সব শোধ করে দিয়ে বালবাচ্চাগুলোকে পেট ভরে খেতে দিতে পারি যেন।

তবে সেই পবিত্র ঘৃতাগ্নিতে তাকিয়ে একটা বিশেষ প্রার্থনা সকলেই করল। বরষাত হোক। আকাশে মেঘ আসুক। সবুজ চায়ের পাতায় বাগান ভরে যাক। সবাই বেশি করে পাতা তুলে বাড়তি কমিশন রোজগার করুক। সবাই কাজ পাক। তলবের টাকা লক্ষ্মী হয়ে ঘরে বাঁধা থাকুক।

ভারা বোঝাই ঘি আর বোঝা বোঝা কাঠ পুড়ে শেষ হল। সাদা ধোঁয়ার কুয়াশা মন্ডপঘরের চারিধার ঢেকে রইল অনেকক্ষণ। এক সময় যজ্ঞ শেষ হল। পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রাচীন বুড়ো শিবলাল চেঁচিয়ে উঠল —পাঁঠা আন। বলি দিতে হবে।

বলি শুরু হল। এক একটি পাঁঠার ছিটকে ওঠা রক্তে তাকিয়ে সকলে জোড় হাত করে প্রার্থনা করল দেওতা। আমাদের বলি গ্রহণ কর। আমা-দের বাগানে পাতা দাও।

বলি শেষ করে পঞ্চায়েত ঘরে ফলার করতে বসলেন ব্রাহ্মণ ও তার অনুচর। বাইরে প্রচণ্ড আনন্দের বিচিত্র কলরোল। মরা পাঁঠাগুলোকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে চামড়া ছাড়াতে লেগে গেল কয়েকজন। মাঠের মধ্যে বড় চুলো করে বিরাট বিরাট ডেকচিতে ভাত বসান হল। রান্নার কাজে ছত্রি-মেয়ে পুরুষ ছাড়া অন্যের হাত লাগান নিষেধ। দূরে থেকে জটলা গল্প আর নানা মন্তব্য করতে লাগল সবাই। যজ্ঞের প্রাণামী নিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় নেবার সময় সবাই আর একবার গড় হয়ে প্রণাম ঠুকল। যেন এই মুহূর্তে কয়েক শ' কুলির ভাগ্য ফিরিয়ে দেবার অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

রান্না শেষ হতে হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে এলেন অ্যাসিস-ট্যান্ট ম্যানেজার আর টিলাবাবু। বাবু পাড়ায় সাহেবদের বাংলোয় নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে পঞ্চায়েতের মাতব্বররা। এত হৈ হুল্লা ফূর্তির মধ্যেও সবাই তটস্থ হয়ে গেল। চারিদিক থেকে সালাম বর্ষিত হতে লাগল। ছোট সাহেব একটু ঘুরে দু'চার কথা বলে মটর সাইকেলে উঠলেন। বিষ্ণু ছুটে এল--সাহাব। আমাদের খানা আপনাকে দিতে পারি না। একটু মিঠাই খেয়ে যান সাহাব।

অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার নিরুত্তাপ উদারতায় বলল--যা। মিঠাই লাগবে না। এই তো এসে দেখে গেলাম।

অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজারের মটর বাইক গর্জন করে উঠল। কোন ফাজিল কামিন ভিড়ের মধ্য থেকে বলে উঠল রাইতে আসিস সাহাব। রং দেখাব। হামরা গানা গাইব। নাচব।

বৃন্দাবন ধমকে উঠল--এই রেণ্ডী চুপ হো যা।

টিলাবাবু কিছু মিষ্টি জলযোগ করে বিদায় নিলেন। সূর্য পশ্চিম দিকের টিলার মাথায় নেমে আসতেই খাওয়া শুরু হয়ে গেল। প্রথমে বসল মেয়ে বুড়ো আর বাচ্চারা। যার যার জাত অনুসারে আলাদা লাইনে বসেছে সবাই। ছত্রি পুরুষেরা ঝুড়িতে গরম ভাত আর বালতি বোঝাই মাংসের ঝোল নিয়ে ছুটোছুটি করে পরিবেশনে ব্যস্ত। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি চীৎকার চারিদিকে প্রচণ্ড সোরগোল।

চঞ্চলা চেঁচিয়ে বলল--এ বৃন্দাবণ! বুধুয়াকে তো মাংস দিস নাই। বিল্লুর দিকে তাকিয়ে বলল--ভাত নিবি আরো? খা পেট ভরে। ভাল করে খেয়ে নে।

বৃন্দাবণ মাংসের বালতি হাতে ওদিকের লাইনে সামনে ব্যস্ত। লছমী বিন্দিয়াকে বলল—দেখেছিস শ্রীমতীর পাত মাংস আর ভাতে বোঝাই করে দিয়েছে। দু চোখে দেখতে পারি না গিজড়া বদমাইশটাকে।

তারপর চীৎকার করে উঠল লছমী—হেই বিন্দা। আমরা কি খালি কলাপাতা চাটব না কি রে? পঞ্চায়েতে আমরা চাঁদা দেই নাই?

বিনি ওর আট মাসের বাচ্চার মুখে একটু ভাত উঠিয়ে দিল। রজর মা কলাপাতা চেটে খেয়ে আরেক দফা ভাতের আশায় তাকিয়ে ছিল। বলল-হেই বিনি! তোর বেমার টুকিকে ভাত দিচ্ছিস কেন রে?

বিনি উজ্জ্বল মুখে তাকাল—মাসী! দেওতার পরসাদ খেলে তো অসুখ বেমার ভাল হয়ে যেতে পারে।

ওপাশে হরমতী বসে খাচ্ছে। বিনিকে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। তখনি ভাতের ঝুড়ি আর মাংসের বালতি এসে পড়ল সামনে। হরমতী পাতা এগিয়ে দিল-হামাক দে রে। হামাক দে। মাংস তো কম দিলি তখন।

পরিবেশনকারী চোখ রাঙিয়ে উঠল হেই বুড়িয়া। তোকে না এই-মাত্র পাত ভর্তি মাংস দিয়ে গেলাম। ঝুট কেন বলছিস?

হরমতী পাতা ভর্তি ভাত মাংস আদায় করে শান্ত হল। কালিন্দী বুড়ি তোরা তো ছোকরিগুলোকে নিয়েই মেতে আছিস।

মাংসের বালতিওয়ালা বালতি তুলে নিল-যা দেব না তোকে। উঠে যা।

হরমতী এবার উঠে দাঁড়িয়ে গলা ছাড়ল-কেন দিবি না রে? ভাত মাংস কি তোর বাপের। আমরা হফতা থেকে পয়সা দেই নাই? এটা হামরার পূজা না?

প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল। সবাই মিলে গোলমাল থামাতে গিয়ে আরো গোলমাল বাড়ল। শিবলাল তেড়ে এল এই রেণ্ডীরা। বাজার বসিয়ে দিয়েছিস কেন রে!

হরমতী পাতা ভর্তি ভাত মাংস আদায় করে শান্ত হল। কালিন্দী বুড়ি বসেছে বাচ্চাদের সঙ্গে। এক মনে খেয়ে যাচ্ছে কোনদিক না তাকিয়ে। দু'দল উঠে যাবার পরও কালিন্দী বুড়ি উঠল না। পাতাটা বাড়িয়ে অনুনয় করল-এ দাদা আর একটু ভাত দে না। আর একটু মাংস দে।

বৃন্দাবণ তাড়া দিল-আরে তোর পেটে কি রাহু ঢুকেছে না কি? আর কত খাবি? পেট ফেটে যে মরে যাবি। ওঠ ওঠ। জায়গা ছাড়।

কালিন্দী এঁটো হাতে মুখের ওপর থেকে শণের মত পাকা চুল সরাল। লোভী চোখে মাংসের বালতিতে তাকিয়ে আবার অনুনয় করল

—একটু মাংস দে দাদা। আমি বুড়িয়া। মরে যাবো। একটু পরাণ ভরে খেয়ে নেই।

বৃন্দাবণ বলল—হুঁ তুই আর মরেছিস!

লছমী ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেয়ে উঠে হৃষ্টচিত্তে বিনির সঙ্গে গল্প করছিল। বলল—কালিন্দী বুড়িটা রাক্ষসের মত খাচ্ছে। মরবে আজ বুড়ি।

বিনির কণ্ঠে সহানুভূতি ঝরল—আহা খাক। সারাটা বছর ও ভাত চোখে দেখে না। এ পৃথিবীতে কে আছে ওর বল। মেয়ে নাত্নী...

চুপ করে গেল বিনি। কালিন্দী বুড়ির মেয়ে আর নাত্নীর খবর সবাই জানে। বিনিরা যখন খুব ছোট ছিল তখন কালিন্দী বুড়ির মেয়ের কথা উঠলে মায়েরা ধমক দিয়ে বলত চুপ চুপ ওসব কথা বলতে হয় না। অথচ এই বাগানগুলোতে তো এমন কত ঘটনার ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে। এ বাগানে তখন বড় সাহেব ছোট সাহেব দুজনেই ছিল ইংরেজ। আর কালিন্দীর মেয়ে বিম্লা ছিল কুলিপাড়ার নাম করা সুন্দরী মেয়ে। গায়ের কালো রং ঝিলিক দিত। ঝকঝকে দাঁতের সারিতে ও যখন হাসত সব পুরুষের বুক কেঁপে উঠত। টিলাবাবুর খাতায় পাতার হিসাব ভুল হয়ে যেত। পাতার ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বিম্লা যখন দ্রুত ছন্দে হাঁটত তখন কলম ছাঁটাই কাজের যোয়ান পুরুষেরা সেই দ্রুত ছন্দে চোখ রেখে গাছের ডাল না কেটে হাত কেটে ফেলত অনেকে। তার ওপর ছিল চমৎকার গানের গলা। ঝুমুর নাচে ওর পায়ের ছন্দ ছিল মালখানা গাছের পাতার মত হালকা। নিজের জাতের ছেলেরা তো বিম্লার জন্য দল বেঁধে পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিম্লা ছিল ভারি ডাটের মেয়ে। চলা ফেরায় কখনও বেচাল করে নি। সেই বিম্লার কি লেখা ছিল কপালে তা কি কেউ বুঝেছিল। সেবার পাতা তোলার মৌসুম খুব জোরদার। গাছের পাতা যেন কুলিদের হাতকে নিরস্ত হতে দিচ্ছে না। ছুটির দিনও বাড়তি কামাইর জন্য অনেকে কাজ নিচ্ছে। বিম্লাও নিল। রবিবার। শুধু ওভারটাইম তলব কামাইর কামিনেরা কাজ করছে। বিম্লা পাতা তুলছে এক মনে। হঠাৎ মটর সাইকেলের গর্জন উঠল। সর্দার হুশিয়ার করল! ছোট সাহেব আসছে। রবিবারে ছোট সাহেব সাধারণত বাগানে আসেন না। তেইশ নম্বর সেকশানে গাছের গোড়ায় পানি জমে গেছে অবিরাম বৃষ্টিতে। নর্দমা পানি টানছে না। ছোট সাহেব তেইশ নম্বর সেকশানে যাচ্ছিলেন। কুলি কামিনেরা বৃষ্টিতে ভিজে পাতা তুলছে দেখে ছোট সাহেব উড থামলেন। লাল মুখ লাল চুল লম্বা সাহেবটাকে সবাই বাঘের মত ভয় পায়। ভারি মেজাজী আর কড়া সাহেব। উড যেখানে থামল

তার কাছেই পাতা তুলছে বিম্‌লা। সভয়ে হাত তুলে বলল—সালাম সাহাব। বৃষ্টিতে ভিজে বিম্‌লার শাড়ি শরীরে লেপটে গেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আঠার বছর বয়সের ভরাট যৌবনা নারী দেহ। উডের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। একটা কালো যৌবনের চাবুক হঠাৎ তার পুরুষ সত্তাকে প্রচণ্ড আঘাত করল। একটি ক্ষুধার্ত পুরুষ গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। উড এ বাগানে এসেছে প্রায় পাঁচ বছর। এর আগে ছিল আসামের বাগানে। সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম আর ক্লাবে গিয়ে স্পোর্টসের দিন গলফ খেলা ছাড়া আর কোন দিকে মন যায় নি তার। ক্লাব-ডে তে পেট বোঝাই মদ খেয়ে একঘেঁয়ে জীবনকে ভুলে যেত উড। হঠাৎ সেই ছক বাধা জীবনটা প্রবল ভাবে নাড়া খেল।

বিম্‌লা দেখল সাহেব কেমন এক জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ দৃষ্টিকে কুলি মেয়েরা চেনে। ভয় পায় এ দৃষ্টির পরিণামও তাদের জানা। বিম্‌লা ভয়ে দ্রুত কাঁপা হাতে পাতা ছিঁড়তে লাগল। উড নিস্তব্ধ। একটি সুঠাম আকর্ষণীয় শরীরের রেখা নীট হুইস্কীর মত মগজের কোষে কোষে আগুন ধরাচ্ছে। তবু নিজেকে সম্বরণ করল উড। কুলিদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখবার সুদীর্ঘ তালিম নিতে হয়েছে। ম্যানেজার পাওয়েল কড়া লোক। জুনিয়র ম্যানেজারদের আচার ব্যবহারের ওপর নম্বর দিয়ে হেড অফিসে পাঠাবার ব্যাপারে সে অত্যন্ত নিরপেক্ষ। হাঁটা চলা ব্যবহার কাজ ক্লাব রিলাক্সসেশান সব কিছুতে পাস নম্বর না পেলে ম্যানেজার হবার পথ চিরতরে রুদ্ধ। উড আস্তে বলল—কেয়া নাম টোমকো?

বিম্‌লা মাথা না তুলে জড়িত উত্তর দিল—বিম্‌লা।

—বহুত আচ্ছা। আচ্ছাসে পাত্তি উঠাও।

উড আর দাঁড়াল না।

কিন্তু তার সারা চেতনায় একটি কামনা ধরান নারী দেহ আগুনের শিখা হয়ে জ্বলতে লাগল। নারীবিবর্জিত জঙ্গলের জীবনে কেমন করে নিভবে সে আগুন। আরো পাঁচ বছর গেলে তবে সে ওয়াইফ অ্যালাউন্স পাবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সুন্দরীরা এই বিজন বনে এসে প্রথম এক বছর তো ডিপ্রেশানে ভুগবে। তারপর ন্যাকামি আর ভণ্ডামির মুখোশ পরে এই ট্রপিক্যাল কান্ট্রির থকথকে কাদার মত বিশ্রী হয়ে যাবে। ওই তো মিসেস পাওয়েল! বাড়িতে এক বিরাট চিড়িয়াখানা বসিয়েছে। লেপার্ড, বিয়ার, ডিয়ার নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত। এখন মাথায় ঢুকেছে একটা পাইথন জোগাড়ের পরিকল্পনা। ক্লাবে একদিন উডের সঙ্গে নাচবার সময় বলছিল—ওঃ ডিয়ার যদি একটা পাইথন জোগাড় করতে পারতাম। আমার মালী বলেছে জঙ্গল থেকে ধরে এনে দেবে। আরো বলেছে স্নেক চার-

মারদের কাছ থেকে বিষ দাঁত ভাঙা কোবরাও এনে দেবে।

উডের বিশ্রী লাগছিল। তবু বলেছে- বাঃ খুব চমৎকার হবে তা হলে।

মিসেস পাওয়েল আরো উদ্দীপ্ত হয়েছিল -ওঃ তুমি তা হলে আমার আইডিয়াটা অ্যাপ্রিসিয়েট করছ। পাওয়েল তো এসব পছন্দ করে না। আমি কিন্তু হোমে যাবার সময় একটা পাইথন ঠিক নিয়ে যাবো।

উড জানে মিসেস পাওয়েল তার পোষা পশুপাখির ছবি তুলে দেশে ছেলে মেয়ের কাছে পাঠায়। মিসেস পাওয়েল ছেলে মেয়ে দুটোকে পাঁচ বছর পড়তেই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে একে তো পড়ালেখার অসুবিধা। তাছাড়া এই জংলী জগতে ছেলেমেয়েদের সামাজিকতাও শেখান যায় না। মিসেস পাওয়েলকে মাঝে মাঝে করুণা করতে ইচ্ছে হয় উডের। ম্যানচেস্টারের মেয়ে। এমন কিছু অবস্থাপন্ন ঘরের নয়। হাই ইসকুল পড়া শেষ করে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি নিয়েছিল। সারাদিন পরিশ্রমের জীবন ছিল। আর এখন ? আয়া বেয়ারা খানসমা ক্লাব আর অসংখ্য সালামের দৌলতে ইন্ডিয়ায় কার্যরত হোয়াইটদের স্নবারিটা শিখে ফেলতে দেরি লাগে নি। প্রায়ই বলে -বুঝিনা এই ব্লাকগুলো এত অলস কেন! আমার জুরে কেয়ারটেকারটা তো ফাঁক পেলেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

মিসেস পাওয়েল ভুলে যায় এদেশের জল হাওয়ার গুণে তার নিজেরও দিবা নিদ্রাটা রীতিমত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। উড মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়। পাওয়েল ওই ন্যাকা মহিলাকে সহ্য করে কি করে। এদের শরীর থেকে ইংল্যাণ্ডের বাতাসের গন্ধ মুছে গেছে। আবার এখানকার সবুজের সজীবতা এদের স্পর্শ করে নি। পাথর চাপা ঘাসের মত এরা বিবর্ণ। এমনি একজন মহিলাই হবে তার স্ত্রী। তার জন্য মঞ্জুরী পেতে অপেক্ষা করতে হবে আরো কয়েক বছর। কিন্তু জৈবিক চাহিদা তো কোন নির্ধারিত বিষয়ের অপেক্ষায় থাকে না। তাকে কি দিয়ে পোষ মানাবে উড। ওই বৃষ্টিসিক্ত কালো দেহের প্রলোভন উডের আদিম চাহিদাকে জাগিয়ে দিয়েছে। টিলাবাবুর শরণাপন্ন হতে হল উডকে। পরদিন পাতা ওজন শেষ হলে বিমলাকে ডাকল টিলাবাবু। জানিয়ে দিল ছোট সাহেবের নজর পড়েছে বিমলার ওপর। বিমলাকে যেতে হবে সাহেবের বাংলোয়। বিমলা রাগ করল। ঝগড়া করল। তারপর টিলাবাবুর পা ধরে হাউ মাউ করে কাঁদল। কিন্তু টিলাবাবুর কি করবার আছে। সাহেবের কৃপাদৃষ্টি হারিয়ে কি নিজের ক্ষতি ডেকে আনবে! বলল আরে অত ঢং করে কাঁদছিস কেন? সাহেবের বাংলোয় মেমসাহেব হয়ে থাকবি। বেয়ারা খানসমা খাটাবি।

বিম্‌লা ভাল মেয়ে! চাকর খানসমা সোনা রুপোর লোভ তার নেই। লোভে পড়ে কত মেয়েই তো সাহেবদের বাংলোয় গিয়ে উঠেছে কত বাগানে। কিন্তু বিম্‌লা তো তাদের মত হতে চায় নি। তবু বিম্‌লাকে যেতে হল। ক'দিন সে জেদ ধরে থাকবে। জলে বাস করে তো কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না। টিলাবাবু রোজই তাঁর পাতার ওজন কম করে দিচ্ছে। তিন-বার তলব কাটা গেছে। এ বাগান থেকে পালিয়েই বা সে যাবে কোথায়? কুলিদের তখন এক বাগান ছেড়ে আর এক বাগানে গিয়ে কাজ নেবার স্বাধীনতা ছিল না। চোখের পানি মুছে বিম্‌লাকে গিয়ে উঠতে হল সাহেবের বাংলোয়। যাবার আগে কালিন্দীকে জড়িয়ে কাঁদল বিম্‌লা- বিদায় দাও মা। জন্মের মত বিম্‌লা চলল।

কুলি লাইনে তো মাদ্রাজীদের মধ্যে নিয়ম আছে ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে পছন্দ করে নেয় ঘর বাঁধবার জন্য। ছেলে এসে মেয়ের মা বাবাকে জানিয়ে দিয়ে যায় তার পছন্দের কথা। তারপর শুভদিন দেখে মেয়ে নতুন কাপড় পরে খোঁপায় ফুল গুঁজে বাবা মার কাছ থেকে বিদায় নেয়। পছন্দের পুরুষের ঘরে গিয়ে ওঠে। সে যাওয়ার মধ্যে কত আশা আনন্দ আর উচ্ছ্বাস থাকে। মা বাবা হাসি মুখে মেয়েকে বিদায় দেয়। মেয়ে পছন্দের পুরুষের সঙ্গে রাত কাটাবে। দরকার হলে এক মাস। দু'মাস। ছ'মাস। পরস্পরের জীবন সুখের হবে কিনা যাচাই করে নেবার সময় সেটা। তারপর একদিন তারা বড়দের জানিয়ে দেবে বিবাহিত জীবনের জন্য তারা পরস্পরের উপযুক্ত। দু'পক্ষের অভিভাবকেরা বিয়ের আয়োজনে লাগে। কিন্তু একি যাওয়া যেতে হচ্ছে বিম্‌লাকে! কার কাছে বিচার চাইবে সে!

উপযুক্ত রোজগারী মেয়েকে বিদায় দিতে হল কালিন্দীর। সারা জনমের মত মেয়ে চলে গেল। মা ছেড়ে। জাত ছেড়ে। সমাজ ছেড়ে। সাহেব তাকে স্পর্শ করা মাত্র পঞ্চায়েতের বিধানে সে হয়ে যাবে জাতিচ্যুত। তার ছোঁয়া কেউ খাবে না। সব জায়গায় সে হবে অস্পৃশ্য। সাহেবের বাংলোয় বন্দী পাখির মত মাস বছর কাটল বিম্‌লার। এখন তাকে সবাই বলে মেমসাহেব। উডের বিছানায় তিক্ততা ক্রমে ক্রমে এল। সাহেবটা বোধ হয় তাকে মমতাই করতে শুরু করেছিল। বোধ হয় বিয়ে করবার মনস্থও করে ফেলেছিল। পাওয়েল একদিন আফিসে নিজের কামরায় যথেষ্ট ভদ্র ভাষায় কড়া শাসন করল উডকে। কারণ ইয়োরোপীয় সমাজে ব্যাপারটা তো চাপাচাপি ছিল না। পাওয়েল ঠাণ্ডা শাসনে বলল - এসব কি? তোমার তো ফিঁয়াসে অ্যালাউন্স রয়েছে। দেশ থেকে তোমার বান্ধবীকে কোম্পানীর খরচেই তো নিয়ে আসতে পার।

উড নীরব।

পাওয়েল আবার বলল—ওয়েল, তোমার যদি সেক্স হাংগার থাকে কুলি মেয়েদের সঙ্গে করতে পারো বটে। অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ লাইক। অনেকেই করে। তবে তা ঢেকে রেখে। চুপে চাপে। কিন্তু বাংলোয় নিয়ে একেবারে ওয়াইফের মত ট্রিট করা। ইট'স টু মাচ। আমার কাছে তো কমপ্লেন এসেছে। ভ্যালি ক্লাবের মেম্বাররা বলেছে তুমি ক্লাবে না গেলেই তারা খুশি হবে।

উড মৃদু হাসল। নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল- ক্লাবে যারা আসে তারা সবাই কি ক্লীন?

পাওয়েল তার ব্রিটিশী সংযম আর বজায় রাখতে পারল না। উষ্ণ হয়ে উঠল—এটা এখন আর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যুগ নয়। ভেবে দেখো এই চা পাতা থেকে কত স্টার্লিং পাউন্ড বছরে ইংল্যান্ডে যাচ্ছে। সুতরাং বাগানের ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে হবে। আমাদের দেখতে হবে কি করে আমরা বেশি প্রফিট আর্ন করতে পারি। ওটাকে তাড়িয়ে দাও!

উডের ঠোঁটে বিচিত্র হাসি মাই ওম্যান ইজ ক্যারিং। এ অবস্থায় কি করে তাকে তাড়িয়ে দেব!

পাওয়েলের লাল মুখ আরো লাল হল ওঃ গড। তুমি কি তাকে ওয়াইফ ডিক্লেয়ার করতে চাও না কি?

পাওয়েলের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ উড়িয়ে দিল উড এ সম্পর্কে ভেবে দেখব।

- হোয়াট! তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে কুলি মেয়েকে ওয়াইফ ডিক্লেয়ার করলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার চাকরি যাবে?

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল পাওয়েল। উড উঠে দাঁড়াল আমি তা জানি। চলি। আমাকে ফ্যাক্টরীতে যেতে হবে। ওখানে সাফট এর টেপ ছিঁড়ে গেছে। কাজ বন্ধ।

নির্বাক পাওয়েল হতভম্ব হয়ে রইল। একটু নিস্তব্ধ থেকে বলল - উড, তোমাকে আমি স্নেহ করি। ভুলে যেও না তুমি এডিনবরার এক সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে।

উড হাসল- থ্যাংক ইউ ফর দা রিমাইন্ডার মিঃ পাওয়েল।

বিমলাকে ওয়াইফ ঘোষণা করেনি উড। চাকরিটা তাই রয়ে গিয়েছিল। তবে ম্যানেজার হবার ব্যাপারে ডিসকোয়ালিফাইর মার্ক পড়েছিল তার ফাইলে। ব্রিটিশ গার্ডেনারদের চোখে কিছুটা নীচে নেমে গিয়েছিল উড। কে না জানে নিজেদের মধ্যে ব্রিটিশরা ভদ্রতার সীমা বজায় রাখতে অত্যন্ত সচেতন। ভুলেও কেউ বিমলা সম্পর্কে প্রশ্ন করত না উডকে। তবে তার বাংলোতে আসাটা সযত্নে পরিহার করেছিল সবাই। সবার নীরব

বিদ্রূপ সহ্য করে এক রকম সমাজ ছাড়া জীবন কাটছিল উডের। কিছু-দিন পরে কি এক দুর্বোধ্য জ্বরে পড়ল উড। ইংরেজ ডাক্তার মিচেল আসত তাকে দেখতে। বিমলা জানত বাংলোর মেমসাহেব হলেও অন্য গোরা সাহেবরা এলে তাদের সামনে যাবার নিয়ম নেই কালো মেমসাহেবদের। কিন্তু উডের অসুখে ভীষণ বিচলিত হয়েছিল সে। বিমলা সারা রাত ঘুমোয় না। উডের পোষা অ্যালশিয়ানটার সঙ্গে সেও পোষা জীবের মত আনুগত্যে সারা রাত বসে থাকে। বেশি জ্বরের সময় মাথায় জলপট্টি দেয়। ঘেমে গেলে টাওয়াল দিয়ে শরীর মোছায়। ওষুধ খাওয়ায়। মিচেল এসে একদিন উডকে বলল--তোমার ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া দরকার। ইউ নীড লং রেস্ট। তাছাড়া আবহাওয়ারও পরিবর্তন হবে।

আড়াল থেকে কথাটা শুনেছিল বিমলা। মিচেল বেরিয়ে যাবার সময় বিমলা ছুটে এল--হেই ডাক্তর সাহাব। হামার সাহাবের এ কি বেমারী হইল। একটু ভাল দাওয়াই দে সাহাব।

বিমলার উদ্‌ভ্রান্ত মুখে তাকিয়ে মিচেল মৃদু হাসল যা বিলেতে চলে যা তোর সাহেবের সঙ্গে। কাল রং সাদা হয়ে যাবে। আর তোর সাহে-বের মুখটাও কাল হবে।

মিচেলের বিদ্রূপটা শুনতে পেয়েছিল উড। দুর্বল শরীরে একটা অন্ধ রাগ তাকে আক্রমণ করল। সব রাগ গিয়ে পড়ল বিমলার ওপর। কি দরকার ছিল বিমলার মিচেলের সামনে ছুটে যাবার। অসুস্থ শরীরে উঠে দাঁড়িয়ে হান্টার তুলে নিল উড। হান্টারের নির্দয় প্রহারে বিমলার সারা শরীরের হাড় যেন বিচূর্ণ হয়ে গেল। দুঃখে যন্ত্রণায় অসহায় কান্না কাঁদল বিমলা। মালীকে দিয়ে লুকিয়ে সে মা কালীর মন্দির থেকে প্রসাদ এনেছিল। ভেবেছিল না বলেই খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেবে সাহেবকে। মনে মনে রাত দিন ঠাকুর দেবতার কাছে সাহেবের আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেছে বিমলা। প্রচণ্ড নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর সবকিছু অর্থহীন মনে হল তার। হান্টারের আঘাতে ফুলে ওঠা কালো হাতের দিকে তাকিয়ে ভাবল অপরাধ কার? তার এই কালো চামড়ার? কিন্তু হাত কাটলে তার শরীর থেকে যে রক্ত ঝরবে সে রক্ত তো ওই সাহেবদের রক্তের মতই লাল। কোথায় যাবে বিমলা? কার কাছে? মা তাকে ঘরে নিতে পারবে না। তার ছোঁয়া কেউ খাবে না। পঞ্চায়েতের হুকুমে বাগানে পাতা তোলার কাজও সে পাবে না। অভুক্ত দুঃখী বিমলা অবসন্ন শরীরে কেঁদে কেঁদে মেঝের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল। এক সময় উষ্ণ স্পর্শে ঘুম ভাঙল। সাহেব কি তবে অনুতপ্ত হয়ে তাকে আদর করে বিছানায় তুলে নিতে এসেছে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল বিমলার মন। চোখ খুলে দেখল

সাহেব নয়। সাহেবের অ্যালশিয়ান কুকুরটা বিমলার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে। মেজাজী সাহেবের কাছে আজ কুকুরটাও কয়েকটা হাণ্টারের বাড়ি খেয়েছে। বোধহয় ওরও বিমলার মত মন খারাপ হয়ে আছে। উডকে তার কিছুদিন পরেই অসুস্থতার জন্য ইংল্যাণ্ডে চলে যেতে হল। যে অবচেতন আভিজাত্যবোধে বিমলাকে সে ওয়াইফ ডিক্লেয়ার করতে পারে নি, বোধহয় সেই সামাজিক বোধটাই তাকে দ্বিতীয় চিন্তায় দুর্বল করল। ইংল্যাণ্ডে তাদের সেই অভিজাত বাড়িতে কালো নেটিভ একটি মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত করবে সে কোন সাহসে! তবু বিবেককে কিছু জবাবদিহি করতে হয়। আর তার জন্যই বিমলাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল না উড। বাগানের সীমানায় যে অনাবাদী টিলাগুলো রয়েছে পাওয়েলকে ধরাধরি করে তারি একটা বন্দোবস্ত করে দিল বিমলাকে। চোখের পানি মুছে বিমলা মেম বাংলো ছেড়ে টিলার কুঁড়েতে উঠল। বনবাসী সীতার মত নির্জন জঙ্গলে বাস করতে লাগল। জমিতে বরগা দিয়ে খাওয়া পরা চলল। সেইখানেই বিমলার কোলে এল উডের সন্তান। বিমলার মেয়ে। ফুটফুটে ফরসা গায়ের রং আর নীল চোখ মেয়ের। জমি ভোগের সুখও বেশি দিন বিমলার কপালে টিকল না। পাওয়েল সাহেব পেনশন নিয়ে বিলেত চলে গেল। নতুন সাহেব এসে অনাবাদী টিলাগুলো প্লানটেশান বাড়াবার কাজে নিয়ে নিল। কাগজ-পত্রে বিমলার কোন অধিকার ছিল না। আবার নিরাশ্রয় হল সে। মেয়ে ঝুমকি তখন বড় হয়ে উঠেছে। চৌদ্দ বছর বয়সেই নীল চোখ সাদা চামড়ার ঝুমকি মায়ের শরীরের বাঁধুনী নিয়ে মাথা খারাপ করে দেবার মত সুন্দরী। জঙ্গলের কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করতে বসল দুজন। তখনি বাইরের মানুষের লোভী নজরে এল তারা। উঠতে হল গিয়ে নোয়াপাড়ার বাজারে খারাপ পল্লীতে। বাগানের সবাই জানে উডের মেয়ে ঝুমকি নোয়াপাড়ার বাজারে নামি বেশ্যা। তার মা সেই পাড়াতেই মরেছে।

এত আনন্দের দিনেও কালিন্দীর মেয়ে বিমলার ইতিহাস মনে পড়ে শরীরের ভেতরে কেমন একটা অজানা ভয়ের কাঁপুনী অনুভব করল বিনি আর লছমী। বাগানে বাগানে এমন কত দুঃখের কাহিনী তো ছড়িয়ে রয়েছে। ভাগ্যি সেসব দিনে জন্ম হয় নি বিনির লছমীর। এখন তাদের অভাব আছে। সারাটা বছর লেগে থাকে অভাব আর দুঃখের টানাপোড়েন। তবু সেই বিভীষিকা তো নেই। বিনি তাকিয়ে দেখল কালিন্দী বুড়ি খাওয়া শেষ করে পাতা চাটছে।

খাওয়া শেষ হতে হতে বিকেল পার হয়ে গেল। সবাই প্রায় ঘরে ফিরেছে। মণ্ডপঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে পোড়া কাঠ ছাই আর

কলাপাতা। উচ্ছিষ্ট নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে কুকুরের দল। বৈশাখের সোনালী বিকেল সবুজ সমুদ্র থেকে ডানা তুলে উড়ে যাচ্ছে।

বিকেল থেকে পাট্টায় ভিড়। তলবের টাকা হাতে নেই। তবু আনন্দের দিনটা তো আর শুকনো যেতে পারে না। দোকানের মালিক মানিকচন্দরের বাকিতে মদ বিক্রি করতে আপত্তি নেই। বাগানের ম্যানেজমেন্টকে রীতিমত সালামী দিয়ে দোকান ভাড়া নিয়েছে সে। তাছাড়া মদ বিক্রির ওপর ট্যাক্স আদায় করে মালিক। তাই বলে তার লোকসান নেই। বাকির মদের টাকা ফাঁকি দেবে কে? বড়বাবুর কাছে নালিশ ঠুকলেই তলবের টাকা কেটে তার হাতে এসে যাবে। খোরা খোরা বাকিতে বাংলা মদ বিক্রি হচ্ছে। মানিকচন্দর খুশি চোখে চারিদিকে তাকাল। তলবের দিন না হলেও লোক মন্দ হয় নি। বাঁধা খরিদ্দার ছাড়াও অনেক কুলি এসে বসেছে দোকানে। শালী কমলীই তার ব্যবসায় বাঁধ সেধে বসেছে। সারা সপ্তাহ পাতা তোলে। রবিবার নিজে গুড় কেনে মুলি জোগাড় করে। গুড় পচাই আর মুলি দিয়ে তৈরি কম্‌লীর চুয়ানী দরে সস্তা। স্বাদটাও না কি ভাল। পাট্টায় ঘরটায় হল্লা। রাজিন্দর এর মধ্যেই কয়েক পাঁইট শেষ করে উঠেছে। আর এক ভাড় নিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল -অ্যাই শালা মানিক! শালা তুমি হাঁড়িয়ার বদলে পানি দেওয়া শুরু করেছে। শালা তোর পাট্টায় আমি আগুন দেব।

মানিকচন্দর গোলগাল ছোটখাট মানুষ। কালো শরীরটা দিয়ে যেন তেল চুইয়ে পড়ছে। মানিক গম্ভীর মুখে বলল আরে হারামী! না খাবি তো না খাবি। গালি কেন দিবি রে শালা। আমরা কি তোর পা ধরে সেধে এনেছি?

টুলে বসে একজন টেনে টেনে বলল আরে যা-না তোর কম্‌লীর ঘরে। ভালো নেশা হবে।

রাজিন্দর তেড়ে উঠল- যাবই তো রে শালা। কম্‌লীর চুয়ানী একটু খেলেই তো নেশা ধরে যায়। মনে রং আসে। আর ই শালা মানিকচন্দর পয়সার বদলে পানি বেঁচে। চল সব। ওর হাঁড়িয়াগুলো নালায় ফেলে দেব।

রাজিন্দর উঠে দাঁড়াল। অনেকের ভাল নেশা হয়েছে। নেশার ঝোঁকে সবাই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল—হা হা চল। ওর সব আজ ফেলে দেব। দোকান ভেঙে দেব। শালা পানি দিয়ে আমাদের ঠকায়।

মানিকচন্দর এবার সচকিত হল। খোঁচা খোঁচা সজারুর কাঁটার মত ঝুলান গোঁফ মুচড়ে বলল—এইও। খবরদার। সোরগোল করবি না। এখুনি টিলাবাবুকে খবর দেব।

দলটি তখন বীরদর্পে সামনে দাঁড়িয়ে। রাজিন্দর বেপরোয়া কণ্ঠে বলল---আরে যা যা। টিলাবাবু কেন। তোদের ম্যানেজার এলেও ডরাই না। শালা তুমি পানি বেঁচে তলবের পয়সা নাও।

মানিকচন্দর বিচলিত হল না। বাংলা মদে পানি মিশিয়ে বেঁচে সে কথাটা মিথ্যে নয়। খরিদ্দার বেশি নেশায় এসে গেলে মানিকচন্দর পানি সাপ্লাই করতে থাকে। ওরাই তাই খেয়ে ধেই ধেই করে নাচে। চেঁচায়। হল্লা বাধায়। মাটিতে গড়াগড়ি যায়। মানিক জানে এই রুখে ওঠা দল-টির অনেকেই কিছুক্ষণের মধ্যে মাটিতে গড়াগড়ি যাবে। কেউ টেনে টেনে গান গাইবে। কেউ ভেউ ভেউ করে কাঁদবে। নিরুদ্বিগ্ন মনে খাতায় হিসেব লিখতে লাগল সে। রাজিন্দরের হঠাৎ কি খেয়াল হল। মানিক-চন্দরের পাট্টা থেকে বেরিয়ে কুলি লাইনের পথ ধরল। কম্‌লীর ঘরটা লাইন থেকে একটু দূরে। মেয়েদের মাতাল হাসির ঝাপটায় ওর ঘরের চারিধার কেঁপে কেঁপে উঠছে। কম্‌লীর ঘরে মেয়েদের ভিড়ই বেশি হয়। রাজিন্দর টলে টলে কম্‌লীর ঘরের পথটা পার হয়ে যাচ্ছিল। নেশার হাসি ছড়িয়ে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল-হেই কম্‌লী। দেখ তোর রাজিন্দর। হৈ রাজিন্দর! যাচ্ছিস কোথায় রে! কম্‌লীর চুয়ানী গলায় না ঢাললে রাইতে লাচ জমবেক লাই রে। আর কম্‌লী তো মাথা কুটবে।

অন্য মেয়েরা হাসিতে ঢলে পড়ল। লাল শাড়ি পরা কম্‌লী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাজিন্দরের হাত ধরে ডাকল-কেন যাচ্ছিস। আয় ঘরে আয়। তোর জন্য কখন থেকে বসে আছি।

রাজিন্দর ইতস্তত করল---আর খাবো না রে।

কম্‌লী অভিমানী কটাক্ষের তীর ছুঁড়ল চোখের কোণায় কেড়ে রে? কি হউচি? বিন্দিয়ার ডরে বুঝি খাটাশ হয়ে গেছিস?

রাজিন্দর উদ্দীপ্ত হল না। বলল-না রে। এখন ঘরে যাবো। ঝংকার তুলে হাসল কম্‌লী। রাজিন্দরের বুকের কাছে ঘন হয়ে এল---পরবের দিন সাঁঝের বেলা কোন্ মরদটা ঘরে যায় রে? দেখছিস না তোর জন্য সারা বেলা বসে আমি সাজ করেছি।

হাতের বেলোয়ারী চুড়ির রুমঝুম শব্দ তুলে রাজিন্দরের কণ্ঠ বেষ্টন করল কম্‌লী। এই মরদটা তাকে পাগল করে তোলে। কাছে এলে রক্তে নেশা ধরে যায়। রাজিন্দর তরল হয়ে গেল। রেন্ডীটা রং জানে। এ রংয়ে না মজে উপায় নেই। বলিষ্ঠ হাতে কম্‌লীর কোমর জড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল রাজিন্দর। চারিদিকে হাসি ঠাট্টার ফোয়ারা ছুটেছে। বাগানের পথে পথে নারী-পুরুষের জটলা। নেশার হাসিতে সবুজের ঢেউ কেঁপে কেঁপে উঠছে। নেশার ঘোরে ভাতের অভাব কাপড়ের দুঃখ অলীক স্বপ্নের

মত মিলিয়ে গেছে। যেন এমন হেসে হেসেই দিন কেটে যায় তাদের।

বিন্দিয়া সাজগোজ করে বেরিয়েছিল। ঝুমুর নাচে তাদের পাড়ার দলে আছে সে। ঝুমুর নাচের সুনাম আছে বিন্দিয়ার। মনটা ভাল লাগছিল না তার। সারাটা দিন রাজিন্দরের পাত্তা নেই। রাজিন্দরকে খুঁজবে বলে সন্ধ্যার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বিন্দিয়া। কিন্তু বিন্দিয়া কি ভেবেছিল এমন একটা দৃশ্য দেখতে হবে তাকে। কম্‌লীকে বুকে জড়ান রাজিন্দরকে দেখে বিন্দিয়ার মাথায় যেন ভাটিঘরের চুলোর মত দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল। বিন্দিয়া উন্মাদ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল কম্‌লীর ওপর। এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিল রাজিন্দকে। তারপর কম্‌লীকে আঁচড়ে কামড়ে চুল ছিঁড়ে বিপর্যস্ত করল। রাজিন্দর এক মুহূর্তে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপরই বিন্দিয়াকে আক্রমণ করল। কিন্তু বিন্দিয়া যেন ক্ষ্যাপা বাঘিনীর মত হিংস্র হয়ে গেছে। রাজিন্দরকে প্রচন্ড ধাক্কা মারল সে। নেশাল রাজিন্দর মাথা ঘুরে পড়ল পথের ওপর। কম্‌লীর খোপা খুলে চুলে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চীৎকার করে গালি দিতে লাগল বিন্দিয়া। চুয়ানী খেয়ে যারা এতক্ষণ রং তামাশা করছিল তাদের নেশা ছুটে গেল। হৈ চৈ শোরগোল পড়ে গেল। কম্‌লীকে ছেড়ে বিন্দিয়া ঘরের ভেতর ঢুকে আছড়ে ভাঙতে লাগল চুয়ানীর হাঁড়ি। চীৎকার তুলে লোক জমিয়ে ফেলল কম্‌লী। বিষ্ণু ছুটে এসে বিন্দিয়াকে ধরল। বিষ্ণুর বউ চন্দনী বলল হেই বিন্দিয়া। পাগল হয়ে গেছিস না কি রে তুই? বিন্দিয়ার খোঁপা খুলে সারা পিঠে মেঘের মত চুল ছড়িয়ে পড়েছে। মা কালীর মত বড় বড় লাল চোখ মেলে ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানতে লাগল বিন্দিয়া। বলল -হ্যা পাগল হয়েছি। পাগল করেছে ওই বেঈমান দুটো। ওদের আমি খুন করব।

বিষ্ণুর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য দাপাদাপি করতে লাগল বিন্দিয়া। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—ছেড়ে দাও বিষ্ণু দাদা। ছেড়ে দাও তুমি আমাকে। ওদের আমি শেষ করব।

এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে লাঠি হাতে ছুটে এল রাজিন্দর - সর বিষ্ণু দাদা। আমিও আজকে ওর হাড্‌ডি চুরা করব। বড় সাহস বেড়েছে রেন্ডীর।

বিন্দিয়া চুলে ঝাঁকি দিল—আয় না। কত তোর দাপট দেখি। আমার রুজী খেয়ে তো বেঁচে আছিস। তোর পয়সা তো ওই হারামী ঢেমনিটার চুয়ানীর হাঁড়িতে যায়।

বিন্দিয়াকে এলোপাথাড়ি কয়েকটা লাঠির ঘা মারল রাজিন্দর। বিন্দিয়া কমলীর আর রাজিন্দরকে গালি দিয়ে পাড়া মাথায় তুলল। কম্‌লীর ঘরের সামনে ভিড় জমে গেল। কমলী মুখ কালো করে ভেঙে পড়া হাঁড়ির অবশিষ্ট

চুয়ানী ছেঁকে তুলছিল। মুখ তুলে দু'চোখে আগুন ছিটাল সে—মরদকে বশে রাখতে পারিস না? আবার মার পিট করতে আসিস। তোর মত বউর জ্বালায় তো রাজিন্দর ঘরে যেতে চায় না।

গোলমালটা বিষ্ণুর বউ আর বিষ্ণু মিটিয়ে দিল। এমন একটা পবিত্র পরবের দিনে ঝগড়া ফ্যাসাদ করা তো ভাল নয়। ওদের ঘরে পেঁছে দিয়ে কম্‌লীকেও মৃদু শাসন করল বিষ্ণু। পরের পুরুষ নিয়ে এত ঢলাঢলি কেন রে। তোর স্বামী মরেছে বলেই কি এমন বেয়ড়া চালচলনে চলতে হবে না কি? পঞ্চায়েতের ভয়ও দেখাল কম্‌লীকে বিষ্ণু। বিষ্ণু চলে যাবার পর কিছুক্ষণ ফুসল কম্‌লী। রাজিন্দর কেমন ভাল ছেলের মত বিন্দিয়ার সঙ্গে চলে গেল। বেঈমান পুরুষ। কিছুক্ষণ পরেই সব ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল কম্‌লী। চুপচাপ বসে থাকলে আজ লোকসান। খরিদ্দার চলে যাবে সব পাট্টায়। মানিকটা মজায় পয়সা লুটবে।

অন্ধকার বাগানটা দ্রিম দ্রিম করে মাদলের ঝংকার উঠল। রাজিন্দরের নেশা ছুটে গেছে সন্ধ্যা বেলাই। তাকিয়ে দেখল বিন্দিয়া মাটিতে মুখ গুজে ছড়িয়ে পড়ে শুয়ে আছে। মনটা অনুশোচনায় পুড়ছে রাজিন্দরের। বিন্দিয়াটা মুখরা। কিন্তু রাজিন্দরকে ও ভীষণ ভালবাসে। এত টানাটানি অভাবের সংসারেও ও পয়সা জমিয়ে রাজিন্দরকে এটা সেটা শৌখীন দামি রান্না করে খাওয়ায়। ওর মা বাবা এখন কাজ করে ফুলছড়ির বাগানে। রাজিন্দরকে ফেলে একদিনের জন্যও সেখানে যায় না বিন্দিয়া। বিন্দিয়ার এলোমেলো চুলে হাত রাখল রাজিন্দর। কোমল কণ্ঠে ডাকল—হে বিন্দিয়া। বিন্দিয়া রে!

বিন্দিয়া নিশ্চল। মণ্ডপঘর থেকে ভেসে আসা মাদলের শব্দ অভিমানী মেয়ের মত অন্ধকার ঘরে গুমরে উঠছে,।

রাজিন্দর বিন্দিয়ার চুলে পিঠে হাত বুলোতে লাগল -আমাকে মাফ করে দে রে বিন্দিয়া! আর আমি কম্‌লীর ঘরে যাবো না। এই দেওতার নামে...

বিন্দিয়ার নিশ্চল শরীরটা কেঁপে উঠল। হঠাৎ ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে। রাজিন্দর দুহাতে বিন্দিয়ার শরীরটা তুলে ধরল—আমার বুলবুলি। আমার মুনিয়া। আর রাগ করে থাকিস না। চল নাচে যাই।

রাজিন্দরের সোহাগে বিন্দিয়ার স্তব্ধতা ভাঙল। অন্ধকারে উঠে বসল বিন্দিয়া। বলল—তুই আমাকে এত কেন কষ্ট দিস?

রাজিন্দর আবেগে বিগলিত হল—আর দেব না রে। আর দেব না।

নেশা করলে নজরটা ঠিক থাকে না রে।

বিন্দিয়া রাজিন্দরের বুকে মাথা রেখে উদাস চোখে তাকিয়ে রইল বাইরে। লুবেক গাছের ছড়ান ডালের ভেতর দিয়ে ঝিক মিক করে জ্বলছে অনেক তারা। ওই তারার মত কত স্মৃতি ঝিক মিক করছে বিন্দিয়ার বুকের ভেতরে। পছন্দ করে বিয়ে করেছে তারা। সেই যে একবার বিন্দিয়ার পায় একটা বড় জোঁক ধরেছিল। রাজিন্দর এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তালাওর জলে। ছিনিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল জোঁকটাকে। বিন্দিয়ার সুঠাম কাল পায়ে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়েছিল। সেই স্পর্শে বিন্দিয়ার সারা শরীর কি আশ্চর্যভাবে শিহরিত হয়েছিল। তখনও ওদের বিয়ে হয় নি। একবার পুজোর সময় সেই কোথায় শ্রীমংগলের বাজার থেকে একটা রুপোর হাঁসুলী কিনে এনেছিল। বিন্দিয়ার সংগে নিভৃতে একটু কথা বলবার জন্য সারাদিনের কাজের পর বাগানের ধারে পথে দাঁড়িয়ে থাকত। পরবের সময় বিন্দিয়ার নাচ দেখে পাগল হত রাজিন্দর। বিয়ের পর তো এমন ছিল না রাজিন্দর। রাজিন্দরের বাড়ি এসে কত যত্নে ঘর সংসার সাজিয়েছে বিন্দিয়া। টিলা থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি কেটে দেওয়াল পিড়া উঠান লেপেছে। রাজিন্দর মহা উৎসাহে জংগল থেকে বাঁশ কেটে চালের বাতা বুনেছে। শণ ঘাস কেটে চালের ছাউনী দিয়েছে। বিন্দিয়া রঙিন মাটি কুড়িয়ে রং তৈরি করে ঘরের দেওয়ালে ফুল লতা পাতায় নক্সা এঁকেছে! কোথায় গেল সেই দিন? সেই যে পাঞ্জাবী বাঙালীর লড়াই হল, তারপরই সব কেমন পালটে গেল। রাজিন্দরের দুই ভাই ভাগ্না বোনের স্বামীকে পাঞ্জাবী সৈন্যরা গুলি করে মারল। রাজিন্দর চলে গিয়েছিল বিন্দিয়াকে নিয়ে তেলিয়াপাড়ার বর্ডার ছাড়িয়ে সীমান্তের ওপারে। ফিরে এসে আত্মীয় পরিজনের সমূল উচ্ছেদের খবর পেল। বিন্দিয়া বলল-- আমরা কুলি! আমাদের অংরেজ রাজাই কি, পাঞ্জাবীই কি আর বাংলা-দেশ হলেই বা কি! আমাদের এমন বিনা দোষে শিয়াল কুকুরের মত মারল কেন রে? বাগানে বাগানে ভয়াবহ আতংক ছড়িয়ে আছে তখনও। কোন বাগানের ম্যানেজার মরল। কোথায় কুলি-পাড়া আগুনে পুড়িয়ে সাফ করা হয়েছে, কোন লাইনে কুলিদের দাঁড় করিয়ে গুলী করে মারা হয়েছে। কত কারখানা গুদাম জ্বলেছে-সভয়ে আলোচনা করছে সবাই ঘরে ঘরে! শত্রু চলে গেলেও বাগানে বাগানে শোক আর হাহাকার তখনও। কুলিরা শুনল বাজার মন্দা। বাগানের মালিকেরা লোকসান দিতে দিতে পেরেশান। ঘোর দুর্দিন যাচ্ছে চায়ের। বুড়ো মাতবর কুলিরা বলল-- হামরা কুথাকে যাবো। হামরার দেশ নাই। ক্ষেতি নাই। কি খেয়ে বাঁচব। বাল-বাচ্চাকে বাঁচাব!

কথাটা প্রায় সবারই মনের কথা। কবে কোন জমানায় উড়িষ্যা, সাঁওতাল পরগনা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছিল তাদের দাদা পরদাদারা। সে দেশ তারা এখন চেনে না। জানে না। শুধু ভাষা আচার আর পুজো পার্বণের মধ্যে রয়ে গেছে সেই অতীত ঠিকানার চিহ্ন। এই চায়ের বাগানের বাইরে তারা পরবাসী। সত্যিই তো কোথায় যাবে তারা? কি খাবে?

স্পেনসারের বাগানে কাজ পেল রাজিন্দর আর বিন্দিয়া। চায়ের দুর্দিন তখনও চলছে। দেশোওয়ালী পাড়ার কুঁজো হরদেও বুড়ো কপাল থাপড়াত -- কি হইল রে ভগওয়ান।

এ পাড়ায় সবচেয়ে বয়সী অথর্ব মানুষ সে। চা বাগানগুলোর পুরোন খবর তার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। হা হুতাশ করত হরদেও অংরেজ সাহাবরা বাগান বসাইল। হামরাকে বানধিয়া আনল চালানে। সাহেবরাও কুলিদের গালি দিছে, মাইর দিছে। এমুন করিয়া মারে নাই রে। দু'পয়সা পাঁচ পয়সা হফতার তলব পাইছি। তারপরে হইল স্বরাজের লড়াই। চা বাগানে কত গুলি চলল। স্বরাজ হইল। হামরার কি হইল তাতে? জিনিসের দাম বাড়ল। হামরার কষ্ট বাড়ল।

হরদেওর নাতনী কুন্তি বলে হফতার তলবও তো বেশি হল।

হরদেও খেকিয়ে ওঠে তাতে কি। অংরেজের লড়াই তাতেও আমরা মাইর খাইলাম। বাংলাদেশের লড়াইতেও মাইর খাইলাম। বাংলাদেশ হইল তো হামরার কি হইল রে?

অর্জুন বলে ওঠে হামরার আবার কি হবে? পাত্তি উঠাব জনম ভর। পেটের ভুখে মরব। কাপড়ের অভাবে হামরার রেন্ডীগুলো গতর উদাম কইরে ঘুরবে। আগে পয়সা বানাইছে অংরেজ। পরে পাকিস্তানী রাজা। এখন বাংলাদেশের রাজা পয়সা করবে। আমরা শুধু জনম ভর দুঃখু করব। রাজিন্দর এসব আলোচনায় কেমন গুম হয়ে যেত। তার পরই ক্ষেপে উঠত আরে চুপ। চুপ। এবে সব হইবে।

তারপরই কেমন জ্বালা ধরান হাসি জ্বলত রাজিন্দরের ঠোঁটে যা ভাগ কুলি জাত। গোলামের জাত। গোলামের আবার দুঃখ কি রে? আমরা শালা মানুষ না কি!

তারপর থেকে কেমন অস্বাভাবিক রকম মদের নেশায় ডুবে গেল রাজিন্দর। আগে বাগানের অন্য মানুষের মতই মদ খেয়েছে রাজিন্দর। এখন যেন মদই ওকে খাচ্ছে। আর ওই নেশায় দুর্বলার সুযোগে কমলীটা এসে ভর ঝরেছে ওর ওপরে।

রাজিন্দর বিন্দিয়ার কপালে গাল ছোঁয়াল—আমার বুকে বড় জ্বালা রে। বড় জ্বালা। তুই তো জানিস বিন্দিয়া।

বিন্দিয়া হাত রাখল রাজিন্দরের বুকে। সারাটা কুলি তল্লাটে কার বুকে জ্বালা নেই। সে জ্বালা নিয়েই তো ওরা পুড়ে পুড়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরে। বিন্দিয়ার দু'চোখের পানিতে রাজিন্দরের বুক ভিজতে লাগল।

মৃদু গম্ভীর মাদলের ধ্বনি ভাসছে বাতাসে। রাজিন্দর বলল—ওঠ বিন্দিয়া। খোঁপা বেঁধে নে। নাচে চল।

হিন্দিগুফেরা গাছের ওপরে উঠে এসেছে চাঁদটা। আজ চাঁদ উঠেছে দেরি করে। গাছপালার ডালে শংখচূড় সাপের খোলসের মত ঝুলে আছে মরা জ্যোৎস্না। পথে টুকরো টুকরো আলোর জাফরী। তার চেয়ে উজ্জ্বল আলো মণ্ডপ ঘরে। উত্তপ্ত আলো ছড়িয়ে সাঁ সাঁ করে জ্বলছে হ্যাজাক বাতি। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। মাদ্রাজী পাড়ার নাচিয়ের দল কাঠি নাচ শেষ করে হাঁড়িয়া নিয়ে বসেছে মাঠের মধ্যে। বাদলা নেশাড়ে তাঁরাই কেবল অনুপস্থিত। পড়ে অছে পাট্টায় নয় তো লাইনের খালি ঘরে। মাঠের মধ্যে হাঁড়িয়া আর চুয়ানীর দোকান বসেছে। বিক্রি হচ্ছে দেদার। হৈ চৈ হর্ষধ্বনির মধ্যে ঝুমুর নাচের মেয়ে-পুরুষেরা দল বেঁধে উঠে এসে দাঁড়াল আলোর নীচে। কে একটা মেয়ে মাঠের মধ্যে নেশায় মাতাল হয়ে হাসছে। খোঁপায় লাল ফুল পরা আঁটসাঁট শাড়ি জড়ান নাচিয়ে মেয়েরা কোমর ধরাধরি করে সারি বেঁধে দাঁড়াল। সামনে এক দল ছেলে। মাদল আর বাঁশী খুশির ঢেউর মত আনন্দের হিল্লোল তুলল। তালে তালে ঝুমুর পরা পা ফেলে মেয়েরা গাইতে লাগল—

মর সুখ নিশি গলা পারি
বন্ধু অসিলা নাই

ঝুমুর পরা সুঠাম পায়ের ঝুমুর ঝুমুর শব্দ ছন্দে দেহে ঢেউ তুলে মেয়েরা নাচতে লাগল। কে যেন দর্শকদের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে বলল আরে রেন্ডীরা লেশা করে লে। নাইলে মনে রং ধরবেক লাই। রং না হইলে ঢং দেখবিক কেমনে? মরদগুলাকে চাঙ্গা করবি কি কইরে?

মেয়ে দর্শক মহলে হাসির ঝড় উঠল। মাদল বাজাতে বাজাতে নাচিয়ে পুরুষেরা মেয়েদের সামনে এল। গান ধরল—

আশা করি ফুল চুড়ি
গথিলি হার।
যতনা শুকিলা হার
নাই আসিল চুর॥

নাচ জমে উঠল। কালো মেয়েদের পায়ে ছন্দ, কণ্ঠে সুর। কালো গালে লাল ফুলের আলো। ঝুমুর শেষ হল প্রথম দফার। এবার আরেক দল উঠল। ছেলেমেয়ের হাত ধরাধরি করে নাচ। বাঁশি কেঁপে কেঁপে সুর তুলল। কন্ঠ মিলাল নাচিয়ে পুরুষেরা—

ও আমার যৈবনটা

বিফলে গেল

নাই আসিল পরাণের বন্ধুয়া গো।

মেয়েরা ধুয়া ধরল -ও নাই আসিল পরাণের বন্ধুয়া গো।

হিন্দি গুফেরা, লুবেক আর ডারিশ গাছের ওপর আনন্দ উজ্জ্বল রাত মদির চোখে তাকিয়ে রইল। সব শেষে গাইতে উঠল হরিয়া। অনেক ধরাধরি করে আজকের গানের দলে নাম দিয়েছে সে। ছেঁড়া লাল জামাটা সাদা কাপড়ে তালি মারা। জামাটা দু'দিন আগে কেঁচে শুকিয়ে রেখেছিল হরিয়া। চণ্ডলার কাছ থেকে অর্জুনের একটা পুরোন ধুতি চেয়ে পরেছে। গুঁই সাপের চামড়ার খঞ্জনী হাতে হরিয়া আসরের মাঝখানে বসল। চারিদিকে হাসি ঠাট্টার ধুম। কুন্তি বলল—ও হরিয়া তুই কি গরুর ডাক শোনাবি না কি ?

হরিয়া কান পাতল না। দেখল চামেলী উৎসুক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। খঞ্জনীতে আঙুল ঠুকল হরিয়া। গান ধরল—

শুন সাধুজন মন দেই।

শশী দেয়ী কান্দে

অতি বিকড়ে।

সাধু জনে॥

হরিয়ার গানের করুণ সুর এক দল উজ্জ্বল নারী-পুরুষের আসরের সুখী বাতাসকে অন্য খাতে প্রবাহিত করল। হরিয়া গাইছে—

মা কাছে যাই কিড়ি

কান্দি কহিলা

'মা মর' এবে মোর ছিলু

কেমন তয়।

গো মা ময়॥

স্তব্ধ রাত। নিস্তব্ধ সভা। একটু আগের আনন্দের ঢেউ ফাগুয়ার প্রতারক রঙের মত উড়ে গেল কোথায়। ভীষণ গভীর অজানা এক দুঃখ আকুলি বিকুলি করে মাথা কুটল সবার বুকে। মেয়েদের চোখ সজল হয়ে উঠল। শশী দেবীর দুঃখের কাহিনী করুণ সুরে গাইছে হরিয়া।

শশী দেয়ী কান্দে॥

বাগানে বাগানে যেসব দুঃখিনীর অনেক দুঃখের কান্না নীরবে কাঁদে, তারই রোদন ধ্বনি বুঝি সবাইকে উতলা করল। মনে পড়ল সেই সব হতভাগিনী-দের কথা যাদের ইংরেজ সাহেবরা নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে যন্ত্রণার দুঃখের ভূমিতে। মনে পড়ল তাদের কথা একাত্তরের যুদ্ধে খাকী পরা পাঞ্জাবী সৈন্যরা যাদের বলির পশুর মত ট্রাকে তুলে নিয়ে চলে গেছে অজানা অন্ধকারে। জাতিচ্যুত স্বজনহারা সেই সব দুঃখী মেয়েরা যেন সারা আকাশ বাতাস জুড়ে বুক ভাঙা কান্নায় কেঁদে সারা হচ্ছে। চোখ মুছল লছমী চঞ্চলা বিনি সবাই। হরিয়া এবার গাইতে লাগল মেয়ের দুঃখে দুঃখী অসহায় মায়ের বিলাপধ্বনি।

ঝিওররোদন শুনি
ভূমিও পড়ি কান্দে জননী।
'মা মর' কি কলা দইব আনি...।

আসরটাকে থমকে দিয়ে এক কোণ থেকে হু হু করে কেঁদে উঠল কালিন্দী বুড়ি। মাটিতে মাথা ঠুকে বিলাপ করতে লাগল- হারাম বিম্‌লো... বিম্‌লা রে...। দুপুরে লোভীর মত ভাত খেতে থাকা কালিন্দী বুড়ি যেন নয়। পাড়ার একধারে ভাঙা চালায় থাকে যে। চেয়েচিন্তে খায়। কামিনদের ছোট বাচচার পাহারাদারী করে. ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া শণের মত পাকা চুলে উকুন খুঁজতে খুঁজতে ছোট ছেলেমেয়েদের ছড়া শোনায় সে কালিন্দী বুড়ি যেন এখন অন্য কেউ। বাগানের সন্তানহারা দুঃখিনী মায়ের সত্তা। সবাই বিষণ্ণ আর উদাস হয়ে গেল। হ্যাজাক আলোকে তুচ্ছ করে হিন্দি গুফেরা গাছের মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে বিষণ্ণ চাঁদ ম্লান আলো ছড়াতে লাগল সবুজ অন্ধকারের জগতে।

ছয়

ঝির ঝির একটানা বৃষ্টি ঝরছে। তরুণী দেহের মত টিলার ঢেউ বুকে নিয়ে সবুজ পৃথিবী তাকিয়ে আছে নীলচে মেঘের চাদর ঢাকা আকাশে। টয়োটা জীপ আর ম্যানেজারের গাড়ি এসে থামল গেষ্ট হাউ-সের সামনে। বারান্দায় অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার ও অন্যান্য বাগানের জুনিয়র ম্যানেজাররা অপেক্ষায় ছিল। ছাতা নিয়ে এগিয়ে এল সবাই গাড়ির কাছে। গাড়ি থেকে নামলেন ডিরেক্টর মিঃ ডেভিড। আর তার সংগেই সোনালী চুল নীল চোখের সুন্দরী ব্রিটিশ তরুণী। প্লেন কিছুটা ডিলেড ছিল। ফার্স্ট ফ্লাইট এসে পেঁৗছেছে দেরিতে। অতিথিদের রিসিভ

করবার জন্য আশরাফ রিণা গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। ছাতা মাথায় দিয়ে অতিথিরা গেষ্ট হাউসের বারান্দায় উঠে এলেন। গোল পাউরুটির মত লাল মুখে বৃষ্টির ছাট মিঃ ডেভিডের। রুমালে মুছতে মুছতে অপেক্ষমাণ ম্যানেজারদের দিকে তাকালেন তিনি—হ্যালো। সবাই এসে একে একে করমর্দন করল।

মিঃ ডেভিড গোল মুখে পরিমিত হাসি নিয়ে সবাইকে বলে গেলেন হাউ ডু ইউ ডু...।

সুন্দরী ছিমছাম তরুণীটির সংগে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার মেয়ে এলিস বার্গম্যান।

আশরাফ এতক্ষণে বলল ক'দিন থেকে যা বৃষ্টি। সেরপুর ফেরীঘাটের তো ভয়াবহ অবস্থা।

ইফতেখার চটপটে সপ্রতিভতায় হাসল সত্যি শমসেরনগর ফ্লাইটটা বন্ধ থাকায় আমাদের জন্য খুব অসুবিধা হয়েছে। মিস্ বার্গম্যান আপনি নিশ্চয়ই খুব বোর ফিল করেছেন।

এলিস মিষ্টি করে মৃদু হাসল—না না। চমৎকার জার্নি ছিল। আমার ভাল লেগেছে।

আশরাফ ডাকল সবাইকে আসুন চা খেয়ে নেওয়া যাক।

সবাই ড্রইংরুমে এল। বেয়ারা দামী সুদৃশ্য পটে চা নিয়ে এল। গরম সুগন্ধি চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে আয়েসী ঘরে ডিরেক্টরকে ঘিরে আলাপ জমে উঠল। এলিসের খুব ভাল লাগছে। রীতিমত মুগ্ধ সে। কি চমৎকার সবুজ চারিদিকে। আকাশে এমন সুন্দর নীল মেঘ সে জীবনে দেখে নি। ইংল্যান্ডের আকাশের মেঘ কি ভীষণ মন খারাপ করে দেওয়া বিশ্রী ধোঁয়াটে সাদা। এলিস এই প্রথম এল বাংলাদেশে। রিণাকে বলল নদীর ঘাটে ফেরী পার হবার সময় আমার খুব ভাল লাগছিল। অবশ্য উঠবার সময় গাড়ির চাকা স্লীপ করেছিল বলে বাবা বেশ ভয় পেয়েছিল। বাট ইট ওয়াজ রিয়েলী এ স্পোর্ট।

রিণা হাসল। সারাটা রাস্তার প্রতিটি বস্তুতে অবাক আর খুশি হচ্ছিল এলিস। বার বার বলছিল 'সো নাইস', 'হাউ ওয়ান্ডারফুল।'

এলিস বলল অথচ দেখো চা বাগান বলতে আমার ধারণা ছিল অন্য রকম। অবশ্য প্রজেক্টরে এর কালারফুল ছবি দেখেছি। তবে ভাবতাম এটা বোধহয় সাপ বাঘ ওয়াইল্ড হাতীর আড্ডা। কিন্তু এখন তো দেখছি চমৎকার। হিলটপে কান্ট্রিসাইট টাইপের সুন্দর বাংলো। চমৎকার রাস্তা।

রিণা এলিসের নীল কৌতূহলী চোখে তাকাল—বাঘ সাপ যে নেই

একেবারে তা নয়। হাতীও নামে মাঝে মাঝে। তবে সেগুলো ইন্টিরিয়রের বাগানের দিকে। এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে একটা বাগান আছে এই কোম্পানীর। ওখানে বার্কিং ডিয়ারের ডাক শোনা যায়।

এলিস চমৎকার খুশির হাসি হাসল ওঃ হাউ এ্যামিউজিং, আমি নিশ্চয়ই যাবো সেখানে।

ওদিকে তখন আন্তর্জাতিক চা বাজারের উত্তপ্ত আলোচনা। ইংল্যান্ডের বাজারে অকশনে বাংলাদেশের চা গতবার ভালো দাম পেয়েছে। তবে দক্ষিণ আমেরিকায় কফির ফলন নষ্ট হয়ে যাওয়াতে কফির মন্দা বাজারের সুযোগটা চা দখল করে নিয়েছে। চা বাজারের প্রতিযোগিতার অগ্রভাগে রয়েছে ইন্ডিয়া আর সীলোন টি। বাংলাদেশও খাতায় লাভের অঙ্ক লিখেছে।

মিঃ ডেভিড বললেন চায়ের যে বাজার আমরা পেয়েছি গতবার এবার তার চাহিদা পূরণ করতে হলে প্রডাকসন আরো বাড়াতে হবে।

আশরাফ বলল সেটা একদিকে যেমন নির্ভর করে দেশের পলিটিক্যাল আর ইকনমিক স্ট্যাবিলিটির ওপর তেমনি...।

আশরাফ থেমে গেল। মিঃ ডেভিড নিশ্চয়ই জানেন যে বাগানের ইনভেস্টমেণ্ট না বাড়ালে প্রডাকশন বাড়বে না।

ইরশাদ আশরাফের নীরবতাকে ভরাট করে তুলল- ওগুলো একটা কনডিশন বটে। তবে অঙ্কের থিওরীর মত। আদার থিংকস রিমেইন কনস্ট্যান্ট ধরে কি কখনও প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করা যায়। আমাদের লো কস্ট হচ্ছে মার্কেট পাবার আসল উপায়। কম খরচে বেশি চা উৎপাদন করতে পারি আমরা ইচ্ছে করলে।

মিঃ ডেভিড মনোযোগ দিয়ে ইরশাদের কথা শুনলেন। মৃদু হাসি নিয়ে বললেন--তাই যদি হয় তবে ইন্ডিয়াতে তো আমাদের বাগান রয়েছে। সেই দিন না হয় সিলোন সরকার চা-ইনডাষ্ট্রি ন্যাশনালাইজ করল তার আগে তো আমাদের হাতেই ছিল। সেখানে তো একই খরচে বেশি চা উৎপাদন করা হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের বাগান নিয়ে আমাদের প্রবলেমের অন্ত নেই। রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার এ নিয়ে আলাপ হয়েছে।

আশরাফ তিক্ত হল। ডিরেক্টর ইংল্যান্ডে থাকলেও বাংলাদেশের চা বাগানের খুঁটিনাটি প্রায় সবই তাঁর জানা। অথচ ভাবখানা এই যেন সুপের চামচ মুখে তুলে জানতে চাচ্ছেন তিনি সুপ খাচ্ছেন কি না।

তবু ইংরেজী বিনয়ে তিক্ততা চাপা দিয়ে ডেভিডের জানা তথ্যটাই আবার ডেভিডের সামনে তুলে ধরল আশরাফ- ইন্ডিয়াতে তো ইনভেস্টমেণ্ট বেশি। আর সীলোনে কুয়াশায় বর্ষায় পাতা ওঠে। বলতে গেলে

অ্যারাউন্ড দা ইয়ারই প্লাকিং চলে। তাছাড়া ওয়েজ সিস্টেম...

আশরাফ আবার চুপ করল। ব্রিটিশ আমলের ওয়েজ সিস্টেম এখনও চালু রয়েছে চা বাগানগুলোতে। ইণ্ডিয়া সিলোন বাংলাদেশে মজুরীর হার প্রায় কাছাকাছি। তবে মানিভ্যালু ধরলে এখানকার চা শ্রমিকের পার ক্যাপিটা ইনকাম কম। এ নিয়ে ঝামেলাও তো কম নয়। বছর দুয়েক আগে লেবার আনরেষ্টের বিশ্রী ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। বাগানগুলো বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে ডিরেক্টরদের ঘন ঘন বোর্ড মিটিং ডাকতে হয়েছে। ইরশাদ বলল আফটার লিবারেশান তো হরিবল অবস্থা গেছে চায়ের। চায়ের কস্ট যা ছিল চা বিক্রি করতে হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম দামে। লোকাল ওনারশীপের বাগানগুলো তো তো প্রচণ্ড লস খেয়েছে।

ইফতেখার তাকাল ইরশাদের দিকে। অল্প হাসল--লস অবশ্য গেছে। তবে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য ব্যাংকে ও. ডির হিসেব দেখায় অনেক বাগান।

কথাটা শুনে ডিরেক্টর হাসলেন। আশরাফকেও হাসতে হল মনে মনে। এ ব্যাপারে দেশী বিদেশী কোন চা বাগানের মালিকই বোধহয় খুব নিস্পৃহ নয়। আর এক পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের হিসেব এখানে সরকারকে দেখিয়ে লণ্ডনের মার্কেটে সেটা যাদুমন্ত্রবলে বেড়ে যায়। ওসব কথা বলা দূরে থাক ভাবলেও বোধহয় স্পেনসার কোম্পানীর পার্মানেন্ট ম্যানেজারশীপটা আশরাফের বাতিল হয়ে যাবে। বৃষ্টি ধরে গেছে। সবাই উঠল। ডিরেক্টর ফ্যাক্টরীতে যাবেন।

ফ্যাক্টরীর সামনে গাড়ি এসে থামতেই তটস্থ সচকিত কুলিরা সালাম দিতে লাগল। সাহেব সম্পর্কে এখনও ভয় মিশ্রিত মোহ তারা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তার ওপর এই বড় সাহেব আর তার মেমসাহেব মেয়ে এসেছে বিলেত থেকে। সাহেব মানে তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারা তাদের বাপ দাদার কাছে জেনেছে ভগওয়ানের পরেই সাহেব। লীফ হাউসে টু শব্দটি নেই। কেবল সিমেণ্টের ওপর জোড়া জোড়া জুতোর শব্দ। দলের আগে চলেছেন মিঃ ডেভিড। সঙ্গে আশরাফ। পেছনে অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার ও অন্যান্য ম্যানেজাররা। নতুন বসান উইণ্ড রোয়ারের বাতাসে লম্বা নেটের ওপর পুরু করে বিছিয়ে দেওয়া পাতা শুকোচ্ছে। পাতাগুলো মাঝে মাঝে হাতে ছুঁয়ে দেখছে এলিস। এটা ওটা প্রশ্ন করছে। উইণ্ড রোয়ারের শব্দে উড়ে যাচ্ছে কথার শব্দ। লীফ হাউস থেকে কারখানায় এল সবাই। রিণার খুব বিশ্রী লাগছে। ডিরেক্টরের মেয়েকে কম্পেনী দেবার জন্য আসতে হয়েছে তাকেও। উঁচু হিল যাতে স্লীপ না করে সেদিকে মনোযোগ রেখে হাঁটছে রিণা। এলিস তো জীনস

পরে এসেছে। স্ট্রাইপ দেওয়া লাল জার্সিতে তার উদ্ধত শরীরের রেখা অতিমাত্রায় প্রকট। কুলি মেয়েরা আড়চোখে অবাক বিস্ময়ে দেখছে নতুন বিলাতী মেমসাহেবকে। চায়ের প্রসেসিংয়ে খুব উৎসাহী হল এলিস। রোলার মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে কৌতুহলী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। সাদা কলারওয়ালা গেঞ্জী সর্টস আর পাতার টুপি পরা অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার একটু নার্ভাস বোধ করছিল বসের মেয়ের সামনে। তবু খুব উৎসাহে বোঝাতে শুরু করল ইয়েস ম্যা'ম। আমাদের উইদারিং হাউসে যে পাতাগুলো দেখলেন সেগুলো কিছুটা শুকোবার পরে এখানে রোলিং মেশিনে আসে। এখানে রোল করে তারপর সর্টিং হয় গ্রীণ লীফ সিফ্টারে। রোলিং মেশিনে রোল করবার টাইম হচ্ছে ষাট মিনিট। গোল ছোটখাট সাইলো আকৃতির রোলিং মেশিনগুলো প্রচণ্ড শব্দে ঘুরছে। নীচে মোচড়ান পাতাগুলো পড়ছে। অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার বলল- দেখুন এবার কেমন ভাবে গ্রীণ লীফ সিফ্টারে পাতাগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

রোলিং মেশিন ছাড়িয়ে সবাই এল ফারমেনটিং রুমে। এখানে পাতা রং বদলাবে। নীচে বিছিয়ে রাখা হয়েছে পাতা। এক মুঠো হাতে তুলে নিল এলিস। পাতাগুলো কেমন খয়েরী রং ধরেছে। রিণাকে একটু হাত ছোঁয়াতে হল। ড্রায়ার থেকে প্রচণ্ড শব্দ আসছে। সবাই ড্রায়ারে চলে গেছে। রিণা ডাকল এস এলিস. এরপর ড্রায়ারে যেতে হবে।

এলিসকে নিয়ে ড্রায়ারে এল রিণা। অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার পেছনে এল। ঘরটায় যেমন গরম তেমনি শব্দ। সবাই এই বৃষ্টি বাদলার ভেজা দুপুরেও ঘেমে উঠল। বিরাট আকৃতির স্টীলের দরজা লাগান ফারনেসে আগুন জ্বলছে। ঘড় ঘড় করে কনভেয়র ট্রে উঠছে নামছে। শুকনো পাতা ওপরে উঠে যাচ্ছে। বেক করা পাতা নেমে আসছে। পাশাপাশি তিনটে ড্রায়ারে পাতা বেক করা হচ্ছে। অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার এলিসকে বোঝাতে লাগল। প্রচণ্ড শব্দে ডুবে যাওয়া কণ্ঠ উঁচু করে বলে চলল এই যে বিরাট চুলোগুলো দেখছেন এগুলো সাধারণত ফায়ার উড বা ফারনেস অয়েলে জ্বলে। সুইচবোর্ডটা দেখিয়ে বলল -এখান থেকে টেম্পারেচার কনট্রোল করা হয়। টেম্পারেচার কনট্রোল খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বেশি হিট হলে পাতা জ্বলে যায়। আবার কম হলে পাতা ভাল করে সিজনড্ হয় না। তাতে চায়ের স্বাদ বদলায়। আসলে বাগানে পাতা তোলা থেকে ড্রয়ার পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রসেস পারফেক্ট না হলে চা পাতার কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায়।

এলিস হঠাৎ বলল এসব মেশিন চালাবার জন্য নিশ্চয়ই আপনাদের ওয়েল ট্রেইনড্ টেকনিশিয়ান আছে।

কথাটা শুনতে পেল আশরাফ। হাসল নো ম্যা'ম। এখানকার কুলিরাই এসব কাজ করে। জেনারেশানের পর জেনারেশান এসব দেখতে দেখতে এরা হাতেকলমে কাজ শিখে ফেলেছে। এই ফ্যাক্টরীতেই এদের ট্রেনিং।

এলিস তার সেই ইনোসেন্ট ইগনোরেন্সের বিস্ময় প্রকাশ করল- কি চমৎকার।

ড্রায়ারের গরমে অসহ্য লাগছে রিণার। কি উদ্ভট মেয়েটা। ড্রায়ারের ফারনেসটা পর্যন্ত যেন ওর খুলে দেখা চাই। গরমে ঘামে নিশ্চয়ই এতক্ষণ রিণার সকালের মেকআপ নষ্ট হয়ে গেছে। স্বামীর বসের মেয়েকে খুশি করবার জন্য তাকেও বিরক্তি চেপে কপট আগ্রহ প্রকাশ করতে হচ্ছে। ডিরেক্টরও তেমন। এক একটা প্রসেসিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আধঘণ্টা আলোচনা করছেন। লাল রঙের গোল মুখটা ঘেমে তেতে আরো লাল হয়ে উঠেছে।

ড্রায়ার থেকে বেরিয়ে সামনের ঘরটায় এসে এলিস আবার উচ্ছল হল- -খা চমৎকার চায়ের গন্ধ তো এখানে। বাগানেও এরকম সুগন্ধ আছে না কি !

এলিসের বোকামির উচ্ছ্বাসে রাগ হল রিণার। মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বলল- বাগান ! ওঃ বুশের মধ্যে তো ঢুকবারই উপায় নেই। গাছের ডালের খোঁচায় হাতের চামড়া ছড়ে যাবে।

রিণার আশংকা হল মেয়েটা এখনি না আবার আবদার ধরে বসে টি-বুশে যাবো। কাঁচা চা পাতার গন্ধ নেব। রিণা নিজে এত বছরে কোনদিন চা বাগানে নামে নি। আবার বলল- তা ছাড়া এই বর্ষায় গাছের নিচে তো সরু সরু জোঁক কিলবিল করছে। আর এক ধরনের লাল মাকড়সা আছে।

আশরাফ বোধহয় রিণার অবস্থাটা বুঝল না। হেসে বলল- কেন বেচারীকে ভয় দেখাচ্ছ !

তারপর এলিসের দিকে ফিরল -আপনি জানতে চাচ্ছেন বুশে চা পাতার গন্ধ আছে না কি ?

এলিস মাথা নাড়ল- হ্যাঁ তাই।

পাতায় তেমন গন্ধ নেই। তবে সীড ট্রি হিসেবে যে গাছগুলো আমরা রাখি তাতে বর্ষায় এক রকম হলুদ ফুল ফোটে। সুন্দর গন্ধ তার।

ফেনারে শুকনো পাতাগুলো চালা হচ্ছে। চালনীতে একটু মোটা ধরনের পাতা থেকে দু'পাতা এক কুঁড়ির চাগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তার এক মুঠো এলিসের দিকে এগিয়ে দিল অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার- লুক ম্যা'ম। এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সপোর্ট কোয়ালিটির চা। এবার আসুন পাশের ঘরে।

পাশের ঘরে অনেকগুলো কামিন হাত চালনী দিয়ে চালা পাতাগুলো আবার চালছে। গুঁড়ো ঝরে গিয়ে আরো রিফাইনড চা তৈরি হচ্ছে। কামিনগুলোর দিকে তাকিয়ে এলিস অসতর্ক মন্তব্য করে ফেলল- এরা এমন ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে আছে কেন ?

বলেই নিজেকে সংযত করল সে। চা পাতায় মনোযোগ দিল। এখানে এসে নতুন দেশ দেখবার বৈচিত্র্য যেমন সে পাচ্ছে তেমনি মনে মনে বারা বার ধাক্কা খাচ্ছে। গাড়িতে আসতে পথের দু'ধারে যেসব লোক দেখেছে তাদের অনেকেই নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরা। অনেকে তো প্রায় হাফ নেকেড।

অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। সে কি বুঝেছিল যে ডিরেক্টরের মেয়ে আসবে ফ্যাক্টরী দেখতে। তাহলে তো ওদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে বলত। তবে বললেই বা কি হত। ডিরেক্টরই হয় তো জানেন না যে ওদের অনেকেরই একটার বেশি দুটো কাপড় নেই। তাও আবার রংজ্বলা বিবর্ণ। পরিষ্কার থাকবার সাবান সোডাই বা ক'জন কিনতে পারে! হপ্তার তলব তো ধারের টাকা বাবদ মহাজনের হাতে তুলে দিতে হয়। বাকিতে কিনতে হয় খোরাকীর চাল তেল নুন। ডিরেক্টরের সুন্দরী মেয়ে কি ইংল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কথা কখনও পড়ে নি? না কি টেলিভিশনে বাংলাদেশের বন্যা সাইক্লোন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ছবি দেখে নি? যা দেখে সারা ইয়োরোপ আমেরিকার লোকেরা জানে বাংলাদেশের মানুষ অনাহারী, হাফ-ফেড, হাফ-নেকেড।

এলিস তার অব্রিটিশজনিত ব্যবহারে লজ্জা পেয়েই বোধহয় বলল - চলুন এবার ফেরা যাক।

রিণা হাফ ছেড়ে বাঁচল।

রাতে আশরাফ রিণাকে বলল—রিণা এলিস ধরেছে তামা বিল জাফলংয়ে বেড়াতে যাবে। ইফতেখারটা তো ডিরেক্টরের মেয়েকে দেখে মজে গিয়েছে একেবারে।

রিণা একটা হালকা নাইটি পরে মুখে ক্লিনজিং মিল্ক টনিক ঘষছিল। মুখ না ফিরিয়ে বলল--ইফতেখার তো মেয়ে দেখলেই মজে।

আশরাফ মৃদু হাসল--এখানে হয় তো অন্য মতলব আছে। যা ক্লিকী ছেলে। যাক তিনি তো এলিসকে জাফলং টি এস্টেট আর খাসিয়া জয়ন্তিয়া রেঞ্জের ফ্যানটাসটিক গল্প শুনিয়ে নাচিয়ে তুলেছে।

রিণা বিরক্ত হল—বাঃ বা। ওই নাচুনী মেয়েটার পাল্লায় পড়ে সকালে ঘুরতে ঘুরতে আমার পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। চায়ের ডাস্টে এলার্জি হয় আমার। সর্দি বাধিয়ে বসে আছি।

রিণা আবার মুখের পরিচর্যায় মন দিল। বিশ্রী হিউমিডিটিতে রেগুলার মুখ ম্যাসাজ না করলে কেমন স্যাঁতসেঁতে ছাতা পড়া হয়ে যায় চামড়া। আশরাফ বেয়ারাকে ডেকে কফির হুকুম করল। রিণা অবাক হল এই অসময়ে কফি কেন? ডিনার টাইম তো হয়ে গেছে। খাবার পরেই না হয় কফি খেতে!

আশরাফ ক্লান্ত শরীরটা বিছিয়ে দিল সোফায়! সিগারেট ধরাল একটা। বলল এতক্ষণ ডিরেক্টরের সঙ্গে একটানা কাজ করে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। এতও খাটতে পারে বুড়ো।

রিণা উঠে এসে আশরাফের মাথার কাছে বসল তোমাকে অ্যাকটিং ম্যানেজার থেকে পার্মানেন্ট করবার ব্যাপারে কিছু বলল?

আশরাফ মাথা নাড়ল। রিণার ভ্রূতে বিরক্তির রেখা ফুটল ব্রিটিশ ম্যানেজারদের ওরা কত বেশি মাইনা দিত। সে তুলনায় একজন বাঙালী ম্যানেজার অনেক কম পায়। চা বিক্রি করে ওরা লাভ তো কম করছে না।

আশরাফ ঘাড় কাত করে রিণাকে দেখল। হাসল রিণা তুমি কিন্তু চমৎকার প্লীড করতে শিখেছ।

রিণা খাটো চুলে ঝাঁকুনী দিল- কেন করব না! এই জংগলে পড়ে আছি বছরের পর বছর। তার ওপর তোমার যা হাড় ভাঙা পরিশ্রম। বলতে গেলে সুপারিনটেন্ডেন্টের কাজও তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে।

আশরাফ নিরুদ্বিগ্নে হাসল পরিশ্রম না করলে তো বাগানেরই ক্ষতি। আর বাগানের ক্ষতি মানে শুধু কোম্পানীর লোকসান নয়। কয়েকশ লোকের রুজীর অনিশ্চয়তা।

রিণা বিরক্ত হয়ে উঠে গেল। আশরাফের এই সব বড় বড় কথা তার একটুও ভাল লাগে না। কেন ডিরেক্টরকে ধরে পার্মানেন্ট ম্যানেজারশীপটা করিয়ে নিলেই তো পারে। নিজের ভাবনা নেই। কেবল বাগান আর বাগান। রিণা বিরক্ত মুখে টেপ চালু করল। বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে আশরাফ তার মথ কালেকশান রুমে এল। ছোট ঘরটায় কাচের বাক্সে অসংখ্য নানা জাতের মথ আর প্রজাপতি সংগ্রহ করে রেখেছে সে। রিণা অনেক সময় রেগে গিয়ে বলে- ওগুলোই তোমার ছেলেমেয়ে। রঙিন ডানার ছোট্ট একটা প্রজাপতির শরীরে চোখ রেখে অন্যমনস্ক হল আশরাফ। অনেকদিন বিয়ে হয়েছে তাদের। রিণা এখনও মা হয় নি। ভালো ডাক্তারও দেখিয়েছে দুজন। ডাক্তার বলেছে সন্তান হবার জন্য

দু'জনেই ফিট। তবু প্রজাপতির মত ফুটফুটে শিশু উড়ে বেড়ায় না তাদের ঘরে। আশরাফের মাঝে মাঝে মনে হয় রিণা যেন সেই বিশ্রী একটা পোকা। যে কখনও প্রজাপতি হয়ে উড়ে উড়ে আনন্দের ঝলক দেবে না। রিণা বোধহয় প্রজাপতি হতে চায় না। ঢাকায় জমি কিনেছে রিণা নিজের নামে। বাড়ি তৈরির প্ল্যান পাস করিয়েছে। শিগগির বাড়ির কাজ শুরু করবার ইচ্ছে ওর। রিণা এখন বাড়ি গাড়ি পার্টি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। ও কি জানে সেই বিশ্রী পোকার মত আশরাফের মনের সবুজ পাতাগুলো একটার পর একটা খেয়ে চলেছে ও। চোখের দৃষ্টিতে ছোট্ট প্রজাপতিটা আবার সুস্পষ্ট হল। একটা ডানা খুলে পড়েছে প্রজাপতিটার। শোকেসের ঢাকনা সরিয়ে ডানাটা জোড়া লাগল আশরাফ। এটা উপহার দিয়েছিল রবার্ট। এগুলো প্রিজার্ভ করতে যথেষ্ট মাথা খাটাতে হয়। এ ব্যাপারে রবার্টের ভীষণ উৎসাহ! ও তো সারাদিন বাগানের বুশে ঘুরে বেড়ায়। কোন পোকা মাকড় লতা পাতা চা বাগানের ক্ষতি করে তাই নিয়ে গবেষণাও করে বসে বসে। সেবার ছ'-নম্বর সেকশানের বুশের গাছ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল রবার্টকে আশরাফ। বুশে কিছু মিকানিয়া লতা দেখে রবার্ট ক্ষেপে আগুন। ওখানকার বুশ-গুলোতে অবশ্য রেড রাস্ট ডিজিজই হয়েছিল। ওষুধের পরিমাণ রবার্টই ঠিক করে দিয়েছিল। চল্লিশ গ্যালন পানিতে কপার স্যানডোজ আর কোব-কস ব্লু মিশিয়ে দিতে হবে দেড় পাউন্ড। পনের দিন পর পর গাছের ডালে ঢালতে হবে। রবার্ট বলেছিল—এই মিকানিয়া লতা বাগরাকোট এগুলো তো বুশের শত্রু। আশরাফ তোমার শিশুকে যদি হুকওয়ার্ম আক্রমণ করে সে যেমন নিষ্প্রাণ ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, এই আগাছারাও তেমনি বুশের জীবনীশক্তি টেনে নেবে। টি-বুশকে নিজের সন্তানের মত যত্ন করতে হবে। একজন চায়ের মানুষের এটাই হল জীবনের ব্রত! আশরাফ জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকাল। সে কি সত্যি চায়ের মানুষ হয়ে উঠেছে। রবার্টের মত একাগ্রতা আর প্রাণশক্তি কোথায় তার। সে তো ক্রমাগত হতাশ হয়ে উঠছে। রিণা এসে পেছনে দাঁড়াল কি খাওয়া-দাওয়া করতে হবে? না কি প্রজাপতির জগতে বসে থাকলেই চলবে?

আশরাফ ফিরে এল রিণার দৃষ্টির সীমানায়—এই যে দেখ রিণা। এই হলুদ প্রজাপতিটার ডানাটা আলগা হয়ে কেমন ঝরে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে গলে যাচ্ছে যেন।

রিণা নিস্পৃহ উত্তর দিল—যা বৃষ্টি হয় এখানে! তাতে মানুষই গলে যায়। আর তোমার প্রজাপতি!

খাবার টেবিলে বসে আশরাফ রিণাকে দেখল। মাথা নীচু করে খাচ্ছে রিণা। রিণাকে হঠাৎ ভীষণ বিশ্রী লাগল। একটা সুন্দর প্রজাপতি নয়, যেন একটা কদাকার পোকা লোভীর মত গাছের কচি পাতাগুলো নিষ্ঠুর ভাবে খেয়ে চলেছে। রিণা প্রজাপতি হল না। হয় তো এই চা বাগান রিণাকে প্রজাপতি হতে দিল না। খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলল রিণা কি হয়েছে তোমার? কিছু খাচ্ছ না যে?

আশরাফ উত্তর দিল না। ন্যাপকিনে মুখ মুছে উঠে গেল। বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরাল। সারাটা টিলা চাঁদের আলোয় ভাসছে। দূরে বগামেড্‌লা আর অ্যাডোরাটিসিমা গাছের ছড়ান ঝিরিঝিরি পাতায় রুপোলি ঝলক। লনের টেনিসকোর্টের ধারে বেগুনি প্যাট্রিয়ার ঝাড়ে হালকা বাতাসের ঝাপটা। মিষ্টি ফুলের সুগন্ধ ভাসছে ভেজা বাতাসে। লম্বা টানা বারান্দায় চাঁদের আলোর জাফরী। রিণা উদ্বিগ্ন হয়ে বারান্দায় এল শরীর খারাপ করেছে না কি তোমার কিছু তো খেলে না।

আশরাফ বেখাপ্পাভাবে রেগে উঠল উঃ। কেবল খাওয়া আর খাওয়া। ভাল লাগে না। যাও।

রিণা থমকাল। কি হয়েছে আশরাফের। মার্জিত মানুষ হিসেবে চা বাগানের সমাজে আশরাফের সুনাম আছে। যতটুকু কড়া না হলে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের বাগান চালান সম্ভব নয় তার বেশি অনাবশ্যক কড়া সে হয় না। পরিমিত ড্রিংক করে। পার্টিতে কেউ তাকে মাতাল হতে দেখে নি। কুলিরা তো এক কথায় বলে মানিজার সাহাবটা মানুষ লয়। দেব্‌তা আছে। এমুন সাফ লজর। কুনদিন একটা রেন্ডীর মুখে লজর দেয় নাই। বাগানের চোখে পড়বার মত কামিনগুলোকে নিয়ে ব্যাচেলর ম্যানেজারদের মধ্যে ঠাট্টা তামাশা চলে। আশরাফ কোনদিন তাতে যোগ দেয় না। বরং বিরক্ত হয়। ইফতেখার কতদিন বলেছে ভাবী! আপনার কর্তার গার্জেনীতে আমরা অস্থির। একটু ফান পর্যন্ত করবার উপায় নেই। রিণা তাতে গর্বিতই বোধ করে। বাগানে লুকোচ্ছাপির মধ্যে কার ফান কতটুকু গড়ায় সে খবর তো অনেকেই জানে। রিণা আশরাফের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল—মিঃ ডেভিডের সংগে বুঝি কিছু নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছে?

আশরাফ নিজেকে সংযত করল—না। কিছু হয় নি!

তবে?

রিণার উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আশরাফ কোমল হল। হাসল অল্প—তবে কিছুই না। আসলে কি জানো মাঝে মাঝে মনটা কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাগানের অত সবুজ উজ্জ্বল পাতাগুলোরও তো রোগ হয় রিণা। মিকানিয়া লতা বৃক্ষগুলোকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে রুগ্ন করে ফেলে। তেমনি

এই পরিবেশ আমাকেও অসুস্থ করে তোলে।

রিণা নিশ্চিন্ত বোধ করল—চা বাগান ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না তুমি। দিন রাত এক চিন্তা নিয়ে থাকলে অসুস্থ তো হবেই। ছুটি নিয়ে চল ক'দিন ঢাকায় ঘুরে আসি। না হয় চল শিলংয়ে।

আশরাফ উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল টবে ফোটা লাল ফ্লগসের দিকে। আজ সে মিঃ ডেভিডের কাছে কথা তুলেছিল কুলিদের তলব বাড়াবার ব্যাপারে। কথাটা উড়িয়েই দিলেন ডেভিড। দিন চার টাকা পাঁচ পয়সা দেওয়া হচ্ছে ওদের ফ্ল্যাট রেটে। তাছাড়া পাতা তোলার ওপর তো কমিশন রয়েছেই। তার ওপর রয়েছে অন্যান্য সুবিধা। বাড়ি ঘর। মেডিক্যাল ফ্যাসালিটি। চাষ করবার জমি। এক এক বাগান তো এক এক রেটে হফ্তা দেয়। এর মধ্যে স্পেনসার নিঃসন্দেহে ভাল পেমেন্ট করে। পুজো আর ফাগুয়ার বোনাসও কম নয়। গ্রোন আপ লেবাররা মাথা পিছু পুজোয় বোনাস পাচ্ছে পয়তাল্লিশ টাকা। ফাগুয়ার পনের টাকা। এরপর আশ-রাফ আর অগ্রসর হয় নি। ইংল্যান্ডে বসে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বাগানের ব্যাপারে সব কিছু নির্ধারণ করে। এদিক দিয়ে সেই পুরোনো আমলের নীতিটাই অত্যন্ত নিয়ম মাফিক অনুসরণ করে আসছে তারা। চা বাগানের পত্তনের গোড়ায় কুলিরা এক রকম পেটে ভাতে কাজ করত। রেশন দেওয়া হত। তারপর হফ্তার প্রবর্তন। সারা সপ্তাহের ধার দেনার পর হফ্তার তলব হাতে আসে কুলিদের। আর তা খরচও হয়ে যায় দেনা শোধ করতে। বাড়তি উদ্বৃত্ত জমে না কারো। তার ফলে টাকায় ক্রাচে ভর দিয়ে কখনোই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না কুলিরা। পারে না দলবদ্ধ হয়ে কাজ বন্ধ করে মালিকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। পেনশন নেই বলে শেষ বয়সে কুলিরা হয় ছেলেমেয়ের গলগ্রহ হয়ে থাকে নয়ত না খেয়ে ধুকে ধুকে মরে। প্রতিবাদ করে না। প্রতিবাদ করতে জানে না। সুদীর্ঘ দিনের ব্রেনওয়াশে তারা কুলি হয়েই বেঁচে আছে। কখনো মনে হয় শোষ-ণের এই জাল ছিঁড়ে তারা কোনদিনই বেরিয়ে আসতে পারবে না। মিঃ ডেভিড খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বুঝিয়েছেন—দেখ আশরাফ! লেবার কস্ট বাড়লে চায়ের দামও বাড়বে। কম্পিটিশানে বাংলাদেশের চা মার খাবে।

আশরাফ আস্তে বলেছে—কুলিদের হফ্তা শুধু বাংলাদেশেই নয় প্রায় সবদেশেই কম। বাড়াতে হলে ইন্ডিয়া সিলোন সবাইকেই বাড়াতে হবে। এই দেশগুলোতে তো টি লেবারদের ওয়েজের ব্যাপারে কোন অ্যামে-ন্ডমেন্টই হয় নি। অথচ অন্যান্য লেবারদের ওয়েজ একটা বার্গেনিং পয়েন্টে এসে নির্ধারিত হয়েছে। ডেভিড বিরক্ত হয়েছেন—ওয়েল, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটাই যদি প্রবলেম হয় তবে এ বিষয়ে আমরা নেক্স্ট্ বোর্ড মিটিংয়ে

আলোচনা করব।

রিণা হাত রাখল আশরাফের কাঁধে রাত হয়েছে। ঘুমোবে চল।

আশরাফ অন্যমনস্ক জবাব দিল-- তুমি যাও। আসছি আমি।

সেই কোন কাল থেকে বাগানে মহাজন আর মদের দোকানের ছাড়পত্র খুলে দিয়েছিল ইংরেজ গার্ডেনাররা। যেন ইংরেজের হাতিয়ার হয়ে স্লো পয়-জনের মত কুলিদের রক্তে মিশে তাদের প্রাণশক্তি শুষে নিচ্ছে। এই পলেসীতে বাংলাদেশ ভারত শ্রীলংকার সব জায়গায় চা বাগানের কুলিদের জীবন একই খাতে বয়ে চলেছে। কি একটা রাত জাগা পাখির ডাক ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে আঙুলের ডগা স্পর্শ করল। আশরাফ দেখল রিণা নেই। বোধহয় ঘরে গিয়ে টেপ শুনছে। আশরাফের ভাবনাগুলো রিণাকে বলবার অর্থ হয় না। ও এসব শুনতে আগ্রহী নয়। অথচ যদি রিণা শুনত, ভাবত, উপলব্ধি করত। তবে কি আশরাফকে একা একা এতখানি অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হতে হত! রিণা হয় তো একা ঘরে মিউজিক শুনতে শুনতে অন্য স্বপ্ন দেখছে। আশরাফ পার্মানেন্ট হলে সিনিয়র গ্রেড পাবে। তাতে রিণার সম্মান। রিণার আয়েশ। রিণার সুখ। আশরাফ এখন যেন রিণার স্ট্যাটাসের সিঁড়ি মাত্র। রিণার স্ট্যাটাসের মোহ রিণার ভাবনা চিন্তা মিকানিয়া লতা হয়ে আশরাফকে কেবল অসুস্থ করে তুলছে। আর একটা সিগারেট ধরাল আশরাফ।

প্রপাতের রুপোলি ধারা বুকে নিয়ে ঘন সবুজ খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় উদ্ধত রেখা এঁকেছে আকাশের বুকে। এলিস মুগ্ধ হল। জাফলং-য়ের নদীতে এসে ভীষণ ভাল লাগল। বড় বড় বয়লার নুড়ি পাথর ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে এক পাহাড়ী নদী। কি মিষ্টি ঝরঝর শব্দ। জাফলং চা বাগান থেকে এখানে এসে উচ্ছ্বসিত হল এলিস। ইফতেখার সারা রাস্তা নানা গল্প করেছে। খুব লাইভলি পুরুষ। ইফতেখারকে ভালই লাগছে এলিসের। ওর গল্প থেকেই এলিস জেনেছে এ ভূভাগে কি দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল ব্রিটিশদের। এখানকার রাস্তাঘাট রেললাইন ব্রীজ সবই ইংরেজরা তৈরি করে রেখে গেছে। নিজের পূর্ব পুরুষ এবং ব্রিটিশ জাত সম্পর্কে গর্ববোধ করছিল এলিস। ইংল্যান্ডে অনেক এশিয়ান দেখেছে সে। আর সবার মত সেও এই কালো বিদেশীদের পছন্দ করে নি। এখন সে তাদের কৃপা করল। পুরো ঈস্ট এশিয়া ছিল ব্রিটিশ কলোনী। তারা এ দেশ ছেড়ে গেছে। তবু এ দেশের মানুষ তাদের কাছেই উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে

খাবার অন্ধ মোহে ছুটছে। আশরাফ এ সম্পর্কে কথা তুলেছিল—আসলে দু'শো বছরে ব্রিটিশরা এখানে শোষণ করে যত সম্পদ ইংল্যান্ডে নিয়ে গেছে তারই অধিকারে এ দেশের মানুষ ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতিতে দাবির হাত রেখেছে।

ইফতেখার কথাটার গতি অন্যদিকে নিল এখানে কিছুক্ষণ ঘুরে আমরা জাফলং টি এস্টেটে ফিরব! কি বল এলিস?

আশরাফ এলিসের দিকে তাকাল—এখানে আমার এক বন্ধুর বাংলো আছে। চলুন তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

রিণা বিব্রত আর বিরক্ত বোধ করল। আশরাফের বন্ধু বলতে তো এখানে রবার্ট। কি যেন খাপছাড়া রবার্টকে দেখে এলিস মনে মনে হাসবে কি না। রিণা তো রবার্টের সঙ্গে রীতিমত বোর ফিল করে। বরং জাফ-লং বাগানে ফিরে গেলেই হত। ওখানকার ম্যানেজার তো লাঞ্চের দাওয়াত দিয়ে রেখেছে। রিণা ইফতেখারের পাশে এসে দাঁড়াল। রিণা আজ জীনস আর টি সার্ট পরেছে। চোখে বাহারী রঙিন চশমা. আশরাফ এলিসের কাছে রবার্ট সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছে। ইফতেখার আস্তে রিণাকে বলল · ওই পাগলটার ওখানে গিয়ে সময় নষ্ট করবার কোন অর্থ হয় না। রবার্টের মধ্যে আশরাফ যে কি পেয়েছে তা ওই জানে।

ইফতেখার একটা সিগারেট ধরাল। রিণা চুপ করেই রইল। আশরাফ যখন যাবে বলেছে তখন কে আর নিরস্ত করবে!

নদীর ধার দিয়ে কিছুটা গেলেই রবার্টের বাংলো। জীপ দুটো থামল টিলার ধারে। ছোট টিলার চারধারে পাহাড়ী ক্যাকটাসের বেড়া। টিলার শরীরে শেডট্রির ছায়ায় কিছু টি-বুশ সবুজ ছড়িয়ে রেখেছে। জীপের শব্দেই বোধহয় রবার্ট নেমে এল। রবার্টের পরনে হাঁটু পর্যন্ত গুটান খাকী প্যান্ট আর সাদা গেঞ্জি। দু'হাতে মাটি। আশরাফকে দেখে রবার্টের নীল চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হল। মাটিমাখা হাতই বাড়িয়ে দিল সে হ্যালো!

আশরাফ এলিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল - এলিস বার্গম্যান! আমাদের ডিরেক্টর মিঃ ডেভিড বার্গম্যানের মেয়ে। মিঃ বার্গম্যানের সঙ্গে তো তোমার পরিচয় আছে।

রবার্ট হাসি মুখে সবাইকে অভ্যর্থনা করল। অবশ্য কথা বলল খুব কম। আশরাফ জানে রবার্ট সব সময় খুব একটা কথা বলতে পছন্দ করে না। কাঠের সিঁড়িতে শব্দ তুলে সবাই কাঠের পাটাতন করা বারান্দায় উঠে এল। রবার্ট তিন চারটে মোড়া এগিয়ে দিয়ে সংকোচে হাসল নার্সা-রীতে কাজ করছিলাম। আপনারা কিছু মনে না করলে হাতটা ধুয়ে

আসি।

আশরাফ তাকাল—এ সময় কিসের চারা তুলছে আবার?

রবার্টের ঠোঁটে হাসি। চোখের দৃষ্টি তার বিশেষত্ব নিয়ে কিছুটা অন্যমনস্ক—আফ্রিকার চায়ের কিছু বীজ জোগাড় করেছিলাম। আসাম টি সিলেটের আর আফ্রিকার প্ল্যাণ্টের সংমিশ্রণে কি ধরনের পাতা উঠবে সেটা দেখতে চাচ্ছি। আর একটা পরীক্ষা চালাচ্ছি চাইনীজ চা গাছ আর এখানকার গাছের মিশ্রণ ঘটিয়ে। আসলে বুঝলে আশরাফ রিসার্চ দরকার। অর্থডক্স মেথডে গতানুগতিক ধারায় চা তৈরি করে যাওয়াটার কোন অর্থ হয় না। পরিবর্তন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই নতুন কিছু আসে। ইউ নো আশরাফ, কিছুদিন আগে তিব্বতে গিয়েছিলাম আমার মনে হচ্ছে কি জানো...সপ্তম শতক থেকে আসামের পথ ধরে তিব্বতে নিয়মিত ট্রেড অ্যাণ্ড কালচারের ফ্লো খুব ফ্লারিশ করেছিল। সম্ভবত এখানকার বুড্ডিস্ট মংক যাদেরকে নাথ বলা হত এরা উত্তেজক পানীয় হিসেবে চায়ের ব্যবহার জানত। এই একই পানীয় তিব্বত..

ইফতেখার ঠোঁটের কোণে হাসল মিঃ হল। ইউ নীড এ ওয়াশ।

রবার্ট সচেতন হল—ওঃ ইয়েস! ইয়েস। আমি এখুনি হাত ধুয়ে আসছি। হঠাৎ যেন খেয়াল হল এমনভাবে বলল—তোমাদের জন্য ড্রিংকস আনব?

ইফতেখারের ঠোঁটের চাপা হাসি আরো একটু ঝলক দিল—কি ড্রিংকস মিঃ হল? তোমার ঘরে তো আবার খাসীয়াদের তৈরি মদ ছাড়া আর কিছু থাকে না। মিস বার্গম্যান কি দেশী ড্রিংকস পছন্দ করবেন!

এলিস অবাক হয়ে রবার্টকে দেখছিল। এমন ব্রিটিশ সে খুব কম দেখেছে। জেনারেশান গ্যাপ থাকলেও ইংল্যাণ্ডে রবার্ট হলের বয়সী ব্রিটিশরা তার খুব অপরিচিত নয়। রবার্টকে নিঃসন্দেহে তার ইনটারেসটিং মনে হচ্ছিল। অবশ্য রবার্ট সম্পর্কে আশরাফ খুব সামান্যই বলেছে। মৃদু কণ্ঠে ধন্যবাদ দিয়ে এলিস বলল—নো থ্যাংকস! কখনও খাই নি।

রবার্ট আতিথ্যের হাসি ধরে রাখল মুখে—তাহলে একটু চা তৈরি করে আনি। মিসেস আহমেদ তো আবার ড্রিকসের দলে নেই।

ইফতেখার বলল—যাক মিসেস আশরাফই তাহলে রবার্টকে বাঁচিয়ে দিল।

রবার্ট ভেতরে চলে গেল। আশরাফ বিরক্ত চোখে তাকাল ইফতেখারের দিকে—এসব কি হচ্ছে ইফতেখার!

ইফতেখার নির্বিকারভাবে সিগারেট ধরাল—কিছু না। তোমার জিনিয়াসকে একটু লেগপুলিং করছিলাম।

আশরাফ মুখ ফিরিয়ে নিল। ইফতেখার মাঝে মাঝে সার্ভিসের

নিয়ম-কানুনগুলোকে বেশি মানতে গিয়ে না মানার সীমানায় নিয়ে যায়। একটু পরেই রবার্ট বেতের ট্রেতে চায়ের পেয়ালা বসিয়ে নিয়ে এল। ট্রেটা একটা মোড়ার ওপর নামিয়ে রেখে বলল—দুঃখিত! একটু দেরি হয়ে গেল। তোমাদের জন্য চা'টা তৈরি করেই নিয়ে এলাম। আর এই বিস্‌কিট-গুলো দেখ!

বিস্‌কিটের প্লেট তুলে সবার সামনে ধরল রবার্ট। উজ্জ্বল মুখে বলল—চা পাতা, সুগার, কর্ণ ফ্লাওয়ার, বাটার অয়েল দিয়ে বেক করে তৈরি করেছি। খেয়ে দেখো। আমার বিশ্বাস ইউ উইল এনজয় ইট।

এলিস কৌতূহলী মুখে একটা বিস্‌কিট নিল -চা দিয়ে যে আবার বিস্‌কিট হয় তাতো জানতাম না! একটু দাঁতে কেটে আবার বলল ভালই তো লাগছে।

সবাই একটা করে নিল। আশরাফ হাসতে হাসতে বলল--বব! ইউ আর রিয়েলী এ জিনিয়াস!

রবার্ট খুশি মুখে একটা মোড়া টেনে বসল তোমরা কি জানো চা পাতা দিয়ে শুধু লীকার তৈরি না করে আরো অনেক রকমে খাওয়া যায়। চা পাতার স্যালাড। চা পাতার সস্। চায়ের কেক...

ইফতেখারের চোখে আগের মতই তীক্ষ্ন দৃষ্টি -আপাতত চায়ের তৈরি বিসকিট যে খাচ্ছি তাতে সন্দেহ নেই। ডিরেক্টরকে ইনফরম করলে তিনি হয়তো একটা বাইপ্রোডাক্টের স্কীম তৈরি করতে মিঃ রবার্ট হলকে খবর পাঠাবেন।

ইফতেখারের খোঁচাটা আমলে আনল না রবার্ট। অল্প হাসল- মিঃ ইফ-তেখার! তোমাদের ডিরেক্টর বোধহয় বৃটিশদের চা খাওয়ার পুরোন গলপটা জানেন।

সবাই রবার্টের মুখে উৎসুক দৃষ্টি ফেলল। আশরাফ বলল—গলপটা তুমিই না হয় শুনিয়ে দাও আমাদের!

রবার্ট ঠোঁটে হাসি ধরে রাখল এ দেশে চায়ের প্ল্যানটেশানে বৃটিশরা তখনও হাত দেয় নি। চীন দেশের চা-ই ছিল ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে। তাদের আমদানী করা চা যখন প্রথম ইংল্যান্ডে এল তখন তা এক মহার্ঘ্য বস্তু। সোনার দাম তার। অতি মূল্যবান সেই পানীয় পয়সাওয়ালা লর্ড ডিউকরা কিনে নিলেন। কিন্তু মুস্কিল হল এই দামী পাতা কি করে খেতে হয় সেটা তাঁরা জেনে নেন নি। ফলে সেই সুগন্ধি পাতাকে জাল দিয়ে পানি ফেলে দিয়ে আনা হল। সেই সিদ্ধ পাতা মাখান রুটির ওপর বিছিয়ে খেলেন তারা। গর্বভরে পরস্পরকে এর সুস্বাদ সম্পর্কে অবহিত করলেন। এবং নিজেদের অভিজাত মনে

করলেন।

রবার্টের গল্প শেষ হলে সবাই হাসল। শুধু এলিস কেমন অস্বস্তি-বোধ করল। রবার্টের লাল চুল, নীল চোখ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে লোকটা খাঁটি ব্রিটিশ। কিন্তু লোকটাকে কেমন আশ্চর্য রকম অচেনা মনে হচ্ছে। লোকটাকে ব্রিটিশ বলে ভাবতে রীতিমত অবাক লাগছে তার।

চা শেষ হতেই ইফতেখার আর রিণা উঠে দাঁড়াল। রিণা তাকাল আশরাফের দিকে—আমরা একটু নদীর ধার থেকে ঘুরে আসি। যাবে না কি তুমি?

আশরাফ মাথা নাড়ল—তোমরা যাও ইফতেখারকে নিয়ে ঘুরে এস।

রিণার রাগ হল। আশরাফ বোধহয় ইচ্ছে করেই সব সময় রিণাকে জব্দ করতে চায়। তা না হলে কি রিণার একটা ইচ্ছারও গুরুত্ব দিতে নেই! সব সময় নিজের মেজাজের সীমানাতেই বাস করছে আশরাফ। উদ্ভট রবার্টকে সবার মত রিণাও যে পছন্দ করে না তা কি আশরাফ জানে না। ইফতেখার তাকাল এলিসের দিকে । এলিস হাসল- আমি না হয় একটু বসি এখানে!

রিণা আর ইফতেখার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ইফতেখার মৃদু ক্ষোভে বলল—ইংরেজ জাতের মাথা মুণ্ড বোঝা ভার। বড় সাহেবেরা রবার্ট সম্পর্কে এলার্জিক। আবার এলিস তো খুব উৎসাহ বোধ করছে দেখছি রবার্টের ব্যাপারে।

রিণা জবাব দিল না।

রবার্ট তাকিয়ে আছে দূরে। ছোট বড় নুড়ি পাথরে গর্জন তুলে নদীটা যেখানে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। স্রোত তার অতীত ঠিকানার স্বাক্ষর করেই যেন নুড়িগুলোকে বুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এলিসকে দেখ-বার পর থেকেই রবার্ট বুকের মধ্যে কেমন এক আলোড়ন ভাঙনের যন্ত্রণা বোধ করছে। সোনালি চুলে ঘেরা সুন্দর মুখটা যেন বার বার আর একটা মুখকে বুকের মধ্যে জাগিয়ে দিচ্ছে। ডোনা...ডোনা. .কতদূরে? কেমন আছে ডোনা? এলিসকে কি জিজ্ঞাসা করবে ব্রিস্টনের ডোনা নামের মেয়েটিকে সে চেনে কি না! আশরাফ আবার চা বাগানের গল্প তুলল। চা বাগানের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে রবার্ট বুকের ব্যথাটা ভুলে গেল। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তখন শেষ যুগ। কিছুদিন আগে ১৮২৬ সনে আসাম সীমান্তে ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেছে। সীমান্ত রক্ষার জন্য ব্রিটিশ আর্মি ঘাঁটি করে বসে আছে আসাম সিলেট অঞ্চলে। ওদিকে তখন বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কিছুটা মন্দা। ১৮৩৩ চার্টার অ্যাক্টে চীন দেশে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ বাতিল করা হয়েছে। চীন-

দেশের চায়ের একচেটিয়া বাণিজ্য ক্ষমতা ছিল তাদের। তাছাড়া ইন্ডিগো প্ল্যানটেশানেও গোলযোগ। নীল চাষীদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা তখন নতুন কিছু সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছে। অবশ্য এর আগেই ইংরেজ চা ব্যবসায়ী চীন দেশ থেকে কিছু লোক এনে এ দেশের পূর্ব অঞ্চলে চা চাষের চেষ্টা করলেন। কিন্তু চীন দেশীয় চা গাছ এ দেশের জল হাওয়ায় উৎসাহিত হল না। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সময় একজন ইংরেজ আর্মি অফিসার সম্ভবতঃ প্রথম আবিষ্কার করলেন এ দেশের আর্দ্র জল হাওয়ায় জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের গায়ে কিছু জংলী চা গাছ। তিনি তার ব্যবসায়ী বন্ধু রবার্ট ব্রুসকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। রবার্ট ব্রুস আর তার ভাই চার্লস ব্রুস চা চাষে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তারা এ গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন এ চা চীনদেশের চা থেকে আলাদা। গুণ মানেও উন্নত। ব্রুস ব্রাদার্স উঠে পড়ে লাগলেন চা বাগানের আবাদ করতে। ইংরেজের আইনে ততদিনে ইংরেজদের ইন্ডিয়ায় জমিদারী কিনবার আইন পাস হয়েছে। উচ্চাভিলাষী ইংরেজরা অনেকেই ক্রমে এখানে জমিদারী কিনে চায়ের চাষে লেগে গেল। ইউরোপে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশানের ফলে অর্থনীতির চেহারা বদলে গিয়ে শিল্পের কদর বৃদ্ধি পেলেও এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ধারণা থেকে তখনও বৃটেনের সার্ফ সিস্টেমের চিন্তা মুছে যায় নি। সার্ফ ব্যবস্থায় কৃষি মজুরেরা ছিল জমিদারদের দাস। শুধু থাকা খাওয়ার বরাদ্দ ছিল তাদের। মজুরী বলে কিছু ছিল না। এ দেশেও মোটামুটি সেই ব্যবস্থাই প্রচলন করা হল। নীল চাষীদের নিয়ে ইংরেজদের খুব ঝামেলা হচ্ছিল। তাই এবার চা চাষে আর লোক্যাল পিপলকে মজুর হিসেবে বাগানে লাগাবার মত বোকামি করল না তারা। ইন্ডিয়ার অন্যান্য এলাকা থেকে মজুর আমদানী করল ইংরেজ চা প্ল্যান্টাররা। যেমন আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমেরিকায়।

এতক্ষণে কথা বলল আশরাফ- বব! চা বাগানে কুলি আমদানী সম্পর্কে তো অন্য কথা বলা হয়। বলা হয় যে সে সময় এসব এলাকার লোকদের নিজেদেরই যথেষ্ট চাষ আবাদের জমি ছিল। সে সব ছেড়ে বাগানের কাজে আসতে রাজি ছিল না। তাছাড়া প্ল্যাকিং মেয়ে মজুর ছাড়া ভাল হয় না। এখানকার মুসলমান চাষীদের মধ্যে কড়া পরদা প্রথা থাকায় তাদের মেয়েদের বাগানের কুলি করে আনা সম্ভব ছিল না। এই কারণেই সে কালের প্ল্যান্টাররা উড়িষ্যা মাদ্রাজ সাঁওতাল পরগনা থেকে লোক ধরে এনেছিল।

রবার্ট একটু হাসল—কথাটায় কিছুটা সত্যতা হয় তো রয়েছে। কিন্তু বলতে পারো পরদা প্রথা যাদের মধ্যে ছিল না এমন স্থানীয় লোকদের

ভো তারা বাগানে নিতে পারত। যেমন নমশূদ্র অথবা নীচু শ্রেণীর গরীব হিন্দু সম্প্রদায়। কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাবার কারণটা আর কিছুই নয়, স্থানীয় লোক সম্পর্কে ইংরেজদের ভয়। কারণ নীল চাষে জনসাধারণ তখন তাদের বিরুদ্ধে রীতিমত বিক্ষুব্ধ। এবং সে বিক্ষোভে বিদ্রোহও দেখা দিচ্ছে। নীলের চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। সুতরাং সে ভুল আর তারা করল না। আফটার অল, হোয়াইটরা ছিল বিদেশী। এক একটা বাগানে যদি এতগুলি করে লোক্যাল নেটিভদের কনসেনট্রেট করা হয় তা হলে হয় তো ভবিষ্যতে এরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সুতরাং দূরদেশ থেকে কুলি আমদানী করে তারা দূরদর্শিতার পরিচয় রেখে গেল। এর পর চায়ের ব্যবসায় জাঁকিয়ে বসল ইংরেজ। আসাম সিলেট দার্জিলিং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বিস্তৃত হতে লাগল চা বাগান। আমদানী হতে লাগল নতুন কুলি। সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল পরিষ্কার করে চায়ের আবাদ বসাতে গিয়ে শত শত কুলি সাপের কামড়ে মরল। বাঘের পেটে গেলো। হাতীর পায়ে নিষ্পেষিত হল। সে যুগের চালানের কুলিদের অবস্থা আমেরিকার নিগ্রো দাসদের মতই ছিল। পালিয়ে যাবার পথ ছিল না তাদের। বন্য জীব-জন্তু, রোগ-দুঃখ আর প্ল্যাণ্টারদের অমানুষিক অত্যাচার সয়ে তারা থেকে গেল। তাদের দুঃখের নিঃশ্বাসের বাতাসে চোখের পানিতে ভেজা চা বিক্রি করে ধনী হতে লাগল ইংরেজ বেনিয়ারা। সে সময় ইংল্যাণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায় ইণ্ডিয়ান টি পছন্দ করত। কিন্তু তারা জানত না ওই এক পেয়ালা চায়ের পেছনে রয়েছে কি অমানুষিক পরিশ্রম আর করুণ ইতিহাস! সেই সোনালী চা তারা যখন ঠোঁটে চুম্বন করত তারা জানতেও পারত না তারা আসলে মানুষেরই রক্ত পান করছে। জানত না কত কাল পিঠের চামড়া চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে। জানত না কত গর্ভবতী কুলি রমণীর গর্ভপাত হয়েছে গার্ডেনারদের নির্দয় লাথিতে।

রবার্টের মুখটা বিক্ষুব্ধ আর লাল দেখাচ্ছে। যেন নিজেরই কোন কলঙ্কের কথা অত্যন্ত তীব্র অনুশোচনায় স্বীকারোক্তির জবানবন্দী দিচ্ছে সে। উত্তপ্ত রোদ এসে পড়েছে কাঠের পাটাতনের ওপরে। এলিস নিস্তব্ধ। আবহাওয়াটা কেমন থমথমে হয়ে গেছে। এসব গল্প আশরাফ কিছু জানে। কি যেন এলিস কেমন ভাবে নিল। আশরাফ আস্তে বলল—বব! এসব গল্প থাক।

এলিস আস্তেই বলল—আমার তো মন্দ লাগছে না, বেশ ইন্‌ট্রেসটিং।

রবার্ট অপ্রতিভ হল—ওঃ দুঃখিত। আমি বোধ হয় একটু ইমোশ্যানাল হয়ে পড়েছিলাম।

এলিসের ঠোঁটে হাসি ঝিলিক দিল—মিঃ হল। আমি কিন্তু ইমোশ্যানাল হই নি।

রবার্ট উঠে দাঁড়াল—ও. কে! তাহলে আমি একটু কফি তৈরি করে নিয়ে আসি।

রবার্ট ভেতরে চলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে রবার্টের ঘরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। ঘরটা নানা আকৃতির ট্রাংকে বোঝাই। একধারে একটা সরু চৌকিতে ভুটিয়া কম্বল পাতা। আশরাফ এলিসের দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল—ওই ট্রাংকগুলো রবার্টের বই দিয়ে ঠাসা।

—রিয়েলি! কিসের বই? এলিস কৌতূহলী হল।

—সব ধরনের। সারা জীবন বব চাকরি করেছে। প্রচুর মায়না পেয়েছে। কিন্তু একটা পয়সাও জমায় নি। ওর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে বাগানে কুলিদের জন্য ইস্কুল আর হাসপাতালে দিয়ে দিয়েছে। এখন ওর সম্বল এই টিলা আর দুটো পুরোন জীপ।

—আশ্চর্য! ওর ছেলেমেয়ে কেউ নেই?

—ওর স্ত্রী এখানকার বাগানেই মারা গেছে।

আশরাফ হঠাৎ চুপ করে গেল। একটু পরে আবার বলল—এক মেয়ে আছে। ছোটকাল থেকেই সে ইংল্যান্ডে আছে। আগে ব্রিস্টনে থাকত। এখন কোথায় আছে জানি না। রবার্ট তো আগে মাঝে মাঝে ইংল্যান্ডে যেত মেয়েকে দেখতে। এখন যায় না। বোধহয় মেয়ে বাবাকে খুব একটা পছন্দ করে না।

—কেন?

—কি যেন। হয় তো সে তার বাবার এই খাপছাড়া ভবঘুরে জীবন পছন্দ করে না। তাছাড়া বব তো বাংলাদেশী নাগরিকত্ব নিয়েছে।

—মিঃ হল বোধহয় কিছুটা এক্‌সেন্‌ট্রিক।

—কিছুটা। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে যুদ্ধে এসেছিল সে বর্মাফ্রন্টে। যুদ্ধ থেকে ফিরে গিয়ে রবার্ট আর ইংল্যান্ডে মন বসাতে পারল না। পঁচিশ বৎসরের অ্যাডভ্যাঞ্চারাস যুবক চাকরি নিয়ে ফিরে এল চা বাগানে। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর এখানে কাটিয়ে বব এখন চা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না।

এলিস চুপ করে রইল। কোন ইংলিশম্যান এমন খাপছাড়া অদ্ভুত জীবন কাটাতে পারে চোখে না দেখলে এলিস ভাবতে পারত না। তবু তার ভাল লাগছে। কেমন এক রকম নতুনত্বের নেশায় সে খুব পছন্দ করছিল রবার্টকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংরেজদের রক্ষণশীলতায় ফাটল ধরেছে। পুরোন ধ্যানধারণাকে উপেক্ষা করে নতুন জীবনাদর্শ গ্রহণ করেছে এ যুগের ব্রিটিশসমাজ। সেই জীবনাদর্শের প্রভাব এলিসের মধ্যে। আজ

সকালে নিজের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে যে গর্বিত অহংকার তাকে স্ফীত করেছিল সে অহংকারকে অনায়াসে অবহেলা করল এলিস. তেমনি ইংরেজদের ন্যক্কারজনক ইতিহাসও তাকে আর তেমন আলোড়িত করল না। এই মুহূর্তে রবার্টের জীবনটাই তাকে চমৎকৃত করল। কফি নিয়ে এল রবার্ট। এখন সে একেবারে চুপচাপ। আশরাফ জানে রবার্ট অনেক কথা বলবার পরে এমনি হঠাৎ করে চুপ হয়ে যায়।

এলিস কফির পেয়ালা নিয়ে হাসল--মিঃ ::ল! আমি কিন্তু আর একটা কথা ভাবছি। আমার মনে হয় আপনার বক্তব্যে আপনি একটা দিক এড়িয়ে গেছেন। জাস্ট থিংক অ্যাবাউট দ্যাট ইংলিশ পিপল। আজ থেকে একশ' দেড়শ' বছর আগে যারা ইংল্যান্ড ছেড়ে আসত। এই ভয়াবহ জংগলে সমাজ ছাড়া জীবন কাটত যাদের তাদের অবস্থাটাও কি একবার ভেবে দেখা উচিত নয়?

রবার্টের নীল চোখে উজ্জ্বল হাসির ছটা ঝিলিক দিল--দেয়ার ইউ আর। এই সুদূর জংগলের দেশে একদল কালো ক্রীতদাসের মত মানুষের মধ্যে গোত্রহীন জীবন অবশ্যই তাদের পীড়িত করত। আর সেই কারণেই বোধহয় ইংল্যান্ডের সমাজে যার আচরণ ছিল সভ্যভব্য এখানে এসে সে হয়ে উঠত বর্বর। একদিকে কাঁচা টাকার ঝলক আর একদিকে নিঃসংগতা। দু'টোর মধ্যে পড়ে এক ধরনের টাইপ চরিত্র হয়ে উঠত তারা, অবশ্য সবাই নয়।

এলিস হেসে ফেলল--যেমন আপনি।

রবার্টও হাসল--আমাদের সময়ে তো বাগানগুলো অনেক সিভিলাইজড হয়ে গেছে। তখন তো রীতিমত সিলেকটেড ক্যানডিডেটদের এখানে পাঠান হত।

রবার্ট কথা বন্ধ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল দূরের পাহাড়ের ঘন সবুজে। ঝকঝকে নীলাকাশের বুকে উদ্ধত সবুজ চিরন্তন সত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সত্য যে বড় নিষ্ঠুর। বড় ডিমানডিং। অনেক কিছু দেয়। আবার অনেক কিছু ছিনিয়ে নেয়। রবার্টের বুকে আবার সেই ব্যথার অনুভূতি। তার সামনে বসে আছে একটি ইংলিশ তরুণী। তবে সে ডোনা নয়। কত বছর ডোনাকে দেখে নি রবার্ট। শুধু নিউ ইয়ারে আর ডোনার জন্মদিনে আজও উইশ করে কার্ড পাঠায় সে ব্রিস্টলের ঠিকানায়। ডোনা এই মেয়েটির বয়সী হয় তো। কিন্তু অন্যরকম। ভয়ংকর অস্থির। ভীষণ উদ্ধত, ডোনার ধারণা তার মায়ের মৃত্যুর জন্য তার বাবা রবার্টই দায়ী। বাগান নিয়ে পাগল লোকটা তার নিঃসঙ্গ মায়ের দুঃখ বোঝে নি কোনদিন। বাবাকে ঘৃণা করে সে। সেই ঘৃণাই বোধহয় তাকে স্থির হতে দেয় না। ভীষণ উশৃংখল জীবন তার। এর মধ্যে দু'বার

বিয়ে ভেঙেছে।

রবার্টের মুখের রেখায় বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়ছে।

রিণা আর ইফতেখার ফিরে এল। ইফতেখার বলল—এবার ফেরা দরকার

রিণাও ঘড়ির দিকে তাকাল—সত্যি অনেক বেলা হয়েছে, বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

সবাই উঠল। এলিস সিঁড়িতে পা রেখে থামল—মিঃ হল, আজ আপনার বাগান দেখা হল না। আর একদিন আসব দেখতে।

রবার্ট বিষণ্ণ হাসল—অবশ্যই। খুব খুশি হব।

খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ওপর দুপুরের রৌদ্রে আবার চোখ রাখল রবার্ট...ডোনা...ডোনা...কতদূরে!

এলিস চলে যাচ্ছে। রবার্টের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল।

সাত

আফিস ঘরের সামনে কুলিরা খুশি মনে কথাবার্তা বলছে। টিন শেডের বারান্দায় বড় খাতা নিয়ে বসেছে বড়বাবু। পাকান শণের দড়ির মত লম্বাটে মানুষ। কপালের ওপর দিকে চুল পাতলা হয়ে গেছে। মোটা কাচের চশমার ভেতর দৃষ্টিটা ভীষণ ধূর্ত আর তীক্ষ্ম। এক এক করে নাম ডেকে হফতার তলব দিচ্ছে। মেয়েরা কি নিয়ে চেঁচামেচি করছিল। বড়বাবু এক টানে চশমাটা নাকের ওপর থেকে সরিয়ে ধমকে উঠল—এই রেন্ডীরা, সব বাঁদরের মত কিচির মিচির করছিস কেন?

রুকমিনি গলা তুলে বলল—তলবটা জলদি কইরে দিয়ে দে বাবু। হাটে যাইতে হইবে।

বড়বাবু খিঁচিয়ে উঠল—ওরে আমার সোহাগীরা। আরে আমার কি চারটে হাত? দেখছিস না সেই কখন থেকে ঘাড় গুঁজে বসে আছি। শালার পিঠের শিরদাঁড়াটা বোধহয় আর সোজা হবে না।

প্লেটের ওপর থেকে দুখিলি পান আর এক মুঠো জরদা মুখে ফেলে বড় বাবু আবার নাম ডাকতে লাগলেন। বিন্দিয়া টিপ দিয়ে টাকা নিল। মুখ ভর্তি পান নিয়ে বড়বাবু বললেন—এবার তো খুব কমিশন মেরেছিস। সত্যি কি এত পাতা তুলেছিস? না ইট পাথর দিয়ে গোজামিল দিয়েছিস?

ভেতরের ঝাঁঝিয়ে ওঠা রাগটা সজোরে দমন করল বিন্দিয়া—কেনে রে বাবু। তুহার টিলাবাবু তো ঝুড়ি উল্টাইয়া দেইখে মাপের মেশিনে বসায়।

টিলাবাবুকে জিগ্‌গেস করে দেখ না।

বড়বাবু পানের পিক ফেলে বললেন--উঃ। মাগীটা কেউটের মত ফোঁস করে ওঠে।

খাতা দেখে নাম ডাকতে লাগল বড়বাবু।

তলব কোমরের থলেতে ভরে আফিস ঘরের সামনের মাঠ ছাড়াতেই রাজিন্দর এসে ধরল অর্জুনকে--হেই অর্জুন' চল পাট্টায় যাই।

অর্জুন মাথা নাড়ল--তুই যা। আমি হাটে যাবো।

রাজিন্দর চওড়া হাতের থাপড় বসাল অর্জুনের কাঁধে--আরে রাখ তোর হাট। চল। একটু নেশা করে লে আগে।

বিষ্ণু আর লক্ষ্মণ এসে দাঁড়াল পাশে। বিষ্ণু বলল- চল সবাই মিলে হাটে যাই। পাট্টায় পরে গেলেও চলবে।

লক্ষ্মণ হাসল--বিষ্ণুদাদা, তোমাদের কত রোজগার। হাট তো তোমাদের জন্যই। আমরা তো কিনব লবণ তেল আর ডাল, তবু এই হাটের আশাতেই বাড়ির রেণ্ডীগুলো হা করে বসে থাকে।

রাজিন্দর হালকা আনন্দে হাসল--আরে রেণ্ডীগুলোর তলব তো ওরা হাটেই খরচ করে। মনটা ওদের হাটেই পড়ে থাকে। আমাদের তলব হচ্ছে পাট্টায় খরচ করবার জন্য।

অর্জুন বলল--পাট্টায় খরচ করব তো মহাজনকে দেব কি। সে তো দোকানের পয়সার বাক্স কোলে নিয়ে বসে আছে. সব তলব তো ওর ওই বাক্সর পেটে যাবে।

রাজিন্দর হো হো করে হাসল। তলবের টাকায় ফূর্তিতে মনটা একেবারে রঙিন বেলুনের মত হালকা হয়ে গেছে। অর্জুন রাজিন্দরের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হল না। বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগল। সপ্তাহ অন্তের এই দিনটার অপেক্ষায় সবাই তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। চা বাগানে এখন পাতার ঢল। বাঁধা রেট চার টাকা পাঁচ পয়সা। কিন্তু দিনে চব্বিশ সেরের ওপরে পাতা তুলতে পারলে বাড়তি কমিশন। অনেকে তো দেড় মণ পর্যন্ত পাতা তুলে বাড়তি কমিশন কামাই করছে। যাদের পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি তাদের তো সুদিন হবার কথা। দশ বছরের ছেলেটাও ইস্‌কুলে নাম কাটিয়ে দিন তিন টাকা কামাই করছে। কিন্তু মাত্র আজকের দিনটাই তাদের হাতের তালু কিছুক্ষণের জন্য টাকার গরমে থাকবে। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টাকাগুলো অবাধ্য মুনিয়া পাখির মত ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে যাবে মহাজন ফয়েজ আলীর কাছে। বাকি যা থাকবে তা খরচ হবে হাটে। একদিনের বাদশাহীর পর আবার ফকির। দলে এসে ভিড়ল শংকলাল। বলল এবার রেশনে কি আটা দিয়েছে দেখেছিস তোরা?

শালার রেশন বাবু হারামী ঘুঘু একটা। সাড়ে তিন সের আটা মাথা পিছু। তাতে আবার অর্ধেকই ভুষি। আমার ছোট মেয়েটা পায় দেড় সের। সে তো প্রায় বারো আনাই ভুষি।

লক্ষ্মণ কথা বলল--এদিকে তো বড় বড় বাতচিত। বড়বাবু কথায় কথায় হুমকি দেয় আমরা নাকি স্বর্গে আছি। থাকার ঘর। চাষের জমি। ফ্রি রেশন।

অর্জুন খোঁকিয়ে উঠল আরে রাখ তোর থাকার ঘর। কোন আমলে লম্বা এক ব্যারাক বানিয়ে দিয়েছে কোম্পানী। গরু ছাগলের মত গুতো-গুতি করে একটা ঘরে থাকে সবাই। বর্ষায় পানি পড়ে ঘরে ঢল নেমে যায়। সারাই করবার কথা তুললেই বাবু ধমকায়। বলে কোম্পানী লসে যাচ্ছে। এখন কুলিদের জন্য নতুন ঘর তুলবে কোথায় থেকে ! আর বাপ দাদার আমলের পাওয়া জমি সেটাই ভাগাভাগি করে চাষ করছে। নতুন জমি কি আর দেওয়া হচ্ছে না কি বড় কুলিদের।

কথাটা বিষ্ণুর লাগল। টিলাবাবুকে ধরেপড়ে আরো কিছু নতুন জমির বন্দোবস্ত নিয়েছে সে। খারাপ মেজাজে বলল--অর্জুন তুই খুব বড় বড় কথা বলিস। কেবল আমাদের বাবুদের দোষ দেখিস কেন রে। দেখে আয় গিয়ে দেশী বাগানগুলোতে কত বাগানে তো কুলিদের নামে জমি লিখিয়ে বাবুরাই বরগা দিয়ে চাষ আবাদ করায়।

অর্জুনের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। শিউরাম সর্দারটা চঞ্চলাকে পাতা তোলা থেকে সরিয়ে দিয়েছে টিলাবাবুকে বলে। চঞ্চলা এখন সীড বাড়তি কাজ করছে। সীড বাড়ির কাজে তো বাঁধা হফতার ওপরে কমি-শনের সুযোগ নেই। কি নিয়ে চঞ্চলা আর বিন্দিয়ার ঝগড়া হয়েছিল শ্রীমতীর সঙ্গে। সর্দার শিউরাম শ্রীমতীর পক্ষ নিয়ে ওদের দুজনকে পাতা তোলার কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। হাটের কাছাকাছি এসে পড়ায় তর্কাতর্কিটা থেমে গেল। বাগানের ভেতরেই হাট বসেছে। হাটে যারা জিনিসপত্র বেচতে আসে তাদের ইজারা বাবদ কমিশন দিতে হয় বাগানকে। এই নিয়ম চলে আসছে বাগান পত্তনের কিছুদিন পর থেকেই। জিনিসপত্রের দাম তাই অতিমাত্রায় চড়া। কেরোসিনের কুপীর আলোয় ভিতরে মানুষগুলোকে কেমন লালচে দেখাচ্ছে। ডাকা-ড কি দরাদরি চীৎকার হাঁকাহাঁকিতে হাট সরগরম।

বিন্দিয়া আর চঞ্চলা একসঙ্গেই হাটে এসেছে। মেজাজ দুজনেরই খারাপ। সর্দার শিউরামটা শ্রীমতীর পক্ষ হয়ে ওদের দুজনকেই পাতা তোলার কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এই নিয়ে শ্রীমতীকে নিয়ে এক পশলা মারপিট হয়ে গেছে। ওর ডাটের ঠমক তো ভেঙে গুঁড়ো হয়েছে। রাজু বিয়ে

করেছে মুরুলীকে। এবার ছেড়ে কথা কইবে কেন বিন্দিয়া। বীজ তোলার ঘরে পানিতে শুকনো চায়ের বীজ ভাসাচ্ছিল চঞ্চলা। পাশে বসে বীজ বাচছিল বিন্দিয়া, মুরুলী ওদের সঙ্গেই কাজ করছে। মুরুলীর পরনে নতুন রঙিন শাড়ি। গলায় রুপোর হাঁসুলী। বিন্দিয়া বীজ বাছতে বাছতে বলল—এই মুরুলী! রাজুটাকে চোখে চোখে রাখবি। রাক্ষুসী শ্রীমতীটা সুযোগ পেলেই আবার ওকে ধরবে।

নতুন বিয়ের রঙিন চটক মুরুলীর সারা শরীরে। জবাব না দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল সে। কথা বলল চঞ্চলা—আরে রাজুও কম চালাক ছেলে নয়। ঢেমনিটাকে ক'দিন নাচিয়ে নিল। অমন দশ পুরুষের ছোঁয়া লাগা মেয়েকে কে ঘরে তোলে রে?

মুরুলী পানির ওপর ভেসে রাখা বীজগুলো তুলে ফেলছিল। এগুলো নষ্ট বীজ। এতে চারা উঠবে না। ভারি বীজগুলো পানির তলায় ডুবে গেছে। ডুবে যাওয়া বীজ বীজ-ঘরে চারা তুলতে নেওয়া হবে।

মুরুলী মুখ তুলে হাসল—বিন্দিয়া দিদি! রাজু কি বলে জান?

-কি বলে রে?

—বলে, যেসব মেয়েমানুষ ওপরে ভেসে বেড়ায়, তাদের ভেতর নষ্ট। দেখতেই ভাল লাগে। ওসব হালকা পলকা মেয়েরা নষ্ট বীজের মত। ওদের ভেতর থেকে চারা ওঠে না। গাছ গজায় না।

চঞ্চলা মুখ ফিরিয়ে হাসল—বাঃ রে মুরুলী বেশ তো কথা ফুটেছে তোর। ভারি মজার কথা বলেছিস!

মুরুলী হাসতে লাগল গর্বিত নব বধূর মত। মুরুলীর বিয়েটা বেশ ধুমধাম করে হয়েছে। দুপক্ষের অভিভাবক ভাল খরচপত্র করেছে। মুরুলীর বাবা শুয়োর কেটে ভোজ খাইয়েছে সবাইকে। ছেলের মা-বাবাকে কাপড় দিয়েছে। বরযাত্রীও এসেছিল খুব জাঁকজমকে। কাগজ আর রাংতা দিয়ে ময়ূর পাখি হাঁস বানিয়ে বরযাত্রীর সামনে বয়ে নিয়ে এসেছিল পাড়ার ছেলেরা। অনেক বাজী পুড়েছে। নাচ গান হয়েছে। মুরুলীর বাবার বেশ কিছু দেনা হয়ে গেছে মহাজনের কাছে। তা হোক। ওই ঢেমনিটার তো রূপের গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। মুরুলীকেও মানুষ বলেই গ্রাহ্য করত না। এখন দেখুক রাজু কার কাছে ধরা দিল। মুরুলীর এত বড় বিজয়ে উৎসব হবে না তো কি!

বিন্দিয়া বলল—শ্রীমতী না কি তোর বিয়ের আগে খুব ঝগড়া করেছিল রাজুর সঙ্গে?

মুরুলী পানিতে হাত ডুবিয়ে ভেসে থাকা বীজ ছেঁকে তুলতে লাগল। চঞ্চলা মুখ তুলল—ঝগড়া করলে হবে কি! রাজু কি অত বোকা ছেলে

না কি! শ্রীমতী তো আর ওর জাতের মেয়ে নয়। অন্যজাতে বিয়ে করে পঞ্চায়েতে পড়ে বাগান ছাড়া হবে না কি!

বীজ তোলা ঘরটার পাশেই নার্সারী। চারা বসাবার দলে ছিল রুক্মিনি। বীজ নিতে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। রুক্মিনির পাশ দিয়ে ঝড়ের মত ঢুকছে শ্রীমতী। এ সময় এখানে শ্রীমতীর আসবার কথা নয়। ও পাতা তোলে বাগানে। সবাই বিস্মিত স্তব্ধতায় কাজ থেকে থেমে গেল। শ্রীমতী এসে দাঁড়াল মুরুলীর সামনে—এই ঢেমনি! স্বামী সোহাগে বাঁচিস না। আমাকে গালি দিচ্ছিস কেন রে হারামী?

মুরুলী কিছু বলবার আগেই বিন্দিয়া উঠে দাঁড়াল--তুই কেন কাজ ছেড়ে এখানে এসেছিস!

শ্রীমতী ঘুরে দাঁড়াল। কালো মুখটা রাগের আঁচে বেগুনী হয়ে উঠেছে। রাগী বেড়ালের মত জ্বলছে শ্রীমতীর চোখ--এসেছি আমার ইচ্ছে। তাতে তোদের কি! আমাকে কি তোর কম্লী পেয়েছিস না কি!

বিন্দিয়া কোমরে আঁচল জড়াল—দ্যাখ শ্রীমতী! রূপের দেমাগে তো মাটিতে পা দিস না! বিন্দিয়া কাউকে ছেড়ে কথা কয় না! কেন এসেছিস এখানে ঝগড়া করতে। যা তোর সোহাগের শিউরামের গলা ধরে বসে থাক। হারামী! রাজুটার বিয়ের পর যেন ক্ষ্যাপা জন্তু হয়ে গেছে। ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে এল শ্রীমতী। রুক্মিনি এসে মাঝখানে দাঁড়াল—টিলাবাবু তো ওকে বাগান থেকে নার্সারীতে দিয়ে দিয়েছে। সেই কাজেই এসেছে ও।

বিন্দিয়া বিষ ঝরা কন্ঠে বলল—টিলাবাবু দেবে কেন! ও নিজেই এসেছে। রাজুর বউকে চিবিয়ে খাবার জন্য ওর তো পরাণ ছটফট করছে।

মুরুলী এতক্ষণে কথা বলল—রাজু তো ওর নাম শুনলে থুক্ দেয়।

মুরুলীর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রীমতী—কে কাকে থুক্ দেয় দেখিস! তোর ওই হাড়গিলা শরীরটা নিয়ে ক'দিন রাজুকে ধরে রাখবি। এই শ্রীমতীর পায় এসে সে মাথা কুটবে।

ক্ষেপে উঠল মুরুলী--ঢেমনি হারামী। নষ্ট মেয়েমানুষ। মা শীতলার শাপের বেমার ধরুক তোকে।

শ্রীমতী অবরুদ্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুক্মিনির ওপর। চীৎকার কান্নাকাটি গালাগালিতে সীড বাড়িতে শোরগোল লেগে গেল। বিন্দিয়া আর চঞ্চলা মুরুলীকে ছাড়িয়ে নিল। রুক্মিনি শ্রীমতীকে ধরে রাখল। দুই যুদ্ধবাদী নারীই তখন এক পুরুষের অধিকারের দ্বন্দ্বে ক্ষিপ্ত বাঘিনী হয়ে উঠেছে। নার্সারী থেকে পুরুষ কুলিরা ছুটে এল। টিলাবাবু এসে পড়ল। মুরুলী তখন কাঁদতে শুরু করেছে, শ্রীমতীর চোখে কান্না নেই। দু'চোখে আগুন তার। বিন্দিয়া করকর করে উঠল--দেখ বাবু। ওই ঢেমনিটা

মুরুলীকে মেরেই ফেলেছিল। রাজু ওকে বিয়ে করে নি। সেই জ্বালায় ও জ্বলে মরছে।

বিন্দিয়ার হাতের টানে শ্রীমতীর কানের দুলে টান পড়ে রক্ত ঝরছিল কানের লতি দিয়ে। হাতের চেটোয় রক্ত মুছে বিন্দিয়ার দিকে লাল চোখে তাকাল শ্রীমতী—তুই কেন আমাকে মারবি। তোর স্বামীর ঘরে তো আমি উঠি নি।

—চুপ করে থাক বদমাগী। রাজুটার জন্য তুই পাগ্‌লা কুত্তি হয়ে গেছিস। যাকে পারছিস তেড়ে আসছিস!

টিলাবাবু ধমকে সবাইকে চুপ করালেন। শ্রীমতীকে আবার পাঠালেন বাগানের কাজে। মাঝখান থেকে গোলমাল করবার অপরাধে একদিনের তলব কাটা গেল বিন্দিয়া আর চঞ্চলার।

এখন হাটের পথে হাঁটতে হাঁটতে তিক্ত কণ্ঠে বিন্দিয়া বলল—তুই দেখিস চঞ্চলা ওই ঢেমনিটাকে আমি একদিন পেলে জনমের সাধ মিটিয়ে দেব।

চঞ্চলা হাঁটতে হাঁটতে বলল—ওতো আগে এমন ছিল না। এখন যেন কেমন হয়ে গেছে। কেবল সবার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপ রে! আমরা না থাকলে বোধহয় মুরুলীটাকে মেরেই ফেলত। চল মাছের বাজারটা ঘুরে আসি।

বিন্দিয়া ঝামটা দিল—টিলাবাবুটা তলব কেটে দিল। মাছ আর কিনতে হবে না।

চঞ্চলা মাছের বাজারেই ঢুকল। বিল্লু বুধুয়া মাছ খেতে বড় পছন্দ করে। হরিয়া মাঝে মাঝে নালা থেকে দু চারটে মাছ ধরে আনে। সেও তো ছ'মাসে ন'মাসে একবার। বিন্দিয়া গেল চালের দোকানের দিকে। এক ভাগ পুঁটি মাছ অনেকক্ষণ ধরে দর করল চঞ্চলা। মাছওয়ালাও বুঝে ফেলেছে, মাছগুলো চঞ্চলার পছন্দ হয়েছে। এক পয়সাও দাম কমাচ্ছিল না সে। হাতে একটা সর্ষের তেলের বোতল ঝুলিয়ে আঁচলে কিছু আনাজ বেঁধে বিনি এসে দাঁড়ল—কি মাছ কিনলে চঞ্চলা দিদি?

চঞ্চলা মুখ তুলল—দেখ না। এই ক'টা মাছ বলছে সাত টাকা। ডাকাত একেবারে।

মাছওয়ালা খেঁকিয়ে উঠল—আরে নিবি তো নিয়ে যা। না হয় ভিড় করিস না।

চঞ্চলা আঁচলের টাকা গুনতে গুনতে বলল—পাঁচ টাকা দিয়ে দে। নিয়ে যাই।

বিনি বলল—আজ না কি ঢেমনি শ্রীমতীটা সীড-বাড়িতে তুলকালাম বাধিয়েছে! শিউরামের সঙ্গে ঝগড়া করে ও সীড বাড়িতে কাজ নিল।

আসলে গেছে ও মুরুলীর সঙ্গে ফসাদ করতে। রাজু তো হাতছাড়া হয়েই গেছে। এখন আর এসব করে কি লাভ।

চঞ্চলা কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল সবজী বাজারের দিকে একটা হট্টগোলে থেমে গেল। ছ'টাকায় মাছের ভাগা নিয়ে সবজী বাজারে এল চঞ্চলা। রজর মাকে নিয়ে সব্‌জী বাজারের হট্টগোল। এক সব্‌জীওয়ালার ঝুড়ি থেকে এক ফালি কুমড়ো হাত সাফাই করে কোঁচড়ে ভরে ফেলেছে রজর মা। ধরাও পড়েছে। প্রথমে রজর মা খুব গলাবাজী করছিল। পরে বিলাপ করে কাঁদতে বসল। সরদার শিউরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব্‌জী কিনছিল। জটলা দেখে এসে ধমকে উঠল রজর মাকে—হেই রজ কি মাই! তুই আমাদের কুলিদের জাত মারবি না কি রে? কুলিরা না খেয়ে ভুখে মরবে তবু চুরি করবে না। তুই কুলি সমাজের জাত মারবি না কি রে, বুড়িয়া রেন্ডী!

রজর মা কান্না থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আরে যা গিজড়া। ভুখে যখন চোখে ঘুম আসে না তখন কোন্ সমাজটা আমাকে দেখতে আসে রে? কোন্ জাতটা থাকে?

খারাপ মেজাজ শিউরাম ক্ষেপে উঠল- এই বুড়িয়া! বেশি গলাবাজী করবি না। হাটে এসে চুরি করেছিস! আবার গলাবাজী! বলে দেব টিলা-বাবুকে। দেবে তলব কেটে তখন বুঝবি।

রজর মা এবার সত্যি ভয় পেল। টিলাবাবুর অসাধ্য তো কিছু নেই। আবার সুর করে বিলাপ করতে লাগল সে। অভিশাপ দিতে লাগল নিজের একমাত্র রোজগারী ছেলে রজ আর তার ডাইনী বউটাকে। ইনিয়ে বিনিয়ে প্রচার করতে লাগল রজর বউর কীর্তিকলাপ। বিয়ের আগে কত ভাল ছেলে ছিল তার রজ। নেশা ভাং বড় একটা বেশি করত না। তলবের টাকা হফতার রেশন এনে তুলে দিত মায়ের হাতে। বিয়ে করে সেই ছেলে তার পর হয়ে গেল। মুখরা হিংসুটে রজর বউ কি যে তুক করল তাকে। মা-বাবার রজব নজরে বিষ হয়ে গেল। সকাল বিকেল দু'বেলা রজর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত রজর বউ। শেষ পর্যন্ত কুবুদ্ধি দিয়ে রজরকে মা-বাবা ছাড়া করল। বউ নিয়ে অন্য বাগানে চলে গেল রজ। হাটের মধ্যে কেঁদে কেঁদে নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাতে লাগল রজর মা—বল তোমরা। আমি বুড়ো মানুষ ক'টা পয়সা তলব পাই। কি খেয়ে বাঁচি। কি খাওয়াই বুড্‌ঢাকে।

হাটে সবারই ব্যস্ততা। রজর মায়ের বিলাপ শুনবার সময় কারো নেই। অল্প পয়সার তেল নুন কিনেছে প্রায় সবাই। শুধু একটু বেশি আয়ের কুলিরা ভিড় জমিয়েছে আনাজপাতি আর মাছের বাজারে। বাজারে বড় মাছ খুব একটা ওঠে না। বড় মাছের খরিদ্দার কম। বড়জোর একটা মহাশোল কেউ কিনে নেয়। বাজার থেকে দু'কাঠি চাল আর একটা লাউ কিনল অর্জুন। ফিরবার

পথে মহাজন শেঠের দোকান। মাড়োয়ারী শেঠরা আগে বাগানের মহাজনী ব্যবসা করত। এখনকার মহাজনকেও সবাই শেঠই বলে। মহাজন ফয়েজ আলী আজকে একেবারে হ্যাজাক জ্বালিয়ে বসে আছে। আজ ওর গরম কারবারের দিন। এ পথ দিয়েই কুলিরা তলব নিয়ে লাইনে ফিরবে। ফয়েজ আলী শ্যেনদৃষ্টি পেতে বসে থাকে। তার নজর এড়িয়ে কেউ রাস্তাটা পার হয়ে যেতে পারে না। আগরবাতির সুগন্ধি ছড়িয়ে ফয়েজ আলী গদীতে বসেছিল। দোকানের সামনে কিছু কুলি জটলা পাকিয়ে আছে। কাকে যেন শাসাচ্ছে ফয়েজ আলী—দেখ শালা! তুই যদি হফ্তার তলব থেকে আমার পাওনা শোধ না করবি তো আমি ঠিক নালিশ ঠুকে দেব বড়বাবুর কাছে।

যাকে শাসান হচ্ছে সে মাদ্রাজী লাইনের ভূমিজ সম্প্রদায়ের সুখন। শুকনো মুখে সুখন বলল—কি করব শেঠ। পুরা তলব তোমাকে দিয়ে দিলে সারা হাফ্তা বালবাচ্চা খাবে কি?

ফয়েজ আলী ভেংচে উঠল—বালবাচ্চা খাবে কি! তোর বালবাচ্চা কি খাবে তার আমি জানি কি রে ব্যাটা। কর্জ নেবার সময় মনে থাকে না? এক পয়সা কামাই তিন পয়সার তো কর্জ নিয়ে বসে থাকিস।

সুখন দুর্বল ভংগীতে মাথা তুলল—কর্জ তো নিচ্ছি সব সময়। কিন্তু শোধও তো করে যাচ্ছি শেঠজী। এক হফ্তার কিছু দিতে না পারলেই তুমি ক্ষেপে আগুন হয়ে যাও।

অর্জুনকে দেখে চোখ তুলল শেঠ—এই যে অর্জুন। এ হফ্তার তলব থেকে কত দিবি?

অর্জুন গাঁট থেকে দশটা টাকা বের করে ফয়েজ আলীর সামনে রাখল—এই নও শেঠজী। এর বেশি পারব না।

ফয়েজ আলী চোখ কপালে তুলল—আরে! রং তামাশা করছিস না কি? তোর এ হফ্তায় দেবার কথা তিরিশ টাকা।

অর্জুন বিব্রত মুখ করল—কি কবর শেঠজী। দুটো গরু আছে। একটা গাই আছে। ওদের খৈল ভূষি কিনে দিতে হবে।

ফয়েজ আলী চোখ কুঁচকে অর্জুনকে দেখল। তারপর খসখসে কণ্ঠে বলল—উঃ ফুটানি কত। কুলির গরু আবার খৈল ভূষি খাবে কি রে! ফ্যাল য্যাল। টাকা ফ্যাল। তোর রেণ্ডীটা তো ভালই কামাই করে। মনে করিস খবর রাখি না। এই বাগানে কে রোজ কত সের পাত্তি উঠায় সব খবর রাখি আমি।

অর্জুন অসন্তুষ্ট জবাব দিল—ও তো এখন সীড বাড়িতে কাজ করছে। বাঁধা হফ্তা পায়।

ফয়েজ আলী হাত নেড়ে অর্জুনের কথা উড়িয়ে দিল—আরে প্যান প্যান

করিস না। টাকা ফেলে দিয়ে চলে যা।

অর্জুন আরো পাঁচটা টাকা রাখল ফয়েজ আলীর সামনে—আর দিতে পারব না শেঠ!

দোকানের সামনে কিছু মেয়ে খরিদ্দার এসে দাঁড়াল। কাঁচের চুড়ি গিল্টির গয়না কাঁটা ক্লীপের শোকেসের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ফয়েজ আলী গলা তুলে ধমক দিল—এই রেন্ডীরা। অমন ঝুঁকে পড়ে আমার আল-মারীর কাঁচ ভেঙে ফেলবি দেখছি। সরে দাঁড়া সব।

মেয়েগুলো উঠতি বয়সের। যৌবনের আলগা চটক শরীরে। রঙিন শাড়ি ঘুরিয়ে পরে এসেছে। মেয়েগুলোকে ভাল করে দেখল ফয়েজ আলী। কালিন্দীপাড়ার মেয়ে। বাবুয়ানীতে সাঁওতাল আর কালিন্দী মেয়েদের নাম ডাক আছে। ওরা ভাত না খেয়ে শাড়ি চুড়ি কাঁটা ক্লীপ কেনে। ফয়েজ আলী স্বর নরম করে প্রশ্ন করল—কি চাস বল!

কয়েকটি মেয়ে লোলুপ চোখে তাকাচ্ছে আলতা পাউডার আর নক্সা-দার রঙিন শাড়ির দিকে। ফয়েজ আলী ওদের চোখের আগ্রহ পড়ে ফেলল। ভাল মানুষের মত সমাদরে বলল—কি নিবি? শাড়ি? নিয়ে যা। হফ্তায় হফ্তায় দাম শোধ করিস।

একটা মেয়ে রোলেক্স পাড়ের লাল শাড়িটা দেখাল — ওটা কত দাম রে শেঠ?

ফয়েজ আলী কর্মচারীকে ডেকে শাড়ি দেখাতে হুকুম করল। কণ্ঠে আন্তরিকতা ফুটিয়ে বলল—আগে পছন্দ কর। পরে দাম।

অর্জুন মনে মনে হাসল। শালা শেঠ। এমন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন বিনা পয়সাতেই শাড়ি দিয়ে দেবে। তারপর শাড়ি পছন্দ করলেই খাতায় টিপসই নিয়ে ইচ্ছেমত দাম লিখে রাখবে। আর হফ্তায় হফ্তায় পয়সা কাটবে। এ নিয়ে তখন কোন কথা তুলতে গেলেই ফয়েজ আলী অন্য মূর্তি ধরবে। বলবে—আমি দাম বেশি রেখেছি? তা কেন রাখব না রে? বাকিতে মাল দিলে তো আমার লোকসান। নগদ পয়সা হাতে আসে না। দু'চার টাকা বেশি না পেলে আমি বাকিতে মাল দেব কেন রে?

কর্মচারী শাড়ির বান্ডিল খুলে মেয়েদের শাড়ি দেখাচ্ছে। ফয়েজ আলী অর্জুনের দিকে চোখ তুলল—কি রে তুই আর কি চাস?

অর্জুন শাড়িগুলোর মধ্যে একটা টিয়া সবুজ শাড়িতে তাকিয়ে চঞ্চলার কথা ভাবছিল। চঞ্চলার মাত্র একটা পুরোন শাড়ি। ওই টিয়া রঙের শাড়িটায় চঞ্চলাকে খুব মানাত। তার হাতে তো টাকা নেই। চঞ্চলার তলবের টাকা তো ক'জনের পেট ভরাতেই চলে যায়। অর্জুনের কর্জ কিছু কমে না এলে মহাজন অত দামের কাপড় বাকিতে দেবে না। অর্জুন বলল

—শেঠজী। আমার দেনা শোধ হবে কবে?

ফয়েজ আলী মুখ ফিরিয়ে নির্বিকার উত্তর দিল—যখন শোধ করবি। তখন হবে।

অর্জুনের চোখে হতাশ অন্ধকার—ফি হফ্তায় তো টাকা দিয়েই যাচ্ছি। আর তোমার পাওনাও যেন দিন দিন ডুবিস গাছের মত বেড়ে উঠছে। ব্যাপারটা কি বুঝতে পাবি না।

ফয়েজ আলী ক্ষেপে উঠল—দেখ অর্জুন। তুই বড় ট্যারা কথা বলিস। তোর বাবা যে এত ধার করে রেখে গেছে। তার আমি কি করব।

অর্জুন বিষণ্ণ মানুষের মত বলল—বাবার ধার। আমার ধার। এ বোঝা টেনে টেনেই আমরা শেষ হলাম। আমার ছেলেরাও হবে। হাড় জল করে কামাই করেও হাতে পয়সা জমে না।

লাল শাড়িটা মেয়েটির পছন্দ হল। ফয়েজ আলী হাসি মুখে বলল - নিয়ে যা খুব ভাল কাপড়। পরবে পরতে পারবি।

মেয়েটি প্রশ্ন করল—দাম কত রে শেঠ?

-সত্তর টাকা।

স-ত্ত-র টাকা। শাড়িটা ঠেলে সরিয়ে দিল মেয়েটা—দরকার নেই আমার এত দামি কাপড়ে।

ফয়েজ আলী দেখল শাড়িটা সরিয়ে দিলেও মনটা ওর শাড়ি থেকে সরে নি। উদার কণ্ঠে বলল— আচ্ছা যা। নিয়ে যা। দশটা টাকা কম দিস।

শাড়িটা ভাঁজ করতে করতে প্রশ্ন করল—আগাম কত দিবি?

মেয়েটা আঁচল থেকে পনের টাকা রাখল ফয়েজ আলীর সামনে। ফয়েজ আলী ক্যাশবাক্সে টাকা ভরে হুঁশিয়ার করল—হফ্তায় তলব পেলে ঠিকমত দাম শোধ করিস।

খাতায় টিপ দিয়ে শাড়ি হাতে খুশি মুখে হাসল মেয়েটা। আর একটা মেয়ে এক শিশি আলতা আর চুলের কাঁটা কিনল। ওদের ভিড় পাতলা হতে ফয়েজ আলী আবার সুখনকে নজরের সীমানায় আনল—এই ব্যাটা ওরকম ঘুঘুর মত বসে আছিস কেন! আর একটা পয়সাও তোকে আমি বাকি দেব না। এই ক'মাসে পাঁচশ' টাকা বাকি খেয়েছিস।

সুখনের মুখটা খুব দুঃখী আর বিষণ্ণ। খাকি ঢলঢলে হাফ প্যাণ্ট আর ফতুয়া পরে কুঁজো হয়ে বসে আছে। কাঁধের গামছায় মুখ মুছে বলল—সামনের তলব পেলে তোমার টাকা দেব শেঠজী।

ফয়েজ আলী হুমকী দিল—সামনের তলবে কি ন'শ' নব্বুই টাকা পাবি না কি যে দিবি। ব্যাটা আমার সঙ্গে চালাকি। সুড়ুৎ করে বেজীর মত দোকানের সামনে দিয়ে সরে পড়ছিল। দে শালা আজকের তলব বের করে

দিয়ে যা।

সুখন খোঁচা খোঁচা পাকা গোঁফ দাড়িভরা চুপসান মুখ তুলল—এ হফ্‌-তায় মাফ করে দাও শেঠ।

ফয়েজ আলী আবার হুঙ্কার ছাড়ল—কেন মাফ করব। পাট্টায় গিয়ে মদ গিলে পয়সা ফেলতে পারিস। আর আমার পাওনা শোধ করতে পারিস না!

সুখন এবার তোয়াজ শুরু করল—শেঠজী! তুমি আছ বলেই তো বাগানের কুলিরা খেয়ে পরে বেঁচে আছে। তুমি বাকিতে জিনিস না দিলে আমরা কি খেতাম! কি পরতাম!

ফয়েজ আলী একটু খুশি হল। আড়চোখে অর্জুনকে দেখে বলল—সেটা কি তোরা বুঝিস? অনেক কুলি বলাবলি করে আমি না কি তোদের শুষে খাচ্ছি। দশ টাকার জিনিস বিশ টাকায় লিখিয়ে রাখি।

এবার অর্জুনের দিকে সরাসরি তাকাল ফয়েজ আলী—কই রে দিলি না আর টাকা।

অর্জুন হাত উল্টাল—আর নেই শেঠজী। না থাকলে তোমাকে কোথা থেকে দেব!

অর্জুন হাঁটতে শুরু করল। পেছন থেকে দাঁত খিঁচাল ফয়েজ আলী উঃ শালার ভাবভঙ্গী এমন যেন বাগানের বড় সাহেব।

অর্জুন শুনল। সত্যি তার গাঁটের থলে প্রায় খালি। তিরিশ টাকা সত্তর পয়সা হফ্‌তা পেয়েছে। সবই তো শেষ হয়ে গেল। সারাটা সপ্তাহ এখন চঞ্চলার তলবের পয়সাই ভরসা। গত মৌসুমে যা ধান পেয়েছিল তা দিয়ে গাই গরুটার দাম দিতে হল বিষ্ণুকে। সেই কবে যখন ওটা প্রায় বাছুর ছিল দু'শ' টাকায় বিষ্ণুর কাছ থেকে কিনেছিল। চঞ্চলাই বলেছিল একটা গাই কিনলে তাদের অবস্থা ফিরবে। গাইয়ের দুধ বাচ্চারা খেতে পারবে। বিক্রি করা যাবে। গাই বিয়োলে গরুর সংখ্যাও বাড়বে। অর্জুনের বাবার আমলের বলদ জোড়া তো বুড়ো হয়ে গেছে। কি যেন কবে গাই বিয়োবে। অর্জুনের গরুর সংখ্যা বাড়বে। অবস্থা ফিরবে।

বিকেল থেকেই রাগে অপমানে জ্বলছিল শ্রীমতীর মন। তলবের টাকা হাতে নিয়ে তলব ঘর থেকে ফিরবার সময় শ্রীমতীর মনে হচ্ছিল সবাই যেন শ্রীমতীর দিকে বিদ্রূপ আর উপহাসের হাসি ছুঁড়ে দিচ্ছে। সেই হাসি যেন বলছে 'সুন্দরী শ্রীমতী তুই তো মুরলীর কাছে হেরে গেছিস। কিসের আর ঠমক তোর।' ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হল না শ্রীমতীর। একার

সংসার তার। মা বাবার সংগে সে থাকে না। সুরেশের ঘরে কিছুদিন থাকবার পর যখন সুরেশকে নাকচ করে ফিরে এল শ্রীমতী তখন মা রেগে কেঁদে একাকার করেছিল। শ্রীমতীকে গালি দিয়ে ভূতছাড়া করেছিল। শ্রীমতীও ছাড়ে নি। সমানে ঝগড়া করেছে মায়ের সংগে। তাদের গোত্রের নিয়মটা তো সে অগ্রাহ্য করেনি। সুরেশের সংগে বিয়ের আগে রাত কাটিয়েছে নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু সুরেশকে তার পছন্দ হয় নি বলেই তো ফিরে এসেছে। ও রকম ঠান্ডা সাপের মত পুরুষকে শ্রীমতীর মত উগ্র যৌবনা মেয়ে কেন মেনে নেবে। একটা মেয়েব শরীর দেখে যে পুরু-ষের হাত পা কাঁপে শরীর ঘামে সে আবার পুরুষ না কি! অমন মেনিমুখো পুরুষের ঘর করবে শ্রীমতী! যার শরীরের ভেতর সব সময় ভাটিঘরের চুলোর মত প্রচন্ড আগুন জ্বলছে। মাকে বলেছে শ্রীমতীর কথা বিশ্বাস না হলে মা গিয়ে শুয়ে দেখুক! তারপর ওকে বলুক শাড়ি জড়িয়ে মেয়ে-দের মত পাতা তুলতে। কারখানায় ভাটিতে কাজ করলে কি হবে। ওর শরীরে একটুও আগুন নেই। মা বাবার সংগে তারপর ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেছে শ্রীমতী। সে তো আর মা বাবার কামাই খায় না। পরোয়া করবে কেন তাদের গঞ্জনার। সুরেশকে বাতিল করেছিল বলেই যেন শ্রীমতীর কদর আরো বেড়ে গিয়েছিল। তাকে ঘিরে সর্বক্ষণ মুগ্ধ পুরুষের গুঞ্জন। শ্রীমতীও ডাটে চলেছে। একমাত্র রাজু ছাড়া কাউকেই সে খুব একটা কাছে আসতে দেয়নি। এখন শ্রীমতীর বুকটার মধ্যে কেমন এক শূন্যতা খাঁ খাঁ করল। বেঈমান রাজু। এমন করে ধোকা দিল শ্রীমতীকে। ছাতিতে সাহস নেই তো শ্রীমতীর নেশার মদে মাতাল হয়েছিলি কেন! মুরুলীকে বিয়ে করেছে রাজু মা বাবার ইচ্ছায়। বিয়ের আগেই শ্রীমতী সম্পর্কে কেমন শীতল হয়ে যাচ্ছিল রাজু। সীড বাড়ির চা ঝোপের নিচে শ্রীমতী অভিসারে গিয়ে হতাশ হত। রাজু অনুপস্থিত। অন্য সেকশনে যায় রাজু পাতার গাড়ি নিয়ে। শ্রীমতী একদিন ছুটির পর রাজুর খোঁজে কারখানায় উপস্থিত হল। গাড়িঘরে খালি গাড়িতে রাজু শুয়েছিল। শ্রীমতী তাকে ঠেলে তুলে তার মাতাল করা হাসি হাসল—এই রাজু কি হয়েছে রে তোর!

রাজু চোখ খুলে কেমন অপ্রস্তুত হল। তারপর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল - কি রে শ্রীমতী কি চাস?

অভিমান ছাপিয়ে রাগে জ্বলে উঠল শ্রীমতী। রাজুর কাছে কি চায় শ্রীমতী তা কি ও জানে না! মেজাজ সামলে শ্রীমতী বলল—তুই আমার সংগে দেখা করিস না কেন! মুরুলীটার দিকে মন গেছে বুঝি!

রাজু উঠে বসল। সাদা চোখে তাকাল শ্রীমতীর দিকে—হ্যাঁ। মুরুলীকে

আমি বিয়ে করব। মা'র খুব পছন্দ।

কণ্ঠে এবার বিষ ঝরল শ্রীমতীর—আর তোর? তোর কাকে পছন্দ?

শ্রীমতীর দৃষ্টি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল রাজু—তুই তো অন্য জাতের। মুরলী আমার জাতের মেয়ে।

শ্রীমতী আর দাঁড়ায় নি। সারা পুরুষ জাতের ওপর ঘৃণা হয়েছিল তার। কিন্তু এইটুকু অপমান করেই কি রাজু ক্ষান্ত দিয়েছিল। ক'দিন ঢ্যাঙ্গা দাঁত উঁচু মুরলীটাকে নিয়ে কি মাতামাতি। শেষে ধুমধামের বিয়ে। ক'দিন কমলীর পাট্টায় পড়ে চুয়ানীর নেশায় ডুবে ছিল শ্রীমতী।

কমলী হাসত। বলত তুই একটা পাগলি। একটা পুরুষ যাবে আর একটা আসবে। তোর মত রেন্ডীর কি মরদের অভাব!

নিজেকে সামলেই নিয়েছিল সে। মন দিয়ে কাজ করছিল বাগানে। কিন্তু হিংসুটে রেন্ডীগুলো রাতদিন লাগতে আসে শ্রীমতীর পিছে। খুঁচিয়ে তোলে তার অপমানের ঘা-টাকে। এই তো ক'দিন আগে এই নিয়ে বিন্দিয়া আর চণ্ডলার সঙ্গে তার এক রকম চুলোচুলি হয়ে গেছে। শয়তান শিউরামটা কাল তার গায় হাত দিয়েছিল। গালি দিয়ে তার চৌদ্দপুরুষের বাপান্ত করেছে বিন্দিয়া। সর্দার বলে মানে নি। সেই রাগে শিউরাম তাকে পাতা তোলা থেকে সরিয়ে দিল। আজ মুরলীর সুখী পরিতৃপ্ত মুখ দেখে যেন শ্রীমতীর মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল শ্রীমতীর এই অবমাননার জন্য ওই মেয়েটাই দায়ী। কমলীর পাট্টার দিকে পা বাড়িয়ে শ্রীমতী থামল। না সে পাট্টায় যাবে না। নেশা করবে না। ওই মুরলীর মত সেজেগুজে ঘুরবে। সবাইকে বুঝিয়ে দেবে রাজুর জন্য তার একটুও দুঃখ নেই। কেন থাকবে! ওরকম চোরা বিল্লী মার্কা পুরুষকে ঘৃণা করে শ্রীমতী। রাজুটা একটা খাটাশ। একটা ডরাকু। পঞ্চায়েতের ভয়ে একটা পোড়া কাঠকে ঘরে তুলেছে। হঠাৎ প্রবল ঘৃণায় শ্রীমতীর গা ঘুলিয়ে উঠল। সামনেই মহাজনের দোকান। কিছু না ভেবেই একটা শাড়ি আর এক শিশি আলতা কিনে ফেলল শ্রীমতী। শ্রীমতী একটা কমজোর পুরুষের ঘর লাথি মেরে ফেলে এসেছে। আর একটা কমজোর মনের পুরুষের জন্যই বা শ্রীমতী জ্বলে মরবে কেন! মহাজন শ্রীমতীর টাকা গুণে নিয়ে রসিক হাসি ফুটিয়ে তুলল গোঁফের আড়ালে—কি রে শুনলাম আজ রাজুর বউর সঙ্গে তোর না কি চুলোচুলি হয়েছে?

শ্রীমতী কঠিন মুখে তাকাল—রাজুর নাম করবি না শেঠ। ওটা মরদ নয় একটা খাটাশ। একটা চুহা।

ঝোঁকের মাথায় হন হন করে হেঁটে শ্রীমতী অনেক দূরে চলে এল। খাটাশ না তো কি। পঞ্চায়েতের ভয়ে ডরাকু যদি হবি তবে শ্রীমতীর সঙ্গে

খাতির লাগতে এসছিলি কেন রে ড্যাকরা! গাছের পাতায় পাতায় পাখিরা কিচির মিচির করছে। শ্রীমতী মাদ্রাজী লাইনের পথ ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। শরীরে থাক থাক চা গাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টিলাগুলো পিছে পড়ে রয়েছে। দু'দিকের টিলায় বেত ঝোপ আর শণ ঘাসের নিবিড় জঙ্গল। শ্রীমতী থামল। তাকিয়ে দেখল পশ্চিম দিকের আকাশে ফাগুয়ার রঙের মত একটুকরো মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবছে। আলতার শিশি আর শাড়িটা ঘাসের ওপর রেখে বসে পড়ল। বাতাস নেই। থমথমে স্তব্ধতায় স্থির হয়ে আছে গাছপালা। বিশ্রী ভ্যাপসা গরম লাগছে। এখানে মাঝে মাঝে কাঠ কাটতে আসে শ্রীমতী। একটু সামনেই একটা ঝরণা আছে। ঝরণার শব্দটা শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। জায়গাটা বড় বেশি নির্জন। নির্জনতা ভাল লাগল শ্রীমতীর। বালি ঘুঘুঘুর আর উরচুংগা পোকা শব্দ করে ডাকছে। শ্রীমতী বসে রইল। যেন তার ঘর নেই। ঘরে ফিরবার টান নেই। ফাগুয়ার রঙের মেঘটা ক্রমে নীলচে কালির মত আকাশে গড়িয়ে পড়ছে। শ্রীমতী ধীরে ধীরে উঠল। ঝরণার জলে স্নান করে নিয়ে নতুন শাড়ি পরে কম্‌লীর পাট্টায় যাবে। শাড়ি আলতা নিয়ে ঝরণার পাশে ছোট পাথরটার ওপর রাখল। ঝরণার পানি পড়ে পড়ে নীচে ছোট একটা গর্তের মত হয়েছে। পা দুটো সেই পানিতে ডুবিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। দূর থেকে গরু ছাগলের ডাক ভেসে আসছে। বোধহয় রাখালরা গরু তাড়িয়ে জংগল থেকে নেমে লাইনের দিকে চলেছে। শ্রীমতী গায়ের কাঁচুলী খুলল। নিজের উদ্ধত সুন্দর শরীরে দৃষ্টি রাখল এক পলক। নিজের গর্বিত যৌবন মনের মধ্যে একটা দাবীর বাহু বিস্তার করছে যেন। শ্রীমতী উঠে দাঁড়িয়ে শাড়িটা খুলে রেখে ঝরণার নিচে দাঁড়াল। মনের মধ্যে যৌবনের দাবী যতই অবাধ্য মাথা চাড়া দিক শ্রীমতী কোন পুরুষের কাছে প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়াবে না। পুরুষরা বেঈমান। খাটাশের জাত। নিরাবরণ কালো দেহটা জলের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হল। অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করে শরীর মন স্নিগ্ধ হয়ে উঠল শ্রীমতীর। হঠাৎ সামনে শণ বনটা আন্দোলিত হল। সর সর খস খস শব্দ উঠল শণ ঘাসের ঝোপে। শ্রীমতী সচকিত হয়ে শুকনো শাড়িটা তুলে নিল। চারদিকে নীলচে অন্ধকার। সন্ধ্যা নেমেছে। দ্রুত হাতে ভেজা শরীরে শাড়ি জড়াতে জড়াতে কাঁপা গলায় শ্রীমতী বলল—কে? কে রে ঝোপের মধ্যে?

ঝিঁঝির একটানা ডাক আর ঝরণার শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। শাড়ির আঁচলে শরীর মুছতে মুছতে শ্রীমতী হেসে ফেলল। হয়তো একটা শজারু ছুটে গেল শণ বনের মধ্যে। নিশ্চিন্তে শরীর মুছতে লাগল শ্রীমতী। কাঁচুলীটা পরে আকাশে তাকাল। নীল মেঘ ফুলে উঠে ছড়িয়ে পড়েছে

সারা আকাশে। শাল আর জারুল গাছের ডালপালা ভীষণ রকম স্তব্ধ। পাখিগুলোও আর ডাকছে না। নতুন শাড়ি বুকের কাছে ধরে ভাঁজ খুলল শ্রীমতী। নতুন কাপড়ের গন্ধ ভাল লাগে শ্রীমতীর। শাড়িটা একটুক্ষণ মুখে চেপে ঘ্রাণ নিল সে। শণ বনে এবার খুব জোরে আলোড়ন উঠল। কি যেন একটা ঘাসের ভেতর থেকে এদিকে ছুটে আসছে। শ্রীমতী ভীষণ ভয় পেল। রবিবার ছাড়া এদিকে কোন মানুষজন বড় একটা আসে না। এখান থেকেই বনের সীমানা শুরু। এই সন্ধ্যায় কে আসবে এখানে! তবে কি বাঘ ভালুক কিছু! সেবার জংগলে চরতে থাকা গরুর পাল থেকে ক'টা গরু মারল বাঘ। দোলই বাগানের সাহেব এসে বাঘটাকে গুলী করে মারল। পুরোন শাড়িটা মাটিতে লুটিয়ে চোখ বন্ধ করে ছুটতে লাগল শ্রীমতী। হেই ভগওয়ান। হেই মা বিষহরী বাঁচাও আমাকে। শ্রীমতীর কাঁপা ঠোঁট মৃগী রোগীর মত বিড় বিড় করল। মেঘ ডাকল গম্ভীর গুমগুম শব্দে। শ্রীমতীর কপাল বুক ঘেমে উঠল। পেছনের শব্দটা এখন আরো স্পষ্ট। ধপ ধপ শব্দে কে যেন ছুটে আসছে। ভুতপ্রেত কি না কে জানে। আতঙ্ক-গ্রস্ত শ্রীমতী অন্ধের মত ছুটতে লাগল। পেছন থেকে কে হঠাৎ বন কাঁপিয়ে হেসে উঠল। ডাকল হেই শ্রীমতী।

শ্রীমতী অসাড়। তার হাত থেকে নতুন কাপড় মাটিতে পড়ে গেল। পায়ের শব্দটা শ্রীমতীর পাশে এসে থামল হেই! আন্ধার মত কোন্ দিকে ছুটছিস!

শ্রীমতী চোখ খুলল। তার পাশে দাঁড়িয়ে কারখানার ছত্রি হরিশ। দীর্ঘ দেহী শক্ত মজবুত যুবক হরিশ হাসছে। হরিশকে শ্রীমতী চেনে। বদমেজাজী বলে ওর সংগে কেউ একটা মেশে না। কোন মেয়ের দিকে নজর নেই। কারখানায় ওর কাজের সুনাম আছে। ভাটিঘরের চুলায় কাজ করে সারাদিন। কারখানা বন্ধ হলে সোজা চলে যায় পাট্টায়। আধ রাত পর্যন্ত মদ খায়। ওখানেই পড়ে ঘুমোয়। সকালে আবার কারখানায় ঢোকে। সবাই বলে হরিশ কারখানা আর পাট্টা ছাড়া কিছু চেনে না। শ্রীমতী এতক্ষণে আশ্বস্ত হল। বুকের কাঁপন থামল তার। জড়িত কণ্ঠে বলল - হরিশ তুই! উঃ এমন ভয় পেয়েছিলাম।

আকাশ ধাঁধিয়ে বিদ্যুৎ চমকাল। শ্রীমতী নতুন শাড়িটা হাতে তুলে নিয়ে আবার বলল এই সন্ধ্যাবেলা জংগলের মধ্যে কি করছিলি রে তুই?

হরিশ জবাব দিল না। শ্রীমতী দেখল তার খোলা বুকের দিকে কেমন নেশাচ্ছন্ন একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হরিশ ছত্রি। শ্রীমতী চমকে উঠল। তবে কি ও এতক্ষণ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে শ্রীমতীর নগ্ন স্নান দেখছিল! ভীষণ একটা বন্য রাগ চাড়া দিয়ে উঠল মাথার মধ্যে। পুরুষগুলো

তো জাতের ফুটানি নিয়ে অস্থির! তবে লুকিয়ে নীচু জাতের মেয়ের শরীর দেখবার এত লোভ কেন! শ্রীমতীর কণ্ঠে শাণিত ছুরির ধার ঝলক দিল—এই হারামী পিছু নিয়েছিস কেন আমার। পঞ্চায়েতে নালিশ দিয়ে তোকে আমি বাগান ছাড়া করব। পথ ছাড়। ঘরে যেতে দে আমাকে।

পঁচিশ বছরের হরিশের শরীর আগুনের মত জ্বলছে। বুকে যেন একটা আগুনের ঝড়। শ্রীমতীর পিছু সে নেয় নি। ভাটিঘরের ড্রায়ারে এ সপ্তাহে ফারনেস অয়েল জ্বালান হয়েছে। সামনের সপ্তাহ থেকে ফায়ার উড জ্বালাতে হবে। টিলাবাবু তাকে পাঠিয়েছিল গাছ বাছাই করতে। কাল থেকে কাঠ কাটা হবে। জঙ্গলের মধ্যে কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত সুন্দর লোভনীয় শরীর দেখে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। হরিশ বুঝি তার জীবনে এই প্রথম নারী দেহের আকর্ষণের তীব্রতা বুঝল। মেয়েদের নিয়ে সে কখনও মাথা ঘামায় নি। কিন্তু এই নির্জন আধ অন্ধকার সবুজ বনের মধ্যে শ্রীমতীর নিরাবরণ দেহটা তার মাথার কোষে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

শ্রীমতী সামনে পা বাড়াল—সর। ঝড় বৃষ্টি আসছে।

হরিশের চোখের দৃষ্টিকে উপেক্ষা করল শ্রীমতী। কি এক অন্ধ কামনার তাড়নায় শ্রীমতীর হাত টেনে ধরল হরিশ। এক হাতে শ্রীমতী কোমরে জড়ান শাড়ি টেনে ফেলে দিয়ে আরেক হাতে তার দেহটা বুকে চেপে ধরল হরিশ। ঝটপাটিয়ে বাধা দিল শ্রীমতী—এই কুত্তা। এই হারামী। কি করছিস তুই।

শ্রীমতীর মুখটা নিজের মুখে নিবিড় করে টানল হরিশ। উষ্ণঘন নিঃশ্বাসে ফিস ফিস করল শ্রীমতী! শ্রীমতী! তুই এত সুন্দর।

দ্রুত হাতে শ্রীমতীর কাঁচুলীটা খুলে ফেলল হরিশ। নীল মেঘের সামিয়ানার নিচে সবুজ বনের পটভূমিতে শ্রীমতীর নিরাবরণ কালো দেহটা অপার্থিব সৌন্দর্যে ঝলক দিল। হরিশ অন্ধ আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বন কাঁপিয়ে ঝড় উঠল। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। অন্ধকার বনের মধ্যে প্রবল বৃষ্টি আর আদিম উন্মত্ততায় দুজন ভেসে গেল। বৃষ্টি থামল অনেকক্ষণ পর। শ্রীমতীর ঢেউ তোলা বুকে মূর্ছিতের মত পড়ে থাকা হরিশকে ধাক্কা দিল শ্রীমতী। টিলার শরীর থেকে নেমে আসা ঘোলা পানির তোড় এত ক্ষণ দুজনকে ভাসিয়েছে। বৃষ্টি আর শরীরের বিনিময় সুখে দুজন যেন নতুন করে স্নান করে উঠল। শ্রীমতী হরিশের ভেজা চুল ধরে ঝাঁকুনি দিল—এই হরিশ। ওঠ। বাড়ি যাবি না।

অন্ধকারে উঠে বসল হরিশ। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝরণার শব্দটা ভৌতিক শব্দের মত লাগছে। জঙ্গলে কট্‌কট্‌ করে কি পোকা

ডাকছে। অন্ধকারে হরিশকে দেখা যাচ্ছে না। হাত বাড়িয়ে ওর বুকের ছাতি স্পর্শ করল শ্রীমতী। আস্তে বলল—আসবি আমার ঘরে?

শ্রীমতীকে বুকে টেনে নিল হরিশ। ওর মসৃণ পিঠে গলায় ঠোঁটের গভীর স্পর্শ দিতে দিতে বলল—আসব রে। আসব। তোর শরীরে এত নেশা। পাড়ার নেশা এর কাছে লাগে না।

এতক্ষণে রাতের অন্ধকারে শিহরণ তুলে শ্রীমতী তার নেশাল হাসিটা হাসল।

শ্রীমতীর কাঁধে মুখ ঘষতে ঘষতে হরিশ বলল—হাসছিস যে?

এতদিন তো এ নেশার দিকে চোখ তুলে দেখিস নি!

সময় হয় নি তাই দেখি নি। এখন সময় হয়েছে বলেই দেখতে পেয়েছি। তোর ঘরে না গেলে আমি মরে যাব।

শ্রীমতী আবার হাসল—লোকে আমায় বলে ঢেমনি। তা ছাড়া আমি তো ছোটজাতের মেয়ে। আমার ঘরে এলে তোর জাত যাবে না?

শ্রীমতীকে কঠিন দুবাহুর বাঁধনে বাঁধল হরিশ—কিসের জাত। কোন জাত মানি না আমি। তোকে নিয়ে বাগান ছেড়ে পালিয়ে যাব।

কিসের এক রোমাঞ্চ শ্রীমতীর সারা শরীর মন শিহরিত হল। এতদিনে কি সেই পুরুষ এল শ্রীমতীর জীবনে যে পুরুষের স্বপ্ন দেখে তার মন।

জংগলে ঝাঁক বেঁধে শেয়াল ডেকে উঠল। হরিশের বাঁধন ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল শ্রীমতী। অন্ধকার হাতড়ে ভেজা একটা শাড়ি পেল। আঙুলের স্পর্শে বুঝল এটা নতুন শাড়িটা। পুরোন শাড়ি, কলসী পানির তোড়ে কোথায় ভেসে গেছে। কাদামাখা ভেজা শাড়িটা অন্ধকারেই শরীরে জড়াল শ্রীমতী। হরিশের হাত ধরে বলল—চল। লাইনের কেউ দেখলে কি বলবে কে জানে!

হরিশ নিরুদ্বিগ্নতায় হাসল—আজ তলবের দিন। লাইনের মেয়ে পুরুষের চুয়ানী হাঁড়িয়া খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে আছে। কে আর এদিকে নজর দেবে।

অন্ধকারে পিছল মাটিতে সাবধানী পা ফেলে হাত ধরে এগোতে লাগল দুজন। গাছের বিস্তৃত নীচু ডাল থেকে এখনও ঝুপঝাপ করে পানির ফোঁটা ঝরছে। আকাশে মেঘ ভেঙেছে। ঝিক ঝিক করে চোখ মেলেছে তারা। ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁঝি ডাকছে। প্রাগৈতিহাসিক মানব মানবীর মত অন্ধকার ছিঁড়ে সামনে এগিয়ে গেল ওরা।

হরমতীর সারা ঘরটা বৃষ্টির পানিতে ভিজে পচা ঘায়ের মত থক থক

করছে। ঘরের ভেজা মাটি দু'পায়ে লেপে দিয়ে বৃষ্টিকে গালাগাল দিল হরমতী· পোড়ামুখো বৃষ্টির মরণ হয় না। দূর হ রইড়জা।

পাশের ঘর থেকে বিন্দিয়া চেঁচিয়ে বলল--বৃষ্টিকে কেন গালি দিচ্ছিস রে মাসী। মেঘ না হলে যে আমাদের রুজী বন্ধ হয়ে যাবে।

হরমতী বলল· এমে তো খুব পানি হউচি আমার কি হউচি রে?

আম ঘর তো ভাতো নাইক! কি খাইচু! . কি করব আমি বৃষ্টি দিয়ে বল! গজ গজ করতে লাগল হরমতী!

বিন্দিয়ার ঘর থেকে তেলের পিঠে ভাজার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যার ভেজা বাতাসে। রান্নাবান্নার ব্যাপারে বিন্দিয়া যে শৌখিন মেয়ে গেলোবাজী পাড়ার সবাই তা জানে। প্রত্যেক তলবের দিন বাজার থেকে গুড় আর সর্ষের তেল কেনে বিন্দিয়া। আটা গুড় গুলিয়ে তেলে ভেজে পিঠে তৈরি করে। পিঠে ভাজার সুগন্ধে হরমতীর মেজাজ খারাপ হল। এত ঝড় জল হয়ে গেল। সারাদিন বাগানের কাজের পর ঘরে এসে কেউ আরামে বসবার শুকনো জায়গাটি পাচ্ছে না। তার মধ্যে বিন্দিয়ার পিঠে ভাজবার বাবুয়ানীটা ঠিকই আছে। মনে মনে বলল হরমতী· 'পিঠে তুই খাওয়াবি কাকে। মরদ তো তোর পাট্টায় পড়ে আছে।' মুখে বলল--ও বিন্দিয়া কাল কিন্তু টিলাবাবুকে বলতে হবে। ঘরের চাল দিয়ে এত পানি পড়লে আমরা যে ভিজেই মরে যাবো।

ওধারের ঘর থেকে কথার জবাব দিল লছমী মালিক তো দুর্গা-পুজোর আগে ঘর সারাই করবে না। এখন বলে আর লাভ কি!

মেজাজ লছমীরও খারাপ। কাজে যাবার আগে খুঁটে দেওয়া লাঠি-গুলো সে ঘরের পিছে রৌদ্রে দিয়ে গিয়েছিল। তলব নিয়ে হাট সেরে ফিরতে ফিরতে বৃষ্টি নামল। ঘুঁটেগুলো ঘরে তোলা হয় নি। শুকনো গোবর জলে ভিজে আলগা হয়ে খুলে পড়েছে। চঞ্চলাকে খোঁটা দিয়ে হরিয়ার উদ্দেশ্যে বাঁকা কথা ছুঁড়তে লাগল সে। কেনই বা ছুঁড়বে না। তার ভাসুরের ছেলে নয় হরিয়া! অথচ একটা কাজে আসে না। ঘুঁটেগুলো সে তো তুলে রাখতে পারত। লছমীর কাজ করে দিলে যে তার মান যাবে। অথচ চঞ্চলার হুকুমের তাবেদারী করছে সারাদিন!

চঞ্চলা শুনল। জবাব দিল না। কিছু বললেই লছমী গলা তুলে ঝগড়া শুরু করবে। ভেজা গোবরগুলো ঝুড়িতে তুলতে তুলতে লছমী হরিয়াকে বকতে লাগল দেখব। দেখব। চঞ্চলা তোকে কোন স্বর্গে তুলে দেয়। বিপদে পড়লে তখন লক্ষ্মণ কাকার কাছে আসতেই হবে। তোর বোনেদের বিয়ের সময় কে খরচ করল! খরচ কি অর্জুন দিয়েছিল না চঞ্চলা। মহাজনের কাছে ধার করে বরের কাপড় দিয়েছিল...

ঘরের কাদা লেপে চুলো ধরাল হরমতী। চুলো ভিজে স্যাঁতস্যাঁত করছে। ভেজা চুলোয় ভেজা লাকড়ী দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে দম ধরে এল হরমতীর। ভাঙা কপাটে ভেজা বাতাস ঝাপটা দিচ্ছে। এক তাল কাদার মত তার বুড়ো অথর্ব স্বামী ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। ধোঁয়ায় জ্বালা করা চোখ সেদিকে তুলে হরমতী রাগ ঝাড়ল- সারাদিন ঘরে পড়ে ঘুমোও। চুলোটা ঢেকে রাখতে পার নি।

বুড়ো জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্ট কি জবাব দিল। অনেক চেষ্টায় চুলো মরা আগুন নিয়ে জ্বলে উঠল। চুলোয় মাটির হাঁড়ি বসিয়ে রৌদ্রে শুকানো চায়ের পাতা ভাজতে লাগল হরমতী। বাগান থেকে পাতা এনে উঠোনের রোদ্রে শুকোয় সবাই। সেই পাতাই চুলোয় ভেজে হাঁড়িতে ভরে তুলে রাখে। সকালে কাজে যাবার সময় জ্বাল দিয়ে লবণ গুলে খায় প্রায় সকলেই। লবণ গোলা চা-ই হল রং চা। চা পাতা ভাজতে ভাজতে হরমতী ভাবল এত চায়ের মধ্যে থেকেও এক পেয়ালা ভাল চা তারা কেউ কোনদিন খেয়ে দেখল না। কি যেন ভাল চায়ের স্বাদ কেমন! কেমন লাগে দুধ চিনি গোলা চা খেতে! লবণ গোলা রং চা তৈরি করে বুড়োকে দিল হরমতী- নে বুড্ঢা। চা খা।

বুড়ো হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালা নিল। হরমতীর মুখে তাকিয়ে টেনে টেনে জড়ান কণ্ঠে বলল- আজ তলব পেয়েছিস না?

হরমতী ঝামটা দিয়ে উঠল- তলব পেয়েছি তো তাতে আমার তোর কি! তলব তো মহাজনের সম্পত্তি।

বুড়ো চুপ করে গেল। চা খেতে খেতে আবার প্রার্থনার দৃষ্টি তুলল হরমতীর মুখে—আমাকে একটু চুয়ানী এনে খাওয়াবি হরমতীয়া! কত দিন খাই না।

হরমতী ধমক দিল- রাখ বুড়ো। ভাত জোটাতেই আমার জীবন শেষ। হাড়িয়া চুয়ানী খাওয়াব তোকে আমি কোথা থেকে। ক'দিন আগে মহাজনের কাছ থেকে নতুন ধুতি এনে দিলাম। সেটা তুলে দিলি চোরের হাতে।

ধুতির কথাটা মনে পড়ায় হরমতীর নতুন করে শোক উথলে উঠল। বুড়োকে একটা ধুতি এনে দিয়েছিল হরমতী দু'মাস আগে। না দিয়েই বা উপায় কি। একটা ছেঁড়া গামছা পরে থাকত বুড়ো। আর সেই ধুতিটা কি না বুড়ো হারিয়ে ফেলল। সারা দিন তো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কে কখন সেই অবসরে ঘরে ঢুকে কাপড়টা নিয়ে গেছে। অথচ এখনও তার দামের কিস্তি শেষ হয় নি। ধুতির জন্য আর এক পশলা গালাগাল করল হরমতী। বুড়োকে আর অদৃশ্য ধুতি চোরকেও। চা খেয়ে ভাত বসাল হরমতী।

তলবের টাকা দিয়ে চাল আর এক হালি কাঁচকলা কিনেছে আজ। রেশনের আটা দিয়ে পুরো সপ্তাহের খাওয়াটা চলে যায়। বুড়োটা আবার ভাত খাবার জন্য বড় অস্থির হয়ে থাকে। ভাতের মধ্যে কাঁচকলা সিদ্ধ দিয়ে বসে রইল হরমতী। ভেজা স্যাঁতসেঁতে ঘর আর ভেজা বাতাসে শীত শীত করছে। পরনের জ্যালজেলে শাড়ির আঁচল শরীরে জড়িয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল হরমতী। দুঃখের কপাল তার। ভগওয়ান তাকে একটা ছেলে দিল না। দুই মেয়ে, বিয়ে হয়ে তারা নিজের সংসারে চলে গেছে। বুড়োর কাজ থেকে নাম কাটা যাবার পর হরমতীকে একাই রোজগার করতে হচ্ছে। বয়সটা তো তারও কম হল না। আজকাল দাঁড়িয়ে পাতা তুলতে তুলতে তার একটুতেই কোমর ধরে যায়। পাতা ছিঁড়বার সময় হাতও নির্ভুল দ্রুততায় চলে না। সর্দারের ধমক খেতে হয় বার বার। বুড়োটাও বাহাত্তুরে। বয়স হয়ে যাবার পর যখন বাগানের খাতা থেকে তার নাম কাটা গেল। অনেকগুলো টাকা পেয়েছিল এক থোকে। হফ্তার তলব থেকে কোম্পানী আট আনা করে কেটে রাখে। কাজ থেকে অবসর নেবার সময় এক সঙ্গে জমা টাকাটা পায় কুলিরা। হরমতী তখন বুড়োকে কত বলেছিল টাকাটা দিয়ে একটা গরু কিনে রাখবার জন্য। দুধ হলে বিক্রি করে পয়সা পাওয়া যাবে। হরমতীর কথা আমলেই আনে নি বুড়ো। গরু কেনা একটা ঝামেলা ছাড়া আর কি। গরু রাখা মানেই একটা মানুষের খরচ চালানোর সমান। অথচ টাকাগুলো কি থাকল! কি করে, কেমন করে যেন জলের মত খরচ হয়ে গেল। এখন তো হাতে একটি পয়সা নেই। সামনে রয়েছে দুর্দিন। আগামী শীত পর্যন্ত হরমতী কাজ করতে পারবে কি না কে জানে। শীত এলে তো এক রকম অচল হয়ে যায় সে। আগুনের নীল শিখার মত একটা ভয় বিস্তৃত হতে লাগল হরমতীর মনে। বার্দ্ধক্যের অনিশ্চয়তার ভয়। যাদের রোজগার করবার মত ছেলেমেয়ে নেই শেষ বয়সটা তাদের কি দুর্দশায় কাটে সে তো সকলেরই জানা।

ঘুণে ধরা কাঠের কপাট করাত করে নড়ে উঠল। বিষ্ণুর বউ চন্দনী এসে দাঁড়াল দরজায়। হরমতীর ঘর ছাড়িয়ে আরো দু'ঘর পরে বিষ্ণুর ঘর। দাঁতে খৈনীর গুঁড়ো ঘষতে ঘষতে হরমতীর সামনে বসে পড়ল চন্দনী--ও মাসী! ঝড়ুর বউটার খবর শুনেছ?

কাঠের জলচৌকি এগিয়ে দিল হরমতী বস চন্দনী। বৃষ্টির জল পড়ে ঘরের যা অবস্থা হয়েছে।

বিষ্ণুর পরিবার এ পাড়ায় অবস্থাপন্ন। ওর বউ দু'জোয়ান ছেলে তিন মেয়ে সবাই কাজ করে। তা ছাড়া জমি থেকে ভাল ফসল তোলে। হিসেবী সংসারী লোক বিষ্ণু। নেশা ভাং করে গড়াগড়ি যায় না। দুটো দুধেল গাই।

এক জোড়া বলদের মালিক ওরা। শুয়োর আছে এক খোয়াড়। কোম্পানীর দেওয়া ঘরের পাশে দুটো বড় চৌচালা ঘর তুলেছে বিষ্ণু। চন্দনীর হলুদ ছাপা শাড়ি আর কানের সোনার কানপাশার ওপর কুপীর লাল আলো পড়েছে। চন্দনাকে খুব সুখী আর অভিজাত দেখাচ্ছে। নিজের ময়লা ছেঁড়া কাপড়টায় তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল হরমতী। চন্দনীটা কপাল করে এসেছিল বটে। বলল—ঝড়ুর বউকে তো ওঝা কবিরাজ কত কি দেখান হল। তবু এতদিন সেরে উঠল না মেয়েটা।

দাঁতে আর একটু খৈনী চেপে গুছিয়ে বসল চন্দনী—ওঝা কবিরাজ দেখালে হবে কি। ওকে তো আর যেই সেই ভূতে ধরে নি। সাহেবমারীর টিলা থেকে সাহেব ভূতে ধরেছে। বীজতোলা টিলার পাশে কবর আছে না সাহেবটার। সাহেবটার অপমিত্যু হয়েছিল। ভূত হয়ে টিলায় ঘুরে বেড়ায় রাতদিন। কেউ ওখানে যায় না। অথচ ঝড়ুর বউ কিনা ওখানেই গিয়েছিল কাঠ কাটতে। বাবা, কে না জানে কুলিদের ওপর সাহেব ভূতটার কি রকম রাগ।

ভূত হয়ে যাওয়া সাহেবটার গল্প হরমতী জানে। সে তো অনেক আগের ঘটনা। হরমতী বোধ হয় তখনও মায়ের কোল ছাড়ে নি। বাগানের ছোট সাহেবটা ছিল বেধড়ক পাজি। বাগানগুলোতে যত বদমেজাজী লম্পট সাহেবরা অত্যাচারের ইতিহাস রেখে গেছে তাদের মধ্যে এ সাহেবটাও ছিল বিখ্যাত। হরমতী মায়ের কাছে গল্প শুনেছে হাতে একটা লিকলিকে চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত সে। যখন তখন যাকে তাকে গালাগাল করত। চাবুক মেরে পিঠের চামড়া চিরে দিত। জোয়ান কামিনগুলো তার নজরকে অসম্ভব ভয় পেত। নজরে ধরে গেলে আর উপায় থাকত না। কত কামিনের ইজ্জত আর রুজী নষ্ট করেছে সে। সারা কুলিপাড়া তার ভয়ে তটস্থ থাকত। কখন কে বুটের লাথি খায়। কখন কার পিঠে চাবুক আছড়ে পড়ে। কখন কোন মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়। পঞ্চায়েতকে দিয়ে কুলিরা বড় সাহেবের কাছে নালিশ পাঠিয়েছিল। ফল হয় নি। উলটো ছোট সাহেব নেটিভ-গুলোর সাহসে রেগে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গিয়েছিল। বিনা কসুরেই কুলিদের পিঠ রক্তাক্ত করছিল। একদিন তলবের দিনে সবাই যখন তলব নিয়ে ফিরছে তখন ঘটনাটা ঘটল। ছোট সাহেব মটর সাইকেলে চেপে পাশের বাগানে যাচ্ছিল। রাস্তার ওপর কে যেন এক বোঝা কাঠ রেখেছিল। সেই কাঠের বোঝায় ধাক্কা খেয়ে মটর সাইকেল নিয়ে পড়ল সাহেব। সকালে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তায় কাদা। কাদায় মেখে সাহেবের জামা কাপড় একেবারে বিশ্রী ব্যাপার। সাহেবের মেজাজ এমনিতেই ভাল ছিল না। কুলিদের সঙ্গে অতিমাত্রায় দুর্ব্যবহারের জন্য ম্যানেজার তাকে সতর্ক করে

হুঁশিয়ারি ছেড়েছে। মনটা কালো কুকুরগুলোর ওপর রাগে ধোঁয়াচ্ছিল। মটর বাইক নিয়ে পড়ে যাওয়ায় তাতে যেন ফস করে আগুন ধরে গেল। ক্ষেপে রেগে চিৎকার করে বাগান কাঁপিয়ে তুলল সে। লাল মুখে চিৎকার করতে লাগল সে কোন শুয়োর কা বাচ্চা ইধার লাকড়ী রাকখা। পাকড়ো উসকো। প্রচণ্ড আক্রোশে লাকড়ীর বোঝার লাথি মেরে ইংরেজী আর হিন্দীতে অশ্রাব্য গালি ছুঁড়তে লাগল সাহেব। লাকড়ীর বোঝাটা ছিল এক কামিনের। লাকড়ী কুড়িয়ে রেখে সে তলব আনতে গিয়েছিল। তার লাকড়ীর বোঝা যে এমন অনর্থ ঘটিয়েছে জানতে পারে নি। তলব নিয়ে ফিরে দেখল স্বয়ং ছোট সাহেব। কাঁদায় রাগে ভয়াবহ চেহারা তার। তাকে ঘিরে যেসব কুলি মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়েছিল তাদের, কয়েকজনকে চড় লাথি বসিয়েছে সাহেব। লাকড়ীর মেয়েটি ভয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। সাহেব তাকে দেখতে পেল। ছুটে এল এই হারামী আওরত! কে রেখেছে এখানে লাকড়ীর বোঝা?

ব্যাপারটা যে ঠিক কি ঘটেছে মেয়েটি ঠিক বুঝে ওঠে নি। ভয়ে ভয়ে বলল হামি হুজুর!

সাহেবের হিতাহিত জ্ঞান রহিত হল। মুহূর্তে প্রলয় ঘটে গেল যেন। সাহেবের লাথির পর লাথিতে মেয়েটি মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল। বার বার মাথা তুলে মাফ চাইল। আর কসুর হবে না জানাল। সাহেব তখন রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য। বড় ম্যানেজারের শাসন কুলিদের সামনে পড়ে গিয়ে এই কাদায় মাখামাখি হওয়া, তার ওপর কেচোর মত গুটিয়ে যাওয়া বিশ্রী ঘৃণ্য কালো মুখগুলো। সব মিলে তাকে রাগে উন্মত্ত করে তুলল। লাথি আর চাবুকের ঝড়ে মেয়েটি গোঙাতে লাগল। নাক মুখ ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। পরনের কাপড়টা সাহেব টেনে খুলে ফেলেছিল। ভারি বুটের চাপে পিষ্ট হতে লাগল উলঙ্গ শরীরের মাংস। সভয়ে যারা দূরে সরে গিয়েছিল এই বীভৎস দৃশ্যে তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পরক্ষণেই বুঝি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটল। গোলমালের খবরে আরো কুলি ছুটে এল তলব ঘর থেকে। এক সঙ্গে একদল কালো মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল সাহেবের ওপর। সারা বাগান ভেঙে কুলিরা এসে পড়ল। চা গাছ ছাঁটাইয়ের দায়ের কোপে সাহেবের শরীর খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। ততক্ষণে বড় সাহেব, টিলাবাবু, বড়বাবু, অস্ত্রধারী নেপালী বাগান-রক্ষীরা এসে উপস্থিত হয়েছে। অনেকগুলো মানুষের নীরবে মুখ বুজে সয়ে যাওয়া অত্যাচারের প্রতিশোধে ছোট সাহেবের দেহটা আর মানব দেহ বলে চিনবার অবস্থা নেই। উত্তেজিত কুলিরা বাগান কাঁপিয়ে গর্জন তুলল, বলল- জালেম শয়তানকে আমরা খুন করেছি। বড় সাহেব তোর যদি ইচ্ছে

হয় আমাদের জেলে দে। ফাঁসি দে। আমরা সবাই খুন করেছি। আমরা সবাই ফাঁসিতে যাবো। বড় সাহেব বিচক্ষণ ম্যানেজার। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলেন তিনি। ঘরে বন্দী হয়ে ক্রমাগত নিষ্ঠুর প্রহার খায় যে নিরীহ বেড়াল, সেও এক সময় মরিয়া হয়ে প্রহারকারীর টুটি কামড়ে ধরে। মরিয়া হয়ে উঠেছে কুলিরা। শাস্তি দিয়ে এদের দমাতে গেলে বাগানে বাগানে হয় তো এ আগুন ছড়িয়ে পড়বে। সে আগুনে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ মালিক আর ব্যবস্থাপকরা পুড়ে মরবে। ব্যাপারটা খুব বেশি গড়াতে দিলেন না তিনি। ছোট সাহেবের বিখণ্ডিত দেহটা কফিনে ভরে বাগানের শেষ মাথায় টিলার ওপর কবর দেওয়া হল। তারপর কত বছর কেটে গেল। অন্য সাহেবরা এল বাগানে। তারাও একদিন চলে গেল। কিন্তু বাঁশ ঝাড় আর ঘন বেতঝোঁপে ঝুপসি টিলাটা সাহেব মারীর টিলা নামে কুখ্যাত হয়ে রইল।

ভুলেও কেউ ওদিকে পা দেয় না। আর দুঃসাহসী ঝড়ুর বউটা কি না পোয়াতী শরীর নিয়ে ওই জঙ্গলেই বাঁশ কাটতে গিয়েছিল। কে না জানে সাহেবটা ভূত হয়ে ওই জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কুলিদের ওপর তার প্রচণ্ড আক্রোশ। হরমতী বলল ঝড়ুর বউকে যে ভূতে ধরেছে। ও তো জনমে ছাড়বে না।

চন্দনী উঠে গিয়ে দরজার সামনে থুথু ফেলে এল অশাবতী রেণ্ডী। তার ওপর ধরেছে কড়া ভূত। বাঁচলে হয়। সন্ধ্যার পর ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তুমি বিশ্বাস করবে না মাসী! মুখটা ওর বেঁকে ঠিক ঘোড়ার মত হয়ে গেছে। চোখগুলোও করমচার মত লাল। গালের পাশ দিয়ে ফেনা উঠছে অনবরত।

চুলোয় একটা কাঠ ঠেলে দিল হরমতী - পোড়া কপাল মেয়েটার, আশাবতী বলে বাগান থেকে ছুটিটি পেয়েছে। তলবের টাকা পেয়েছে। কঞ্জুস শয়তান ঝড়ুটা মারপিট করে সব কেড়ে নিল। ওর মায়ের বাড়ি পর্যন্ত যেতে দেয় না। পয়সার লোভে মানুষ এমন অন্ধ হয়।

চন্দনীর মুখে গর্বিত হাসি ফুটল সবাই হয় না মাসী। আমার নান্দরার বাবাকে দেখো। আমরা তো রোজ ভাত খাচ্ছি। মাছ মাংসও খাই মাঝে মাঝে। আমার ছেলেমেয়েরা ভগওয়ানের কৃপায় কেউ ছেঁড়া কাপড় পরে না।

হরমতী চন্দনীকে থামিয়ে দিল —তোর মত কপাল ক'জনের। শুনছি বিষ্ণু না কি পঞ্চায়েতের মেম্বর হবে রে। হলে ভালই হয়। ঝড়ুর বউটা এ ধাক্কা সামলে উঠলে বিষ্ণুকে বলে এর একটা বিহিত করিয়ে দেওয়া যাবে।

বিয়ের পর থেকে মেয়েটাকে কি কষ্ট যে দিচ্ছে ঝড়ু। কতবার তো ওর মা বাবা পঞ্চায়েতে নালিশ দিল। পঞ্চায়েতের বুড়োগুলোও যেমন তেমন তার কানুন: একবার বিয়ে হয়ে গেলে মরা পর্যন্ত আর স্বামীকে ছাড়তে পারবে না। এ কি জুলুমবাজী।

চন্দনীও সমর্থন করল হরমতীকে—আজ-কালকার মেয়েরা কি আর অত সব মানছে! ওই তো মাদ্রাজী লাইনের তাঁতীপাড়ার চান্দা স্বামীর ঘর করল না। একলাই রুজী করে খাচ্ছে। তার বেলা তো কানুন নেই। ওরা যে আমাদের চেয়ে উঁচু জাতের। আর ঝড়ুটাও শয়তান কম নয়। পঞ্চায়েতকে মদ খাইয়ে হাত করে রেখেছে। স্বামীর ঘর ছাড়লেই পঞ্চায়েতের আইনে পড়বে। কোন বাগান ওকে কাজ দেবে না। পেটের দায়ে বাজারে গিয়ে খাতায় নাম তুলে ঢেমনি হয়ে যাবে।

হরমতী জিভ কাটল- রাম। রাম। ওকথা মুখে আনিস না।

গুম গুম শব্দ মেঘ ডাকল। সাপের জিভের মত বিদ্যুৎ ধাঁধাঁল. তীর রেখায় আকাশ জুড়ে ঝিলিক দিল। হরমতী অন্ধকার আকাশে চোখ রেখে বলল- আবার বোধহয় বৃষ্টি আসবে। সারারাত আজ দুর্ভোগ আছে কপালে।

চন্দনী উঠে দাঁড়াল। তার ঘরে পানি পড়ে না। কোম্পানীর দেওয়া ঘরটায় সে গরু ছাগল রাখে। নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল- যাই মাসী। দেখি মেয়ে-দের রান্না হল কি না!

চন্দনীর প্রসন্নতায় আবার মেজাজ খারাপ হল হরমতীর। আসন্ন বৃষ্টির দুশ্চিন্তা নিয়ে গজ গজ করতে লাগল- আগুন দেই কোম্পানীর কপালে। বছরে একবার ঘর সারাই করে। তাও ভাল করে করে না। বর্ষা এলেই চালা দিয়ে হুড় হুড় করে পানি পড়ে।

চন্দনী আর দাঁড়াল না। হরমতীর দুঃখের পাঁচালী সহজে থামবে না।

হরিয়া হরদেও বুড়োর ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঘরটা প্রায় অন্ধকার। এক পাশে হরদেওর নাত্নী কুন্তি ভাত রাঁধছে। হরদেও চুলোর পাশে বসে কাশছে। সারাটা শীত হাঁফানিতে কষ্ট পায় বুড়ো। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হরিয়া ডকল হেই দাদু।

হরদেও মাথা তুলল—কি হউচি রে হরিয়া?

হরিয়া হাসি মুখে ভেতরে এল—তোমাকে দেখতে এলাম।

হরদেওর পনের বছরের নাত্নী কুন্তি বলল—ও হরিয়া। শুনলাম ঝড়ু কাকার বউর না কি খুব খারাপ অবস্থা। গিয়েছিলি না কি দেখতে?

হরিয়া শিহরিত হল। বলল—ওরে বাবা। ভুতে পাওয়া বাড়িতে

আমি যাবো।

কুন্তি খিল খিল করে হাসল তুই একটা রেন্ডী। এত ভূতের ভয় তো জঙ্গলে গরু চরাস কি করে। শণ বনে ঘাস কাটিস কোন সাহসে ?

হরিয়া হরদেওর পাশে বসে পড়ল -আমি তো আর একা গরু চরাই না। ভূতেরা মানুষকে একা পেলে তবেই না ধরে।

হরদেওর হঠাৎ কাশি উঠল। ভীষণ জোরে কাশতে লাগল সে। কাশির দমকে তার কুঁজো শরীরটা আরো কুঁজিয়ে গেল। কুন্তি হরদেওর বুকে পিঠে হাত ঘষতে ঘষতে বলল কথা তো শোন না। ঠান্ডা সহ্য হয় না তোমার। অথচ সন্ধ্যাবেলা ঠুক ঠুক করে ঝড়ু কাকার দোকানে গিয়ে বসে থাকবে। টান উঠলে দেখবে কে তোমাকে ?

অনেকক্ষণ একটানা কাশির পর দম টেনে হরদেও বলল দেখবে ভগওয়ান।

হরিয়ার ভারি কষ্ট হল। হরিয়া বলল দাদুকে হাসপাতাল থেকে দাওয়াই এনে খাওয়ায় না কেন কুন্তি দিদি ?

কুন্তির রান্না হয়ে গেছে। চুলোর মধ্যে একটা কাঠ ফেলে আগুনটাকে জিইয়ে রাখল সে। কুন্তিরাও যথেষ্ট গরীব। কেরোসিন কিনবার পয়সা নেই। তার রোজগারেই দাদু নাতনীর খাওয়াটা চলে। কুন্তির মা বাবা মরেছে। ছেলেবেলায়। দাদুর কাছেই বড় হয়েছে সে। কাঁসার থালায় হরদেওর ভাত বেড়ে দিয়ে কুন্তি বলল দাদুকে হাসপাতালের ওষুধ দেবে কেন রে ? বাগানের কামে থাকলে তবেই তো দাওয়াই পাওয়া যায়।

হরদেওকে হরিয়ার খুব ভাল লাগে। কত মজার মজার গল্প শোনায় সে হরিয়াকে। গল্প শুনবার লোভেই হরিয়া হরদেওর কাছে এসে বসে।

হরিয়া হরদেওর দিকে তাকিয়ে বলল দাদু, তুমি তো কতবার ভূত দেখেছ। সাহেবমারীর টিলার ভূতকে কখনও দেখছ ?

হরদেও কাঁপা হাতে বড় বড় গ্রাসে ভাত মুখে তুলতে তুলতে বলল - দেখব না কেন ? একবার সাহেবমারীর টিলার পাশে আমার ডিউটি পড়ল। চারাবাড়ি থেকে এনে চা গাছের চারা বসাতে হবে। আমরা অনেকে সেখানে কাজ করছিলাম। দুপুরের ছুট্টিতে সবাই এদিক ওদিক চলে গেল। আমি গেলাম না। কড়া রোদ। চা গাছের চারাগুলোকে ঢেকে না দিলে চারার লোকসান হবে। আমি চারাগুলো ঢাকছিলাম। ভরা দুপুর তখন। চারিদিক শুনসান্। এর মধ্যে হঠাৎ মনে হল সাহেবমারীর টিলায় কে যেন বন তছনছ করে বড় বড় গাছ দুমড়ে মুচড়ে ফেলছে। আমি তো রাম নাম জপতে জপতে চোখ বন্ধ করে দে ছুট। পেছনে মনে হল ঠিক যেন ঘোড়ার খুরের শব্দ। ঝোপের ওপর এলোপাথাড়ি চাবুকের শব্দ হচ্ছে

সপাং সপাং করে।

হরিয়ার শরীরে কাঁটা দিল। কণ্ঠে ভয় আর কৌতূহল মিশিয়ে বলল—দেখলে তুমি সাহেব ভূতকে?

—দেখি নি বটে। তবে অনেক কুলি দেখেছে। ঘোড়ায় চড়ে চাবুক ঘুরাতে ঘুরাতে সাহেবমারীর টিলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুন্তি হাসল—তোমার যত আজগুবী গল্প। ওই টিলার জঙ্গলে তো রাজ্যের বাঁদর আর হনুমানের আড্ডা। তাদেরই কাণ্ড কারখানা সব।

কুন্তির অবিশ্বাসের পেছনে একটা শিক্ষা আছে। বাগানের জেনারেটর বন্ধ থাকায় ক'দিন দুপুরে সে ম্যানেজার সাহেবের বাংলোয় পাংখা-টানার ডিউটি করেছে। ম্যানেজার সাহেবের মেমসাহেবের কাছে সে জেনেছে ভূত বলে নাকি কিছু নেই। এসব হচ্ছে মূর্খ কুলিদের কুসংস্কার। মেমসাহেব তো কত লেখাপড়া জানা মেয়ে। তার কথা কি মিথ্যে হতে পারে। তারপর থেকে ভূত সম্পর্কে বিশ্বাসটা কুন্তির একটু দুর্বল হয়ে গেছে। মেম সাহেব বলেছে কুলিরা অশিক্ষিত বলেই পেট ব্যথা, মাথা ঘোরা, খিট লাগা সবই ভূতের কীর্তি বলে মনে করে। হরদেও কুন্তির ওপর চটে উঠল বাঘ, ভালুক, হাতি, হনুমান বুঝি কেউ চেনে না। ওদের বাতাস একরকম। আর ভূতের বাতাস আর একরকম। আমার দাদু একবার ভূতের সঙ্গে লড়াই করেছিল তা জানিস?

কুন্তি হেসে ফেলল। হরদেওর দাদুর ভূতের সঙ্গে লড়াই করবার গল্পটা কুন্তিকে হরদেও অনেকবার শুনিয়েছে। হরদেওর দাদু ছিল নাকি খুব শক্তিশালী জাঁদরেল লোক। একবার অমাবস্যার রাতে শ্রীমঙ্গলের বাজার থেকে একা বাড়ি ফিরছিল সে। বাগানের মাঝামাঝি আসতে এক ভূত লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। বড় বড় লোম শরীরে লাগতেই হরদেওর দাদু বুঝল সে ভূতের খপ্পড়ে পড়েছে। দুহাতে ভূতকে তুলে মারল এক আছাড়। ভূতের শরীরেও প্রচণ্ড শক্তি। হরদেওর দাদুকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। দুজনে সাংঘাতিক জাপটাজাপটি। একবার ভূত উঠে বসে হরদেওর দাদুর ওপর। আরেকবার হরদেওর দাদু তাকে নীচে ফেলে। ভূতেদের সুবিধা হচ্ছে ওদের বড় বড় নখ থাকে। সেই নখের আঁচড়ে হরদেওর দাদুর হাত-মুখ চিরে গেল। ঠিক সেই সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ। ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ ম্যানেজার সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সাহেব দেখে ভূত হরদেওর দাদুকে ছেড়ে পালাল। হরদেওর দাদু তখন প্রায় অজ্ঞান। সাহেব তাকে তুলে চিরে যাওয়া হাতে মুখে ওষুধ লাগিয়ে লোক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। দাদুর এই গল্প শুনে প্রথম দিন কুন্তি বলেছিল—ভূত না ঘোড়ার ডিম। গাছ থেকে হয় তো কোন হনুমান

লাফিয়ে পড়েছিল তোমার দাদুর ঘাড়ে।

হরদেও রেগে উঠেছিল—হু। বলেছে তোকে। আমার দাদুর চিরে যাওয়া হাত মুখ আমি নিজে দেখেছি। পরিষ্কার মনে আছে আমার। কুন্তি দমে নি —তাহলে সাহেবকে দেখে ভূত কেন পালাল? ভূতেরা বুঝি সাহেবদের ভয় পায়?

—পায়ই তো। সাহেবদের কোমরে যে পিস্তল থাকত। পিস্তল বন্দুক ছাড়া সাহেবরা রাত বিরাতে বের হত না।

হরদেওর খাওয়া হয়ে গেলে কুন্তি বলল—দাদু আমি যাই। ঝড়ু কাকার বউকে দেখে আসি।

দরজার পাল্লা টেনে দিয়ে কুন্তি অন্ধকারে বেরিয়ে গেল। গুড় গুড় শব্দে আকাশ ডাকল। চা বাগানের সবুজের ওপর বিজলী ঝলক দিল। চুলোর আগুন মরে ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। হরিয়া হরদেওর শরীর ঘেঁষে বসল। শরীর ছমছম করান অন্ধকারে মাঝে মাঝে এ ঘর সে ঘর থেকে ডাকাডাকি কথাবার্তার টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে। হরিয়া অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙে ডাকল—দাদু?

—কি রে?

- আগে বাগানে না কি অনেক বাঘ হরিণ নীল গাই দেখা যেত।

—যেত। তবে আমি দেখিনি। বাঘ তো অনেকেই দেখেছে। আমাদের লাইনের এক কুলি একবার সাহেবমারীর টিলার জঙ্গলের পাশের ক্ষেতে ভোর বেলা লাঙল নিয়ে গেছে। জঙ্গল থেকে এক বাঘ হুম করে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। মুখে করে নিয়ে গেল জঙ্গলে। তারপর ক'দিন সে কি বাঘের উৎপাত। জানিস তো বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে আর অন্য জানোয়ার খায় না। ক'দিনের মধ্যে পরপর কয়েকজন কুলি গেল বাঘের পেটে। খবর পেয়ে রামবুনিয়া বাগানের ইংরেজ সাহেব এল। মাচা বাঁধল জঙ্গলে খুব বড় শিকারী ছিল সে। মাচার নীচে ছগলের বাচচা বেঁধে রাখা হল। তারপরই যেই না বাঘ আসা। ধম্ করে গুলী। এক গুলীতেই শেষ।

শিকারী সাহেবের চেহারাটা কল্পনা করল হরিয়া। লম্বা সাহেব। হাতে বন্দুক। হরিয়া হঠাৎ বলল—ইংরেজ সাহেবরা তা'হলে ভালই ছিল বলতে হবে। কি বল দাদু?

—ভাল মন্দ দু'রকমই ছিল। বাগানের খুব যত্ন নিত তারা। কোন মোকামে চা গাছের গোড়ায় যদি একটা নাজুনী লতা চোখে পড়ত, তাহলে আর উপায় ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই মোকামের সর্দারের তলব কাটা যেত। সাহেবরা নিজেরাও খুব খাটত। সাতটায় গুনতির টাইম। বড়

সাহেব বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়ত আরো আগে। সারাটা বাগানে চক্কর দিত। কত সময় নিজে হাতে প্রুনিং করত। চারা বসাবার মাটি পরীক্ষা করত। নার্সারীর চারা দেখত। তারপর সাড়ে আটটায় বাংলোয় ফিরে বেরেকফাস্ট খেতো। খেয়েই আবার যেত কারখানায়। কারখানার কাজ সেরে কফি খেয়ে বসত অফিসে। যেমন নিজে খাটত। তেমন আমাদের খাটাত। আবার ফুর্তি করত। আমার বাবার সময় এক সাহেব ছিল। খুব ভাল ঘোড়সওয়ার ছিল সে। ঘোড়ায় চড়ে পোলো খেলত। ঘোড়া নিয়ে চলে যেত সিলেট শহরে। শহরের কাছে গলফ ক্লাবে গলফ খেলতেও যেত। আবার শহরের ক্লাবে ঘোড়া রাখত। আমার বাবা মাঝে মাঝে যেত সেই সাহেবের সঙ্গে। ঘোড়ার দেখাশোনা করত। বাবার কাছে শুনেছি স্টেশান ক্লাবে না কি কালা আদমীর ঢোকা নিষেধ ছিল। তবে আমার বাবাকে খুব পছন্দ করত সাহেব। সাহেবকে বলে বাবা একবার আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল স্টেশান ক্লাবে। আমি তখনও যোয়ান হই নি। তবু বেশ মনে আছে সব। বেয়ারা বাবুর্চি ঘোড়ার সহিস ছাড়া সেখানে আর কোন কালা আদমী দেখি নি। স্টেশান ক্লাবে বড় খানা হত। নাচ গান হত। পরীর মত ধবধবে সাদা মেমসাহেবরা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা ফুলোন ঘাঘরা পরে স্টেশান ক্লাবে আসত। সেখানে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের বিবিকে দেখেছিলাম। আমার বাবা একবার দেখেছিল জর্জ ইংলীশকে। জর্জ ইংলীশ ছিল সুনামগঞ্জ ছাতকের বড় জমিদার। কি তেজী সাদা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল তার বিলাতী কুত্তা। কুত্তাটাকে জর্জ সাহেব না কি নিজের ছেলের মত আদর করত। খানার টেবিলে কুকুরকে পাশে বসিয়ে খাওয়াত। শুনেছি মরার পর ছাতকে তার কবরের পাশেই তার কুকুরেরও কবর দেওয়া হয়েছিল। তার আর কুত্তার কবরের উপর বিরাট একটা গীর্জার মত মন্দির বানান হয়েছিল। এখনও ছাতকে নদীর পারে আছে সেই গম্বুজ।

হঠাৎ গাছপালা দুলিয়ে বাতাস উঠল। বৃষ্টি নামল। ভেজা বাতাসের ধাক্কায় ঘরের দরজা ককিয়ে উঠল।

হরদেও বলল—আবার মেঘ নামল না কি রে?

হরিয়া এতক্ষণ রূপকথার মত গল্পের জগতে ভাসছিল। বৃষ্টির শব্দে হরদেওর ভাঙা অন্ধকার ঘরটায় ফিরে এল। টালির চালের ওপর চটপট ছরছর শব্দে বৃষ্টির বাজনা বাজছে। বাতাস ঝাপটা মারছে। হরিয়া অনুমান করতে পারে মালখানা আর ডরিস গাছের ছড়ান ডালগুলো এখন প্রেতাত্মার অতিকায় বাহুর মত দুলে দুলে কি যেন খুঁজছে চা বাগানের অন্ধকার বৃষ্টিঝরা বুকে।

ঝড়ুর ঘরের বারান্দায় বৃষ্টি নামবার আগেই অনেকে এসে ভিড় করছে। ঘরের মধ্যে মেয়েরা আতঙ্কিত আশংকায় দলা পাকিয়ে আছে। নীচু স্বরে কথা বলছে। কুপীর আলোয় ঘরের দেওয়ালে তাদের ছায়াগুলো ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছে। চাটাইয়ের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ঝড়ুর বউ। ঝড়ুর শ্বশুর শাশুড়ী শালী সবাই এসেছে। একটা হাত পাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে অসহায় চোখে মেয়ের মুখে তাকিয়ে আছে ঝড়ুর শাশুড়ী। ঝড়ুর বউর মুখ বাঁকা হয়ে ফেনা উঠছে গালের পাশ দিয়ে। ধনুকের মত বাঁকিয়ে যাচ্ছে শরীর। ঝড়ুর শাশুড়ী মুখ নীচু করে একবার ডাকল—এ মা। মাই রে!

লছমী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল- ও কি আর এখন তোর মেয়ে আছে না কি কাকী! যে জবাব দেবে।

ইতিমধ্যে ঝড়ু এসে উপস্থিত হল। ডাক্তারখানায় গিয়ে বাগানের ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে এসেছে সে। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল এই সব সর। সরে যা। ডাক্তারবাবুকে ভেতরে যেতে দে।

সবাই সরে পথ করে দিল। চন্দনী ফিস ফিস করল- এ বেমারী কি আর ডাক্তার সারাতে পারবে।

ডাক্তার সাহেব ঝড়ুর বউকে পরীক্ষা করে ঝড়ুকে প্রশ্ন করল—কত দিন থেকে এ অবস্থা।

ঝড়ু শুকনো মুখে জবাব দিল- কতদিন আগে সাহেবমারীর টিলার কাঠ কাটতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তরপর হাত পাও ফুলতে লাগল। মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগল। ওঝা আনলাম কবিরাজ দেখালাম। কিছু তো হল না ডাগ্‌দর বাবু!

ঠোঁট কাটা মেয়ে বিন্দিয়া বলল—আশাবতী বউটাকে মেরে মেরে না খেতে দিয়ে আধমরা করে ফেলেছিল। আহা এই শরীরে জঙ্গলে কাঠ কাটত!

এত বিপদের মধ্যেও বিন্দিয়ার দিকে একবার লাল চোখ ক্ষেপণ করল ঝড়ু। ডাক্তার সাহেব থাকাতে মুখের রাশ ছাড়তে পারল না।

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল - আমাকে দেখাতে নিয়ে যাস নি কেন?

ঝড়ু কাচুমাচু করল—সবাই বলল ভূতে পেয়েছে। ভূতের চিকিৎসা তো ডাক্তার করতে পারে না।

ডাক্তার সাহেব ধমকে উঠলেন--রাখ তোর ভূত। আসলে তুইই একটা ভূত।

চন্দনী বিন্দিয়াকে মৃদু খোঁচা দিল -ঠিক বলেছে রে ডাগ্‌দর বাবু।

ঝড়ুটাই এক ভূত। পারলে আরো তিনটে বিয়ে করে সবগুলোকে এক সঙ্গে আশাবতী করত।

ডাক্তার সাহেব ঝড়ুর বউকে ওষুধ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অনেক বছর চা বাগানে থেকে শুধু রোগ নয় এদের রোগের কারণও তার জানা। গম্ভীর মুখে বলল—তোর বউকে হাসপাতালে নিতে হবে। তা না হলে বাঁচান যাবে না।

ঝড়ুর শাশুড়ী কেঁদে উঠল—হামার বিটিয়া কেনে বাঁচবে না রে ডাগ্-দর বাবু! কি হইল রে হামার বিটিয়ার। ভূতে খাইল রে।

ডাক্তার সাহেব ধমক দিল—এই থাম। চিল্লাচিল্লি করে তো মেয়েটাকে এখুনি মেরে ফেলবি।

ঝড়ুর আরো তিনটে বাচ্চা এক সঙ্গে কেঁদে উঠল। ঝড়ুর শালী তাড়াতাড়ি ওদের বাইরে নিয়ে গেল। ডাক্তার সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে ঝড়ুকে বলল—এক্লামশিয়া হয়েছে তোর বউর। সিলেটের বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। যা ম্যানেজার সাহেবকে বলে গাড়ির ব্যবস্থা কর।

ডাক্তার সাহেব যেতে ঝড়ুর শাশুড়ী উঁচু কণ্ঠে আবার বিলাপ শুরু করল। চন্দনী বলল—রাম নাম কর মামী। কি হবে হাসপাতালে নিয়ে। ওর ঘাড়ে এত দিন ছিল বড় ভূত। এবার এসেছে সাহেব ভূত। হাস-পাতালে এর এলাজ নেই।

এতদিন পরে বোধহয় ঝড়ু অনুতপ্ত হল। বাগানের কাজ ছেড়ে সে মুদীর দোকান চালায়। বউটাই বাগানে রুজী করত। তার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে ঝড়ু। মুখ বুজে সয়ে গেছে মেয়েটা। ঝড়ু শ্বশুরকে নিয়ে ম্যানেজার সাহেবের কাছে ছুটল বৃষ্টি মাথায় করে। ম্যানেজার সাহেব জীপ গাড়ির হুকুম দিয়ে দিলেন। কিন্তু ড্রাইভার একজনকেও পাওয়া গেল না। তলবের দিন। কোথায় কোথায় নেশা করে পড়ে আছে সব। বৃষ্টি বাতাসে ভিজে মাঝরাত পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করল ঝড়ু আর তার শ্বশুর। জীপের ড্রাইভারকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল পাতা তোলার ট্রাকটরের ড্রাইভার রাজুকে। সেও নেশা করে পড়েছিল পাট্টায়। ঝড়ু তাকে টেনে তুলল। রাজু নেশার ঘোরেই বলল —আরে যাও ঝড়ু কাকা। একটা বউ মরলে আরো কত বউ পাবে। তোমার তো বউয়ের দরকার তলবের পয়সা খাবার জন্য। ভাবনা কোর না। বাগানে কি কামিনের অভাব আছে। তুমি তো দোকান দিয়ে শেঠ হয়ে গেছ। শেঠের আবার বউর ভাবনা কি।

ঝড়ু গালি দিল রাজুকে। শেষ পর্যন্ত উঠল রাজু। বলল—তোমার তো ছেলে হবার জন্য বউর দরকার। দেখো আমাকে। নতুন বিয়ে করেছি।

আমি কি বউর গলা ধরে পড়ে আছি! মরদরা পাট্টায় পড়ে থাকে। বউর পিছে পড়ে না।

ঝড়ুর শ্বশুর বলল—তুই গাড়ি চালাবি কি রে রাজু! তোর তো বেসামাল অবস্থা। পা টলছে। তোর গাড়িতে চড়লে সব শুদ্ধ পথেই মরতে হবে।

রাজু রুখে উঠল—এই খবরদার। রাজু এক ড্রাম মদ খেলেও গাড়ি চালাতে তার হাত কাঁপে না। তবে শোন! মেয়েটাকে মরে যেতে দে। বেঁচে উঠলে ঝড়ু আর পঞ্চায়েত আবার ওকে মারবে।

বড় বড় পা ফেলে কারখানার গ্যারেজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রাজু বকবক করল—শালার পঞ্চায়েত কত রেন্ডীকে তোরা মারলি। কত বুকে আগুন জ্বালালি। শালা তোদের জন্য আমার শ্রীমতীকে ফেলে একটা পোড়া কাঠকে ঘরে তুললাম। আজব দুনিয়া এই চায়ের বাগান।

জীপ নিয়ে রাজু যখন ঝড়ুর সামনে এল সারা বাড়িটা তখন বিলাপে কান্নায় তোলপাড়। চন্দনী ছুটে এল।—ও ঝড়ু তোর বউ আর নেই।

সবাই শুনল ঝড়ুর বউ ঝড়ুকে চার নম্বর সন্তান উপহার দিয়েই মারা গেছে। বিদায় দেওয়া বিলাপের মধ্য থেকে একটি নবজাত শিশুর কান্না মেঘলা রাতের অন্ধকার ছিঁড়ে আগমনের সোচ্চার ধ্বনি ছড়াচ্ছে।

আট

আকাশ নীলচে চাদরে মোড়া। হালকা নেটের মত ঝিরঝিরে বৃষ্টির পরদা দুলে দুলে কাঁপছে। ড্রইংরুম পেরিয়ে বারান্দায় এল রিণা। একটা দিগন্তবিস্তৃত নিষ্ঠুর সবুজ যেন চোখকে অন্ধ করে দিচ্ছে। নিজেকে এত একা এত শূন্য মনে হয় এই বৃষ্টি ঝরতে থাকা সবুজ দুপুরে। আশ-রাফ আজ লাঞ্চে আসে নি। ডিরেক্টর থাকাতে ওর কাজের চাপ না কি অসম্ভব বেড়ে গেছে। বারান্দার লনে চেয়ারে বসে রিণা নতুন ফোটা ড্রাগণ লিলির ঝাড়ে চোখ রাখল। সপ্তাহে দুদিন ক্লাব ডে। প্রত্যেক পনের দিন অন্তর কফিমর্নিং। তাছাড়া আছে ইমফরম্যাল তাসের চক্র। কোন-দিন জুবেরীর বাড়ি। তখনও হেলেনের ওখানে। তবুও অনেকগুলো শূন্যদিন রিণাকে নভমন্ডলের নিঃসীমতার মত এক শূন্যতায় ছুঁড়ে দেয়। হাত বাড়িয়ে রিণা কোন অবলম্বন খুঁজে পায় না। প্রচন্ড ভয়াবহ অবসর যেন তাকে নিয়ে নিঃসীম শূন্যতায় লোফালুফি খেলে। সামনের সবুজ

টিলায় থাক ভর্তি চা গাছ। বড় বড় শেড্ ট্রি। এগুলো এত চেনা হয়ে গেছে রিণা চোখ বুজে বলে দিতে পারে কোথায় কোন গাছ কেমন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। যেন খুব পুরোন এক ঘেয়ে একটা ফটোগ্রাফ ঝুলে আছে চোখের সামনে। রিণার মায়ের ঘরের দেওয়ালে ছেলেবেলা থেকে যে গ্রুপ ফটোটা দেখতে দেখতে রিণা বড় হয়েছে অনেকটা সেইরকম। আয়া এল—চা আনব মেম সাহাব?

রিণা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আয়ার দিকে। কালো ছিপছিপে মেয়েটি কাজ কর্মে চটপটে। মুখেও হাসি। সপ্তাহে মাত্র একদিন ছুটি নেয় সে। বলে—তুদের কেলাব-ডে আছে মেমসাহেব। হামরারও তলবের দিন আছে। এক দিন হামরা লেশা করি। লাচি খাই ফুর্তি করি। নাইলে কাম করব ক্যামনে?

আয়াকে হঠাৎ অসতর্ক প্রশ্ন করে সখ্যতার সীমানায় নেমে এল রিণা। বলল—আচ্ছা! এই বাগানে তোদের মন ঘাবড়ায় না?

আয়া খিল খিল করে হেসে উঠল—হামরা কি তুদের মত শুইয়ে বইসে থাকি না কি রে। কামে হামাদের দিন কাটিয়ে যায়। আর বাল বাচচা থাকলে তো ফুরসত মিলেই না।

আয়া আবার হাসতে শুরু করল। রিণা সচকিত এবং বিরক্ত হল নিজের ওপর। মেয়েটাকে সে হঠাৎ সীমানা ভেঙে একটু কাছে এনে ফেলেছিল। ও কি করুণা করছে না কি রিণাকে!

কিন্তু আয়ার মুখ কোমল। বলল—মেম সাহাব বাজা আনিয়ে দিব ঘর থেকে? বইসে বইসে বাজা শুন। মন ভাল লাগবে। হামি চা লিয়ে আসি। বাজা শুনবি। চা খাবি। ভাল লাগবে।

আয়ার আন্তরিকতায় সহসা ভাল লাগল রিণার। বলল—যা নিয়ে আয়। আয়া টেপ রেকর্ডার এনে টেবিলে রেখে চলে গেল। অলস নিস্পৃহ হাতে নব টিপল রিণা। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ভেজা সবুজ দুপুর সুরে ভরে গেল।

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়
ফাগুন মাসে
কি উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল ফুটানর খেলা।

বিরামহীন ক্লান্তিকর সবুজের জগতটা যেন দুলতে দুলতে দূরে সরে গেল। ফাল্গুনের এলোমেলো বাতাস নিয়ে হারিয়ে যাওয়া একটা বিকেল

হঠাৎ ফিরে এল। আর্টস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে কার্জন হলের পথে হাঁটতে হাঁটতে রিণা দেখল পথের ধারের গাছগুলো কি উজ্জ্বল রঙে ভরে গেছে। সামনে তার অনার্স পরীক্ষা। তার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। আশরাফ অবশ্য প্রশ্ন করেছিল কি করবে রিণা তারপর! মিষ্টি হলুদ রোদে ভরা বিকেল ফিরোজা রঙের আকাশে মুখ রেখে হাসছে। পথের পাশের কৃষ্ণচূড়ার ডালে তীব্র সুখের মত লাল ফুলের সজীবতা। বিকেলের রোদ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে। রিণা তখন কি ভাবছিল? একটা চাকরি! কলেজে পড়াবার চাকরি পেলে মন্দ হয় না। আফিসের চাকরি পছন্দ নয় রিণার। আশরাফের বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা তো শেষ হল বলে!

—এই যে মহিলা! আশরাফ রিণার পাশে।

রিণা চমকাল। খুশি হল—ও মা তুমি! আমি তো তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম, রিণার হাতের বই খাতার বোঝা কিছুটা নিজের হাতে তুলে নিল আশরাফ। বলল—কোন্ দিকে?

রিণা হাসল—যে দিকে তুমি নিয়ে যাও।

—সত্যি! তাহলে চল এই শহর ছাড়িয়ে কোথাও চলে যাই।

—সত্যি! কোথায়!

—বেশ দূরে। যেখানে মানুষ কম। অনেক গাছ। অনেক পাখি। আর স্বাধীন হাওয়া।

—কেবল ঠাট্টা।

—জী না। মোটেও নয়। বোটানিস্ট আশরাফ আহমেদ খুব শীগ্‌গির চায়ের বাগানে চাকরি নিচ্ছে। ইণ্টারভিউ দিয়েছি। এবং ইণ্টারভিউটা ভাল হয়েছে বলেই আমি মনে করি।

—তাহলে তুমি চা-বাগানে চলে যাবে!

—আমি একা নই। তুমিও যাবে।

আশরাফের চোখের তারায় বিকেলের স্নিগ্ধতা। আবার বলল- এই ঢাকা শহরটাকে আমি বড় অপছন্দ করি। এমন এক বিশ্রী জায়গা যেখানে নিরিবিলি প্রেমালাপেরও সুযোগ নেই। যেখানেই যাও সঙ্গে আছে দশ-জোড়া চোখ।

—চোখক পরোয়া কর নাকি!

—করি না তবে আমি নির্জনতা পছন্দ করি।

—তাহলে আর আমাকে কি দরকার। যাও একা একা নির্জনতা উপভোগ কর।

—সেটি হচ্ছে না। তুমি তো সাহিত্যের ছাত্রী, জান না রবি ঠাকুর

বলেছেন ঃ

দুজনে মুখোমুখি
গভীর সুখে সুখী

রিণা হাসল ভুল হল। সুখী নয়। গভীর দুখে দুখী।

– ওই এক কথাই হল। দুঃখটাও এক ধরনের সুখ।

অনেকগুলো বাগানের দুর্দান্ত কর্মপটু আশরাফ আহমদের স্ত্রী রিণা আহমেদ চোখের সামনে আবার সেই অতি পরিচিত সবুজ ফটোগ্রাফ দুলতে দেখল। টেপ বাজছে।

শান্ত কুজন
শান্ত বিজন
সন্ধ্যাবেলা...

টিলার ঢালু পথ দিয়ে টয়োটা জীপ উঠে এল। ইফতেখারের সঙ্গে এলিস নেমে এল। মুহূর্তে রিণা তার পরিচর্যিত পরিচিত জীবন ফিরে পেল। বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে রং মাখা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তুলল - হ্যালো! এই বৃষ্টিতে কোথা থেকে তোমরা।

ইফতেখারের ক্লীন শেভ করা ফরসা মুখ খুব প্রাণবন্ত। গাড়ির চাবির রিং টেবিলে রেখে বলল--এলিস কাল ধরে বসল রবার্ট হলের ওখানে যাবে তার টিবুশ দেখতে। তাই যেতে হল। এইমাত্র ফিরলাম।

এলিসকে বসতে বলে রিণা প্রশ্ন করল--রাতে রবার্টের ওখানেই ছিলে না কি তোমরা?

ইফতেখার সিগারেটের প্যাকেট বের করে এলিসের দিকে এগিয়ে দিল। এলিস একটা সিগারেট তুলে নিল। লাইটারের আগুনে এলিসের সিগারেট জ্বালিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরাল ইফতেখার—আমাদের এত আন্ডার এস্‌টি-মেট করলেন কি করে?

রিণার ঠোঁটে এখন পালিশের হাসি—কেন বল তো!

ইফতেখার হৈ চৈ করে উঠল- রবার্টের ওই কুঁড়েতে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে। আমরা ছিলাম জাফলং টি-এস্টেটে।

রিণা এলিসের দিকে মনোযোগ দিল তুমি তো শীগ্‌গিরই ফিরে যাচ্ছ। এখান থেকে বোধহয় ইন্ডিয়ায় যাচ্ছ!

এলিস সুন্দর ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল- ড্যাড যাচ্ছেন। আমি বোধহয় এখানে আরো কয়েকদিন থাকব! খুব ভাল লাগছে এখানে।

রিণা সৌজন্য পরিশীলিত হাসল- হাউ নাইস। রবার্টের ওখানে

কেমন কাটল?

এলিস জবাব দেবার আগেই ইফতেখার বলল—লোকটা ক্রেজী।

এলিস চোখের নীল তারায় কৌতুকের ঝলক—ক্রেজী? ওঃ নো। আসলে ইফতেখার রবার্ট সম্পর্কে তুমি জেলাস ফিল করো।

ইফতেখার কাঁধ ঝাঁকাল—গুড গড। আমি আর জেলাস ফিল করবার লোক পেলাম না!।

ইফতেখারের দিকে তাকিয়ে এলিস উপভোগের হাসি হাসল। রিণাও ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। এলিসের সঙ্গে ইফতেখার বেশ ভাল ঘনিষ্ঠতা জমিয়েছে। এ নিয়ে অবশ্য ইফতেখারের যথেষ্ট গর্ব আছে। ও মনে করে ও না কি ইচ্ছে করলেই যে-কোন মেয়েকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। রিণা বেয়ারাকে ডেকে চা দিতে বলল। মেঘলা আকাশটা ঝুপসী আঁধার নিয়ে আরো নীচে নেমে এসেছে যেন। জন্মলগ্নেই বিকেলের মৃত্যু ঘটেছে। ইফতেখার উঠে টেপটা বন্ধ করল—উঃ এই ভেজা মুড়ির মত বাংলাগান শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমার।

টেপ বদলে দিল ইফতেখার। ফাষ্ট বীটের উৎফুল্ল ওয়েস্টার্ণ মিউজিক বেজে উঠল! ইফতেখার হাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাল এলিসকে এস। লেটস ডান্স।

এলিস তাকাল রিণার দিকে। রিণা মাথা নাড়ল—আমি এখন নাচব না। তোমরা নাচ। আমি দেখব। এনজয় করব।

ইফতেখার ততক্ষণে বীটের সঙ্গে তাল মিলাতে শুরু করেছে। এলিস তার সঙ্গে পা মিলাল। এলিস আজ স্কার্ট পরেছে। ওর সুডৌল সুগঠিত পা আর সুন্দর শরীর স্পন্দিত হচ্ছে। বেয়ারা চায়ের ট্রলি নিয়ে এল। এক পলক তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। এই বাগানে সে ইংরেজ সাহেবদের আমল থেকে কাজ করছে। সাহেব মেমরা বাড়িতে নাচত না। বড়দিনের রাতে আর ইংরেজী নতুন বছরে লংলা ক্লাবে অনেক বড় পার্টি হত। সারারাত খানা পিনা নাচ। বিলেতী মেম সাহেবরা কখনও দেশী সাহেবদের সঙ্গে নাচত না। ইফতেখার নাচের তালে মনোযোগ রেখে বলল—ভাবী নাচের পর কিন্তু আমার চা চলবে না। অন্য জিনিস চাই।

বেয়ারাকে জীনের বোতল আনতে হুকুম করে রিণা মনে মনে কৌতুকের হাসি হাসল। ইফতেখারের কৃতিত্ব আছে বটে। নাচতে নাচতে হাসছে এলিস। রিণার ভালই লাগছে। এতক্ষণ বিশ্রী একাকিত্বের শূন্যতা তাকে রীতিমত অসুস্থ করে তুলেছিল। আয়া এসে খবর দিল—গোল কামরামে টেলিফোন বাজছে।

ড্রইংরুমে এসে টেলিফোন ধরল। ওপার থেকে হেলেন কথা বলল—

এই যে ক্লিওপেট্রা। ব্যস্ত না কি? চলে এস। তাস নিয়ে বসে আছি। গোমেজ সীলেটে গেছে। খুব বোর ফিল করছি।

রিণা হাসল—তুমি চলে এস না। এখানে ইফতেখার আর এলিস আছে।

—কোথায় ওরা?

—বারান্দায়। ওরা নাচছে।

—আই সী! হেলেনের কণ্ঠ শীতল বিদ্রূপ নামল—শোন, ইফতেখার ওকে নিয়ে যতই মাতামাতি করুক, বাট ইফতেখার আলম ইট'স নট ইওর কাপ অব টি। ইংলীশ মেয়েরা অত কাঁচা নয়।

—ওঃ এটা কিছু নয় হেলেন।

—অনেক কিছু রিণা। ইফতেখারের আর্মবিশানটা অন্য দিকে।

হেলেনের ইঙ্গিত এড়িয়ে টেলিফোনে বিদায় নিল রিণা। হেলেনের জ্বলবার কারণ আছে। তবে ইফতেখারের অ্যামবিশান কোন্ দিকে তার কিছুটা আঁচ রিণা পেয়েছে। আশরাফের বিরুদ্ধে রেসিডেণ্ট ডাইরেক্টরের কাছে কিছুদিন আগে যে অভিযোগপত্র গিয়েছিল, ইফতেখারের কিছু হাত ছিল তাতে। সেটা মিটেই গেছে। কারণ কোম্পানী আশরাফকে পছন্দ করে। রিণা বারান্দায় ফিরে এল। মিউজিক তখনও চলছে। এলিস আর ইফতেখার ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে চুমু খাচ্ছে। রিণা হাসি মুখে বলল—একস্‌কিউজ মী।

দুজনের বন্ধন শিথিল হল। রক্তিম মুখে চেয়ারে বসে পড়ল এলিস। হাসল একটু—সুন্দর কাটল বিকেলটা।

বেয়ারা এল—মেমসাহেব। পাগ্‌লাপানি লায়া।

জীনের বোতলটা নিয়ে এলিসকে ঢেলে দিল। লেবুর টুকরো হাতে নিয়ে বলল—লেবু।

এলিস মাথা কাত করল—ইয়েস। জীন উইথ লাইম আমি পছন্দ করি।

এলিসকে গ্লাস দিয়ে ইফতেখার হাসল—ভাবী এ ব্যাপারে পিউরিটান। একেবারে রোমান ক্যাথলিক।

বাইরে দিনের ঘোলাটে আলো মুছে গেছে। বৃষ্টি নেই। হাইডেনড্রার পাঁপড়িতে জমে আছে বৃষ্টির ফোঁটা। বারান্দার নীয়নের আলোয় ফোঁটাগুলো সবুজ পান্নার মত ঝিকঝিক করছে। ফুলগুলো সকালে যখন ফুটেছিল তখন ছিল ধবধবে সাদা। এখন রং পালটে বেগুনী হয়ে উঠেছে। খেয়ালি মেয়ের মত সারাদিন রং বদলায় হাইডেনড্রার গুচ্ছ। রিণা আবার মনে মনে হাসল। আবহাওয়ার প্রভাব যে যতই রং বদলাক না কেন সবারই একটা নিজস্ব রং বোধহয় থাকে। এলিস এখানে এসে যে রঙে

রঙিন হয়ে উঠেছে সেটাই কি ওর নিজস্ব রং। আগে একজন ইংরেজ এ দেশে যখন আসত তখন তার পরিশীলিত সভ্যভব্যতার খোলসটা পথেই ফেলে দিত। আশরাফের মতে দূরত্বের ব্যবধান দিয়ে কালো মানুষগুলোকে তারা বুঝিয়ে দিত শাসক আর শাসিতের সম্পর্ক। আজকে যে এলিস এখানে একজন কালারড ছেলের সঙ্গে দু'চার দিনের ঘনিষ্ঠতায় সুন্দর সময় কাটাচ্ছে, ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে সে হয়তো ওখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক একজন বাংলাদেশীকে এড়িয়ে যাবে। কালার বারে এসে শেষ আশ্রয় নিয়েছে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল মানসিকতা। এলিসের গালে চোখে রং ধরেছে। রিণা বলল—রবার্টের ওখানে তাহলে ভালই লাগল তোমার এলিস !

তরল মাদক দ্রব্যের প্রভাবেই বোধহয় এলিস নিজস্ব রংয়ে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ আগের ইফতেখারের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করল—হি ইজ ক্রেজী। ওর মাথায় কেবল চায়ের পোকা কিলবিল করছে। ওয়েল 'ইট'স গুড। তবু বিং অ্যান ইংলিশম্যান রবার্ট ওরকম বিশ্রীভাবে থাকে কেন ! আশ্চর্য !

ইফতেখার খুব হালকা গলায় হেসে উঠল—এবার স্বীকার করলে তো রবার্ট একটা পাগল। আমাদের রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর তো ওর নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠে। বদ্ধ পাগল একটা। জানো ওর বউ ওর জ্বালায় সুইসাইড করেছিল।

—সুইসাইড ! চমকে উঠল এলিস।

গ্লাসে সীপ করে ইফতেখার বলল—অদ্ভুত লোক ওই রবার্ট। চাকরি নিয়ে আসবার পর পঁচিশ বছরের মধ্যে একবারও দেশে যায়নি। অথচ ব্রিটিশ ম্যানেজারদের কোম্পানী থেকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিল। বছরে ছ'মাস তারা উইথ ফুল পে ছুটি কাটাতে পারত ইংল্যাণ্ডে। তার ওপর ছিল যাওয়া আসার ফ্রী প্যাসেজ। তবুও ও এই চা বাগানে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকতো বছরের পর বছর।

- আর ওর বউ ? এলিস বিস্মিত প্রশ্ন করল।

—ওর বউ মাঝে মাঝে যেত। ওদের একমাত্র মেয়ে ডোনাকে পাঁচ বছর বয়সে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে পড়ত ও। জানো নিশ্চয়ই ব্রিটিশ ম্যানেজারদের তিনটে পর্যন্ত ছেলেমেয়ের খরচ বাবদ এলাউন্স দিত কোম্পানী। মেয়েটাকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবার পর মিসেস রবার্ট হল একেবারে লোনলী হয়ে গেলেন। রবার্ট ছিল অসামাজিক খাপছাড়া লোক। কোনদিন ক্লাবে যেত না। তাই মিসেস হলেরও যাওয়া হয়ে উঠত না ক্লাবে। তাছাড়া রবার্টকে নিয়ে অন্য সব বাগানের ব্রিটিশ ম্যানেজাররা হাসাহাসি করত। সেই লজ্জায় মিসেস হলও একরকম সব গ্যাদারিংয়ে যাওয়া ছেড়ে

দিয়েছিলেন। অথচ বাড়িতেও স্বামীর সঙ্গ পেতেন না। রবার্ট সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বাড়িতেও তার কারো সঙ্গে কথা বলার সময় ছিল না। বাড়িতে সময় কাটত বইয়ের রাজ্যে, আর রিসার্চের কাজে। কি ফানি একটা আইডিয়া ঢুকেছিল ওর মাথায়। ওর বিশ্বাস ভালো রিসার্চ হলে এখানে না কি খুব ভাল কোয়ালিটির চা উৎপন্ন করা যাবে। পার একরে না কি উৎপাদনও অনেক বেশি হবে। বেচারা মিসেস হল, নিঃসঙ্গ জীবনের জ্বালায় প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। শেষের দিকে একরকম অ্যাবনরমাল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের জিনিসপত্র আছড়ে ভাঙছেন। চীৎকার করতেন। একেবারে ভায়োলেন্ট যাকে বলে। একা একা ড্রিংক করতে করতে অ্যালকোহলিকও হয়ে উঠেছিলেন। একদিন রবার্ট বাগান থেকে ফিরে দেখল মিসেস হল নিজের বাথরুমে গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলে আছেন।

—ওঃ কি সাংঘাতিক ব্যাপার। এলিস শিহরিত হল।

রিণা খুব আস্তে বলল—আমার মনে হয় এই গ্রীণ লাইফে তাহলে এমন হিংস্র কুয়ালিটি আছে যা মানুষকে পাগল করে দেয়। মানুষ আত্মহত্যা করে।

এলিস ফ্যাকাশে মুখে বলল—আমি তা হলে এখানে বেশিদিন থাকছি না।

ইফতেখার হেসে উঠল জোরে। উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করল এলিসকে —ওঃ তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। অবকাশ যাপন করতে যারা আসে তাদের জন্য এটা চমৎকার জায়গা। বি ম্যারী। এনজয় ইওর টাইম। ইট'স নো প্রবলেম ফর ইউ।

—তোমার জন্যও নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিয়ে করছ। রিণা এতক্ষণে হাসল।

ইফতেখার ওর স্বাভাবিক উৎফুল্লতায় হৈ চৈ করল– ওঃ আমি চমৎকার আছি। আসলে আমি ম্যানেজার হতে চাই। বাট নট দা ম্যান অব টি। হঠাৎ ঘড়ি দেখে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল ইফতেখার—গুড গুড। প্রায় সাড়ে সাতটা এলিস লেট'স গো। তোমাকে গেস্ট হাউসে পেঁাছে দিতে দেরি করে ফেললাম।

রিণাকে আবার নীরব শূন্যতায় রেখে ওরা চলে গেল। আলো ঝলমল বাংলোটা অন্ধকারের সমুদ্রে নিঃসঙ্গ জাহাজের মত ভেসে আছে। লনের সবুজ আলো সুইমিংপুলের স্বচ্ছ পানিতে প্রতিফলিত হয়ে কেমন শীতল চোখের দৃষ্টির মত স্থির হয়ে আছে। কেমন গুঁড়ো গুঁড়ো বিষণ্ণতা ঝরতে লাগল রিণার মনে।

ডিপ্রেশানকে আমল না দেবার জন্য রিণা ভাবতে চেষ্টা করল ব্যাংকে

তার ফিক্স ডিপোজিটের পরিমাণ দ্বিগুণের কাছাকাছি এসেছে কি না। একটা পছন্দসই বাড়ি করবার মত টাকার অংকে এখনও পেঁছায় নি। অবশ্য আশরাফ যদি পার্মানেন্ট ম্যানেজার হয়ে যায় তাহলে আরও কিছু আয় বাড়বে। আর কয়েক বছর পরে এ গ্রেডের ম্যানেজারশীপটা পেয়ে গেলে তো কথাই নেই। টাকাও বেশি আসবে। তাছাড়া সপরিবারে ইয়োরোপে বেড়াতে যাবার ফ্রি টিকিট। ক্লাবে তখন রিণা একেবারে ফার্স্ট লেডীর মত গর্বিত পা ফেলতে পারবে। জুনিয়র ম্যানেজারদের বউর ঈর্ষা উপভোগ করবে। অথচ আশরাফ। ক্যারিয়ার নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। মাথা ব্যথা ওর চা নিয়ে। এসব নিয়ে রিণার পরামর্শও আশরাফ পছন্দ করে না। এখন রিণার রাগ হল। রিণার মাঝে মাঝে একটা মোহাচ্ছন্ন ইচ্ছা জাগে। একটি শিশুর মিষ্টি মুখের মোহ। আস্তে নিঃশ্বাস চাপল রিণা। আশরাফ রিণার সেই ব্যথার জগতটা নিয়ে বোধহয় ভাবে না। আর তাই বোধহয় ভাবে না রিণার অন্য একটা কিছু অবলম্বন দরকার। যদি একদিন রিণাও মিসেস রবার্ট হলের মত...। প্রচণ্ড ভয়ের শিহরণে রিণা উঠে দাঁড়াল। ভূতুড়ে ভাবনাটাকে চাপা দেবার জন্য দ্রুত হাতে হেলেনের নাম্বার ডায়াল করল। তখনি আশরাফ ফিরল। বারান্দায় পা রেখেই চীৎকার করে ডাকল—বেয়ারা।

বেয়ারা ছুটে গেল—জ্বী সাহাব।

—পাগ্‌লা পানি লাগাও। হুইস্কী।

জুতোর ভারি শব্দে বারান্দা কাঁপিয়ে আশরাফ ড্রইংরুমে এল। ড্রইংরুম স্নিগ্ধ আলোয় ভরা। টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে রিণাকে দেখল আশরাফ। সারাদিনের কর্ম উত্তেজিত স্নায়ুতে কিছুটা প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ল। ফিকে সবুজ স্লীভলেস ব্লাউজ আর সাদা সিল্ক পরা হালকা দেহের রিণাকে খুব ফ্রেশ লাগছে। আশরাফ কাছে এল—হ্যালো ডারলিং। হাত বাড়িয়ে রিণাকে কাছে টানল আশরাফ। রিণা সযত্ন আত্মসমর্পণের মধ্যেও অভিমানী হল—আমার কথা কি তোমার মনে আছে!

শাখের মত সাদা রিণার গলায় একটু ঠোঁটের স্পর্শ দিল আশরাফ। হাসল—স্মার্ট লেডী। তুমি মাঝে মাঝে একেবারে ছোট বাচ্চা হয়ে যাও।

আশরাফের বুকের বোতামে আঙুল রাখল রিণা—বাচ্চার অভাবটা তো মাঝে মাঝে পূরণ করা দরকার।

আশরাফ রিণার চোখে তাকাল। রিণার মুখের রেখায় ক্ষোভ বা অনুযোগ নেই। কোমল দৃষ্টিতে কিছু বিষণ্ণতা মাত্র। আশরাফ তরল কণ্ঠেই বলল—কেন। এত তোমার বন্ধু বান্ধব। হাউসী, কাচচু, রামি, কফি মনিং।

—সিলি। আমার ভাল লাগে না। একটু থেমে আবার বলল—তুমি

বদলে গেছ।

রিণার হাতটা শার্টের বোতাম থেকে আশরাফের কাঁধে উঠে এসেছে। আশরাফ হাসল—তুমি বদলাও নি ?

রিণা এবার আরো একটু অভিমানী হল—সেটা কেন জান না ? যদি ওই তত্ত্বটা সত্য হয় যে 'এভরি অ্যাকশান হ্যাজ এ রি-অ্যাকশান' তাহলে ?

—তাহলে আর কি। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা দু'জনের ক্ষেত্রেই সত্য। কে কাকে বদলে যেতে বাধ্য করেছে সেটা কথা নয়। তবে পরিবেশে সব বস্তুই কিছুটা পরিবর্তিত হয় যেমন.. ...

রিণা বুঝল আশরাফ সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। বলল—ওসব কথা থাক। তুমি কাপড় চেঞ্জ কর। মিসেস জুবেরী আর হেলেন আসবে তাস খেলতে।

রিণা খুব আবেগহীন ভঙ্গীতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। আশরাফ বসে পড়ল সোফায়। কেন এমন হয়। যখনই সে রিণার কাছে একটু স্নিগ্ধ-তার প্রার্থনায় হাত বাড়ায়, রিণা তার নিজের জগতে সরে যায়। একটু আগে রিণার জন্য মমতার একটা ঝরণা ঝরছিল তার বুকে। রিণা সেখানে একটা বড় পাথর ঠেলে দিল। আশরাফ চীৎকার করে ডাকল আবার—বেয়ারা !

বেয়ারা ট্রে নিয়ে এল। প্রচণ্ড ধমক দিল আশরাফ—এতক্ষণ কি করছিলি ?

—সাহাব ! ঠাণ্ডা বাক্সা থেকে কেসটা খুলতে পারছিলাম না।

আশরাফ আর কথা বলল না। গ্লাস তুলে নিল। লাল কার্পেটের ওপর সকালের শুভ্র হাইডেনড্রার ফুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল রিণা। এখন নেই। ঘরে চলে গেছে। বেয়ারা মাথা নীচু করে বসে আশরাফের জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। লোকটার মাথা নোয়ান ঘাড় গোজা কুণ্ডলী পাকান ভঙ্গীতে শরীর ঘিন ঘিন করে উঠল আশরাফের। পা সরিয়ে নিল সে—এই বুদ্ধু।

বেয়ারা ভীত সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে মুখ তুলল—সাহাব। কসুর হয়ে গেছে। আর হবে না। ঠাণ্ডা বাক্সটা......

ওর কথা শেষ হল না। আবার প্রচণ্ড ধমক দিল আশরাফ—কিসের কসুর ? বল ?

—পাগলা পানি আনতে দেরী হয়ে গেছে হুজুর ! মাফ করে দাও সাহেব।

আশরাফ ঠোঁটের কাছ থেকে গ্লাস সরাল। স্থির দৃষ্টিতে বয়সী গুটিয়ে যাওয়া লোকটাকে দেখল। দুর্বোধ্য এক যন্ত্রণা অনুভব করল

নিজের মধ্যে। কি এক রাগ তাকে কেবল জব্দ করছে। বলল—ইংরেজ সাহেবরা তোদের কতগুলো কুত্তা বানিয়ে রেখে গেছে। পা চাটতে শিখিয়ে গেছে, পিঠের হাড্ডিটা বাঁকা করে দিয়ে গেছে। তাই না রে ?

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে কলের পুতুলের মত মাথা নাড়াল বেয়ারা—জ্বী সাহাব।

আবার ধমক দিল আশরাফ—কথায় কথায় জ্বী সাহাব! জ্বী সাহাব করিস কেন। দাঁড়া। সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়া।

বেয়ারা ভীষণ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। কি হয়েছে সাহেবের। পাগলা পানি খেলেও সাহেব সহজে মাতাল হয় না। উজ্জ্বল লাল রংয়ের পল্কা ডটের শাড়ি পরে রিণা এসে দাঁড়িয়ে ছিল আশরাফের পাশে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল—এই! কি হয়েছে তোমার! বাইরে থেকে ড্রিংক করে এসেছে না কি ?

আশরাফ আবার শান্ত সংযত মানুষ হয়ে গেল। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—কিছু না।

তারপর খুব ক্লান্ত স্বরে বলল—শিবুয়া। চপ্পল নিয়ে আয়।

বেয়ারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চপ্পল আনতে গেল। রিণা হাত রাখল আশরাফের কাঁধে। দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল—হয়েছে কি তোমার ?

আশরাফ বিষণ্ণ আত্মমগ্ন।—কিছু হয় নি। আর যদি কিছু হয়েও থাকে তা তুমি বুঝবে না।

রিণা আর কথা বাড়াল না। আশরাফ আবার দূরের মানুষ হয়ে গেছে। রিণা এখন কিছুতেই তার চিন্তার সীমানায় পেঁছতে পারবে না। রিণা বারান্দায় চলে গেল। গ্লাসটা আবার ভরে নিল আশরাফ। ম্যাণ্টেল-পীসের ওপরের অয়েল পেনটিংয়ে শূন্য চোখে তাকিয়ে গ্লাসে সীপ করল। ডিরেক্টরের সঙ্গে আজ তার একরকম কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। প্রোডাকশান আশা অনুযায়ী বাড়ছে না। এই নিয়ে উদ্বেগের অন্ত নেই। দোষটা যেন লোক্যাল ম্যানেজমেণ্টের। মাথাটা জ্বলে উঠেছিল আশরাফের। মুখের ওপরই ডেভিডকে বলে দিয়েছে আশরাফ যে একটা গরুকে এক সের খেতে দিয়ে আধমণ দুধ তার কাছে আশা করার মত বোকামি আর কি থাকতে পারে। কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টররা সত্যিই কি এত বোকা। তারা তো একরকম সবই জানে। আটটা বাগানের অর্ধেক থেকেই তো পাতা উঠছে না। উঠবে কি! পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে একই গাছ থেকে পাতা তুললে তার জীবনী-শক্তি কত আর থাকবে। কেমন করে তারা অজস্র নতুন পাতা উপহার দেবে? মাটির দুর্বলতায় গাছের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাগানে রেড রাষ্ট ডিজিজ, চারকোল স্ট্যাম্প রোগে বাগান আক্রান্ত হচ্ছে। শেড-ট্রিগুলো বদলে নতুন

সেকশান তৈরি না করলে বুশের সংখ্যা কমতেই থাকবে। কি করবে আশরাফ ! অথচ বাগানগুলোতে নতুন প্ল্যানটেশানের ঝামেলায় যেতে কোম্পানী রাজী নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ইণ্ডিয়ার তুলনায় বাংলাদেশে ইনভেস্টমেণ্টের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে কোম্পানী। স্বল্প মেয়াদী ইন-ভেস্টমেণ্ট পলিসি নিয়েছে। নতুন বাগান বসালে ইনভেস্টমেণ্টের রিটার্ণ পেতে দেরী হবে। কুলিদের তলব বাড়াতেও তারা রাজী নয়। কুলি ব্যারাকের পাকা কনস্ট্রাকশনের কথাটা উড়িয়েই দিল মিঃ ডেভিড। আশরাফ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে অনেক। নিজেদের বাগানের পাতা দিয়ে তো চলে না। যেসব দেশী বাগানে নিজেদের ফ্যাক্টরী নেই সেসব বাগান থেকে পাতা কিনে কোনরকমে প্রডাকশন লেভেলটা মেইনটেইন করা হচ্ছে। অথচ কত কুলি বেকার হয়ে বসে আছে। সীজন চলে গেলে আরো হবে। এদিকে বাগানগুলোর রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, একটা ট্রাকটর এক বছরের বেশি চালান যায় না। গ্লাসের রঙিন পানীয়তে চোখ রেখে তিক্ত হাসল আশ-রাফ। চা বিক্রির পুরো টাকাটা আজকাল নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারে না বটে কোম্পানী তবে তা উসুল করে নেয় অন্যভাবে। প্রতিবছর ভিকেল, স্পেয়ার পার্টস মেশিনারী কিনবার জন্য প্রচুর টাকা চলে যায় ইংল্যাণ্ডে। এর পরও মিঃ ডেভিডের দাবী হচ্ছে মিনিমামা ইনভেস্টমেন্ট ম্যাক্সিমাম রিটার্ণ। কথাটা মেনে নেয় নি আশরাফ। প্রডাকশন না বাড়বার জন্য যে কোম্পানীর পলিসীই দায়ী মিঃ ডেভিডকে সে কথা বলতে বাধ্য হয়েছে আশরাফ। দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে ন'টা বাজল। আশরাফ গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। আজ কুলিদের পঞ্চায়েত এসেছিল। নতুন বাগানের আবাদ চায় তারা। তা না হলে কুলিদের রুজী মারা যাচ্ছে। ডিরেক্টর ওদের ব্রেন ওয়াশ দেবার হুকুম দিয়েছে। অবশ্য এবার পূজোর খরচ সম্পূর্ণ কোম্পানী দেবে জানান হয়েছে। আর পূজোর বোনাসও মাথা পিছু পাঁচ টাকা এবারের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আশরাফ আবার একটু হাসল। এ যেন বাচচাকে লজেন্স দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে? প্রশ্নটা করতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল আশরাফ। তখনি ইফতেখার আর ইরশাদ ঢুকেছিল রুমে। ড্রইংরুমে ঘড়িটার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। বারান্দায় এল আশরাফ। নিস্তব্ধ হয়ে একা বসে আছে রিণা। আশরাফের মন কোমল হল। আস্তে ডাকল—

রিণা। রিণা নিঃশব্দে অনড়।

আশরাফ কাছে এল—তোমার তাসের পার্টনাররা এল না যে।

এতক্ষণে নির্বিকার জবাব দিল রিণা—টেলিফোনে নিষেধ করে দিয়েছি। যদি তোমার অসুবিধে হয়!

আশরাফ [illegible] — [illegible] আমি [illegible] তোমার সুবিধের জন্যই [illegible]

রিণা ঝলসে উঠল— [illegible] আমার সুবিধে দেখতে!

আশরাফ [illegible] তোমার আকাঙ্ক্ষাই [illegible]।

কি বলতে চাও। কি মনে কর তুমি আমাকে।

মনে করি তুমি একজন চা বাগানের ম্যানেজারের স্ত্রী।

রিণা [illegible] ফেলল তুমি কখনও আমার অবস্থা [illegible] এই [illegible] একা একা আমার কি প্রচণ্ড [illegible] দিন কাটে! [illegible] মত...একদিন...।

আশরাফ চমকে উঠল। রিণা কাঁদছে। রিণা এখন একজন দুঃখী সন্তানহীনা নারী। রিণা রোগাক্রান্ত চা গাছের মত অসুস্থ। রিণার [illegible] না। আশরাফ রিণার পিঠে [illegible] রিণা [illegible]। রিণার পিঠে [illegible]

লংলা ক্লাবে [illegible] বিদায় উপলক্ষে বড় পার্টি [illegible] আশরাফ। খরচটা অবশ্য এন্টারটেইনমেন্ট [illegible] চমৎকার দেখাচ্ছে। [illegible] ড্রিংকের গ্লাস [illegible] লং ড্রেস পরেছে। বলল [illegible] আমি কিন্তু [illegible]

রিণার চোখের [illegible] ইউ ফর দা কমপ্লিমেন্ট [illegible] কত দুর্ভাগ্য [illegible] জানে।

ওদের [illegible] মিসেস [illegible] এই যে ম্যাডামরা! কি এত মজার কথা হচ্ছে!

হেলেনের দিকে [illegible] তোমার [illegible] ফিগারের রহস্যটা একটু [illegible] না।

হেলেন [illegible] গ্লাসটা ঠোঁটে [illegible] হাসল [illegible] কেন। আগে রিণার কাছে [illegible] এলিজাবেথ [illegible] মিষ্টি মুখ কি করে পেল ও। কোন বস ফ্রেন্ড না থাকলে [illegible] পেলেই কি এত বিউটি আসে!

রিণা হাসিমুখে তাড়া দিল হেলেনকে—দুঃখের বিষয় তুমি থাকতে আমার আর চান্স নেই। আমাদের হেলেন অব ট্রয় যে কত বুকের ওল্ড ফ্লেম তার একটা ফর্দ তৈরি করব ভাবছি।

হেলেন গোমেজ আর মিসেস ইরশাদ হাসতে লাগল। মিসেস জুবেরী প্রখর মেকআপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গী ঠোঁটে ফুটিয়ে বলল —এই ইফতেখারের ব্যাপারটা কি। ডিরেক্টরের মেয়েটাকে তো দেখছি একে-বারে মুঠোয় ভরে ফেলেছে।

মিসেস ইরশাদ সাদাসিধে ভাবে বলল- ব্যাপার-ট্যাপার আর কি! ওরা দুজনেই জাস্ট হ্যাভিং গুড টাইম। এলিস চলে গেলেই ও অন্য কিছু নিয়ে মেতে উঠবে।

মিসেস জুবেরী বলল- কি যেন আবার বিয়ে-টিয়ে.

তিনজনের উঁচু হাসিতে মিসেস জুবেরীর কথা ঢাকা পড়ে গেল। হেলেনের দৃষ্টিটা কয়েকবার বাঁকা হয়ে একটু দূরে দাঁড়ান এলিস আর ইফতেখারকে বিদ্ধ করলেও মুখে হাসি ধরে রাখল সে। হাসতে হাসতে বলল—ম্যাডাম বিলেতের মেয়েরা আজকাল এ ব্যাপারে যথেষ্ট হুঁশিয়ার। এদিক দিয়ে বরং আমাদের দেশের কিছু মেয়ে ক্রেজী হয়ে উঠেছে। বাংলা-দেশে বসেও বিদেশী ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তারা উৎসাহী। মেয়ের বিদেশী বয়ফ্রেন্ড নিয়ে মায়েরাও কম গর্ব বোধ করেন না।

মিসেস জুবেরীর মুখটা কাল হল। তাদের একমাত্র মেয়ে সাইকোলজীতে অনার্স পাস করে ফ্রেঞ্চ অ্যামবেসীতে চাকরি নিয়েছে। কিছুদিন আগে এক ফরাসী ছেলে বন্ধু নিয়ে বাগানে বেড়াতে এসেছিল। হেলেন কি খোঁচাটা তাকেই দিল না কি? কাটা কাটা জবাব দিল মিসেস জুবেরী—তারা তো আনম্যারেড মেয়ে। তা ছাড়া এ যুগের ইয়ং গার্ল। ম্যারেড মহিলারাই কত কি করছে।

পাল্টা খোঁচাটা হেলেন বুঝল কি না সেটা দেখবার জন্য মিসেস জুবেরী হেলেনের মুখে তাকাল। হেলেন আর ইফতেখারকে নিয়ে কিছুদিন আগে একটা স্ক্যান্ডাল হয়েছিল। কথাটা ঘুরিয়ে দিল রিণা। বলল-এই হেলেন! চল এবার বড়দিনে আমরা একটা মীনা বাজার অ্যারেঞ্জ করি।

জরির কাজ করা শাড়ির আঁচল কার্পেটে লুটিয়ে কথা বলল মিসেস ইরশাদ—এই জঙ্গলে মীনা বাজারে আসবে কারা শুনি? গার্ডেনের কুলি কামিন ছাড়া আর মহিলা পাবে কোথায়?

হেলেন বলল—ওঃ দ্যাট'স নট এ প্রবলেম। আমরা দরকার হলে এটা ওপন্ টু অল রাখব। আই মীন জেন্টসদেরও নেওয়া হবে।

মিসেস জুবেরী রুমালে আলতো কপাল মুছে বলল—দেখুন মিসেস

আশরাফ। আপনি কিন্তু নেটিভ গার্ডেনের ম্যানেজারদের ওয়াইফদের ডাকতে পারবেন না।

মিসেস ইরশাদ একটু কোণাচে হাসল—আজকাল আবার নেটিভ গার্ডেন কি। সব বাগানেই তো বাঙালী ম্যানেজার।

মিসেস জুবেরী প্রতিবাদে মুখর হল—ওঃ নো নো। কোম্পানীর গার্ডেনগুলোর আলাদা একটা প্রেসটিজ আছে।

রিণা হঠাৎ মিসেস জুবেরীর ব্রেসলেট জোড়ার প্রশংসা শুরু করল। হাসি চেপে চোখ ঘুরিয়ে নিল মিসেস ইরশাদ।

খাবার সময় এলিস খুব আস্তে ইফতেখারকে বলল—দেখেছ রবার্ট এসেছে। কি আশ্চর্য আমি এতক্ষণ ওকে খেয়ালই করি নি।

ইফতেখার বিরক্ত হল—দেখো না একটা ফরম্যাল পার্টিতে এসেছে। অথচ পোশাকের কি অবস্থা! কেন যে আশরাফ ওকে ডাকে। মিঃ ডেভিড তো ওর সম্পর্কে ভীষণ বিরক্ত। একটা ওয়ার্থলেস লোক।

ইফতেখার অতিমাত্রায় বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে ভুলে গেল সে নিজে কিছুদিন রবার্ট হলের অধীনস্থ ম্যানেজার হয়ে কাজ করেছে। রবার্ট তার প্রতি কি অসম্ভব ভদ্র ছিল। বলতে গেলে রবার্টই তাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে। অথচ এবার আশরাফকে ফাসাতে গিয়ে রবার্টকেও দায়ী করেছে ইফতেখার। রবার্টের অব্রিটিশজনোচিত আচার আচরণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মিঃ ডেভিডকে শুনিয়েছে। রবার্টের প্রভাবেই আশরাফ বাগানের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করছে। তা না হলে কুলিদের এত সাহস হয় তারা ডিরেক্টরদের কাছে দাবী জানাতে আসে। সেদিন ডেভিডের ঘর থেকে আশরাফ বেরিয়ে যাবার পর পরই ইফতেখার ডিরেক্টরের খারাপ মুডের সুযোগটা গ্রহণ করতে ভোলে নি। মিঃ ডেভিডকে ইফতেখার বোঝাতে সমর্থ হয়েছে যে ম্যানেজারের ত্রুটিপূর্ণ অ্যাডমিনিস্ট্রেশানই লেবারদের মাথা তুলবার জন্য দায়ী। রবার্ট রাতদিন কোম্পানীর বিরুদ্ধে পরামর্শ দিচ্ছে আশরাফকে। মিঃ ডেভিড কতদূর প্রভাবিত হয়েছে কে জানে। ইফতেখার মনের গোপন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাটা অনুভব করল এখন। সার্ভিস রুলে তো আর আগের কড়াকড়ি নেই। ইফতেখার সিনিয়র ম্যানেজারের পোস্টটা পেয়েও যেতে পারে।

এলিস এগিয়ে এল রবার্টের সামনে—হ্যালো!

রবার্ট হাত বাড়াল—হ্যালো—

লোকটার অম্লান হাসি ভাল লাগল এলিসের। ব্রিটিশ হিসেবে না

হলেও একটি আধুনিক তরুণী হয়ে রবার্টের জীবনযাত্রাটা বেশ কৌতূহলী আকর্ষণ বোধ করেছে এলিস। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে তরুণ সমাজের উশৃংখল উদ্দীপনা নিয়ে ইংরেজ সমাজবিদ্‌রা যতই মাথা ঘামাক নতুনকে কে বেঁধে রাখবে। রবার্ট সারা মুখে হাসি নিয়ে বলল—তোমার জন্য আমি কতগুলো অর্কিড নিয়ে এসেছি। খুব রেয়ার ক্যালেকশান। সংগে নিয়ে যেতে পারবে।

এলিস ধন্যবাদ জানিয়ে হাসল। রবার্টের বাগানে অর্কিড দেখে খুব পছন্দ করেছিল এলিস।

অর্কিড নিয়ে গল্প জুড়ে দিল রবার্ট। অর্কিডের দেশ জাপানে নানা ধরনের অর্কিড দেখেছে সে। তবে খাসিয়া জয়ন্তিয়া এলাকায় কিছু বিশিষ্ট ধরনের অর্কিড পাওয়া যায়। এলিস এক সময় বলল আমি বোধহয় আরো কিছুদিন থেকে যাচ্ছি।

রবার্ট খুশি হল ভেরি নাইস। আমার টি বুশগুলোতে প্লাকিং শুরু করব। দেখে যেতে পারবে। তোমাকে কিছু চাও দিয়ে দিতে পারব। তুমি লেমন গ্রাস পছন্দ করেছিলে। কিছু ঘাসও এনেছি। দেশে নিয়ে যেও।

এলিস অবাক হল। রবার্ট যেন এলিসকে সব কিছু দিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল। আশ্চর্য। অথচ এই লোকের স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। একে নিয়ে ইফতেখার ঠাট্টায় মুখর। তার বাবা মিঃ ডেভিড বিরক্ত। বাবার কাছেই শুনেছে এলিস রবার্টকে কোম্পানী বাধ্যতামূলক অবসর করিয়ে দিয়েছে। বাবার মতে ও না কি একটা ট্রাবলসাম লোক। রবার্ট বলল—মিঃ ডেভিডতো চলে যাচ্ছেন।

-হ্যা। কথা হল বাবার সংগে?

-হল।

রবার্ট একটু চুপ করে বলল উনি বোধহয় আমাকে পছন্দ করেন না। অথচ খুব জরুরী একটা কথা ওকে বলতে এসেছিলাম।

-কি কথা?

রবার্ট আবার উদ্দীপ্ত হল—বলছিলাম টেরেস সিস্টেম গার্ডেন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ওতে মাটির ক্ষতি। গাছেরও ক্ষতি। মাটির উর্বরতা কমে যায়। ফলে নিউট্রেশানের অভাবে বুশগুলোও দুর্বল হয়ে পড়ে। বেশি পাতা দিতে পারে না।

—কি বললেন বাবা?

—উনি ট্র্যাডিশনাল চিন্তাটা ছাড়তে পারছে না। কারণ স্পেনসার কোম্পানীর সবগুলো বাগানই টিলার গায়ে। টেরেস সিস্টেম বাদ দিতে গেলে নূতন করে বাগান বসাতে হবে। সেটা তিনি সমর্থন করেন না।

—কি করে করবেন ! তা হলে যে কোম্পানীর লস যাবে।

কমার্শিয়াল আউটলুকে এটাকে আপাতত লোকসান মনে হলেও চা চাষের খাতিরে একে মানতেই হবে। পরে এর বেনিফিট আসবে। এদেশের চায়ের কোয়ালিটি ভাল হবে।

আপান চা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না বুঝি ?

রবার্ট হাসল—ভাবি ! জানো ডোনা...

এলিস অবাক হল। তারপর হাসল—মিঃ হল আপনি এত অ্যাবসেন্ট-মাইনডেড। আমাকে ক'দিন তো দেখলেন। আমার নাম এলিস...ডোনা নয়।

রবার্টের দৃষ্টিটা ছেলেমানুষের মত হয়ে গেল। মুখের রেখা অসহায় আর করুণ হয়ে দেখাল। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়াল। এক্সকিউজ জানিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। রবার্ট বেরিয়ে যাবার পরই এলিসের মনে পড়ল ইফতেখার বলেছিল বটে ওর মেয়ের নাম ডোনা।

মিঃ ডেভিড বার্গম্যান রবার্টকে দেখে খুশি হন নি। মুখের হাসি মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণে রেখে ঠাণ্ডা গলায় হ্যালো বলেছেন। রবার্ট অনেকক্ষণ কি সব বকর বকর করল। সে সবে কোন মন্তব্য করেন নি মিঃ ডেভিড। রবার্ট চলে যাবার পর অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন তিনি। ভূতপূর্ব গার্ডেনাররা কোম্পানীর ডিরেক্টররা কেউই রবার্টের আচরণে সন্তুষ্ট নয়। মনে মনে বললেন আমাদের বাগানের সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যই এদেশে রয়ে গেছে রবার্ট। নিজের মাথা নীচু করে ভবঘুরে হিপ্পি সেজে বসে বাগানের ক্ষতির চেষ্টায় আছে। বলতে এসেছে টেরেস সিস্টেম বাদ দিতে হবে। কোম্পানীর তো আর মাথা খারাপ হয় নি। বাংলাদেশের মত একটা গোলমেলে দেশে ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে যাবে কোম্পানী কোন্ দুঃখে। এইসব আনডেভেলাপড গরীব দেশগুলোর ইকনমিক পলিসীরই তো কোন স্থিরতা নেই। ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করেছে। যতদিন এ দেশ তাদের কলোনী ছিল ততদিন বাগানের দীর্ঘমেয়াদী ভালমন্দ নিয়ে তারা অনেক মাথা ঘামিয়েছে। সীলোনের বাগান হাতছাড়া হবার পর কোম্পানী সাবধান হয়েছে। উদ্ভট রবার্ট না আবার এর পাবলিসিটি করে বেড়ায়।

এ সম্পর্কে আশরাফকে ওয়ার্নিং দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন মিঃ ডেভিড। আশরাফ গম্ভীর হয়েই ছিল। মিঃ ডেভিড সেদিনের উত্তপ্ত ব্যবহারের রেশটা মুছে দেবার জন্যই বোধহয় একটু বেশি রকম ভাল ব্যবহার করছিলেন আশরাফের সঙ্গে। তবু তিক্ততার স্বাদটা আশরাফের মনকে

বিশ্রী করে রেখেছে। খাবার পর কফি সার্ভ করা হল। অনেকেই প্রচুর পান করে একটু অস্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেছে। মহিলাদের চপলতাও কিছু সীমিত। মিঃ ডেভিড বললেন—ইন্ডিয়াতে কফির চাষ করে বেশ ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। আমার মনে হয় এদেশে এ সম্পর্কে ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

জুবেরী বলল—ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া। খুব লাভজনক ব্যবসা হবে। আমরা না হয় একটা ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করে ফেলি। ইট'ইল বি এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট।

তরল পদার্থ পেটে পড়লেই জুবেরীর কথার ফোয়ারা খুলে যায়। আশরাফ হাসল—চায়ের মত কফির মার্কেটও এ দেশে নেই।

ইফতেখার বিরক্ত হল—এই এক জাত। ভাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। লোকে শুনলে হাসবে! যে দেশে চা তৈরি হয় সে দেশের লোকেই চা খায় কম।

যেন কোন মজার রসিকতা হল। জুবেরী জোরে হেসে উঠল—কাকের মাংস কি আর কাকে খায়!

আশরাফ জুবেরীর দিকে তাকাল—যুক্তিটা কিন্তু তোমার ধোপে টিকবে না। জাপান, চায়না, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, সব দেশে যেমন চা উৎপন্ন হয় তেমন কনজাম্পসনও হয়। একমাত্র এ দেশেই চায়ের বাজার লোক সংখ্যার তুলনায় সীমিত।

ইফতেখার কথা বলল—আজকাল তো দক্ষিণ আমেরিকাতেও চায়ের চাষ হচ্ছে। আফ্রিকা ইরানের চাও মন্দ নয়। বাংলাদেশ ছাড়া সব দেশের লোকই মোটামুটি চা বেশি খায়। তবে ইংল্যান্ডেই তো চা বেশি খাওয়া হয়।

মিঃ ডেভিড হাসলেন—ওয়েল, এর পেছনে কারণও রয়েছে। অনেক দেশের আবহাওয়ায় চা খাওয়াটা বেশ স্যুট করে গেছে। বাংলাদেশ তো শীত প্রধান দেশ নয়

জুবেরী সায় দিল—একজাক্টলী, এটাই আসল কারণ।

মিঃ ডেভিড বললেন—তা'ছাড়া হ্যাবিটের প্রশ্নও রয়েছে।

জুবেরী আবার সমর্থন করল জোরে- দ্যাট'স রাইট। এদেশের গ্রামের লোক চা তো ভাল করে চিনলই না। এরা ভাত খাবে। আম খাবে। কাঁঠাল খাবে। কিন্তু চা খাবে না।

আশরাফ মৃদু হাসল—আম কাঁঠাল জাম ভাতের মতই এদের ফুড। চায়ের মত বিলাস পানীয় বরং সেই তুলনায় কিছুটা ব্যয়বহুল ধরে নেয় এরা। দুধ চিনি...

ইফতেখার বাধা দিল—চা যে কেবল দুধ চিনি দিয়েই খেতে হবে এমন

কোন কথা নেই। চাকে তো বহু রকম প্রেপারেশনে খাওয়া যায়। এইতো সেদিন রবার্ট হলের ওখানে. ...

কথাটা শেষ করল না ইফতেখার। রবার্টের প্রসংগটা না তোলাই ভাল।

মিঃ ডেভিড এতক্ষণে কথা বলল - মিঃ রবার্ট হল টেরেস সিস্টেম চা বাগানের ভীষণ বিরুদ্ধে।

একটু হাসলেন মিঃ ডেভিড—বাংলাদেশে প্রায় এক লক্ষ একর জমিতে চায়ের চাষ হচ্ছে। এর অধিকাংশই টিলার গায় টেরেস সিস্টেম করা। এত-গুলো বাগানকে প্লেইন ল্যান্ডে আনলে তো কৃষির জমির টান পড়ে যাবে। রবার্টের মাথায় এ দিকটা দিয়ে বোধহয় চিন্তাই আসে নি। এ দেশের পপুলেশান প্রবলেমটার কথা ও সম্ভবতঃ ভুলেই গেছে। আমাদের গ্রেট সায়ান্টিস্ট তাঁর চিন্তায় দেখছে দেশ জুড়ে মানুষের বদলে কেবল চা গাছ গজিয়ে চলেছে।

সবাই একটু অস্বাভাবিক জোরেই হেসে উঠল।

বাইরে নিস্তব্ধ রাত। রবার্টের জীপ এখন শ্রীমংগল ছাড়িয়ে গেছে। পুরোন জীপখানা ঝর ঝরে বিচিত্র শব্দ তুলে সবুজ বনের অন্ধকার কেটে যেন তাড়া খাওয়া জন্তুর মত ছুটে পালাচ্ছে।

নয়

সকালের সুখী রোদে আসন্ন পুজোর ছুটির গন্ধ। রবিবার সকালে কুলি লাইনে সবাই প্রায় দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। বিশেষ করে নেশাবাজ পুরুষেরা। হরিয়া কিন্তু অনেক ভোরে গরুগুলোকে নিয়ে মাঠে চলে এল, পাহাড়ে। সকালে ঝাঁকে ঝাঁকে শালিক নেমেছে টিলার ধারের ধান ক্ষেতে। পাহাড়ের শরীরে কাশফুলের দল আকাশের হালকা সাদা মেঘ হয়ে নেমে এসেছে। আকাশটা ঝকঝকে নীল। সাদা ফুরফুরে কাশফুল আর সোনালী রোদে ভরা আকাশ দেখলেই হরিয়া বুঝতে পারে পুজোর সময় এসে গেছে। কয়েকদিন পরেই পাড়ায় পাড়ায় ঢোল বেজে উঠবে। চামেলী বলেছে এবার না কি খুব ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হবে। বিষহরীর পুজো এ বছর খুব একটা জাঁকজমকের সংগে হয় নি। বিষহরীর পুজোয় চাঁদা বেশি ওঠে নি। যজ্ঞের খরচটা বেশি হয়ে যাওয়ায় আরো কয়েক সপ্তাহের তলব থেকে টানতে হয়েছে সবাইকে। পঞ্চায়েত বলেই বসেছিল বিষহরীর পুজোর ভার তারা নিতে পারবে না। কালিন্দী পাড়ার ভজু রে রে করে উঠেছিল—'পঞ্চায়েত

এটা কেন বলবেক। এটা একটা কথা হইল বটে। হামরাই চান্দা তুলে পূজো করব।' ভজুর কথাটা মনে ধরল সবার। সত্যিই এমন অলক্ষুণে ব্যাপার কখনও হতে পারে! বলে ওপাড়ায় বাস করবে সবাই আর বিষহরীকে পূজবে না! মা বিষহরী রুষ্ট হলে একজনকে নয় একটা করে সাপে খাবে সবাইকে। কালিন্দীরাই চাঁদা করে বিষহরীর পূজো করল। তবে পরব তেমন জমল না। দুর্গা পূজোর খরচ কোম্পানী দেবে। খুশিতে এখন থেকেই সবাই জল্পনা কল্পনা শুরু করেছে। রাজু বলেছে 'এবার দুর্গা পূজোয় আমরা বড় করে পরব করব। সাতদিন কাম করব না। শুয়োর মারব। পাঁঠা বলি দেব। মিঠাই বানাব। চুয়ানীতে সারারাত কাটব।

বিন্দিয়া রাজুকে বলেছে 'এবার শহর থেকে ভাল যাত্রার দল আনতে হবে কিন্তু বলে দিলাম। কুলিদের যাত্রা আর দেখব না এবার।'

গত দুবছর কুলিরা মণ্ডপ ধরে স্টেজ বানিয়ে নিজেরাই যাত্রা করেছে। গতবার যা মজাটা হল। হরিয়ার এখনও মনে আছে। রাজু বাগানের ইসকুলে পড়েছে। যাত্রার বই এনে সেই সবাইকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। দেশোয়ালী পাড়ার বিষ্ণু কাকার ছেলে মহাদেব পার্ট করেছিল মন্ত্রীর। স্টেজে পার্ট ভুলে সে দেশোয়ালী ভাষাতেই বলে বসল 'কেয়া ভাবছি রাজা মশয়!' সবাই সে কি হাসাহাসি। পাশ খোদাম পাড়ার কালু গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সেজে সরু গলায় গান গেয়ে নাচবার সময় শাড়ি খুলে পড়ে তার খাকি হাফ প্যান্ট বেরিয়ে পড়ল। এবার শহর থেকে যাত্রা আসবে। শহরের যাত্রা পার্টির মেয়েগুলো কি ফিটফাট আর সুন্দরী। সব সময় সেজে গুজে ফুর ফুরে হয়ে থাকে। জঙ্গলে বন মুরগী ডাকছে। হরিয়া বাঁশের তীর ধনুক তুলে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। বন মুরগী না হোক একটা খরগোশ সে আজ শিকার করবেই। ওপারের চা বাগান থেকে মেয়েদের গানের শব্দ ভেসে আসছে। জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছে হয়তো কেউ। মেয়েদের এখন অনেক কাজ। পাহাড় থেকে মাটি কেটে ঘরের দেওয়াল ভিটে নতুন করে লেপতে হবে। জঙ্গল থেকে রঙিন মাটি কুড়িয়ে ঘরে লতা পাতার নকশা তুলবে। জঙ্গলের ভেতর শুকনো পাতায় পা ফেলে সাবধানে এগোল হরিয়া। জঙ্গলের কোন্ দিক থেকে বন মোরগের ডাক আসছে দাঁড়িয়ে অনুমান করতে চেষ্টা করল। তীর ধনুকটা বানিয়ে নিয়েছে মুণ্ডা পাড়ার ছেলে ভুলুর কাছ থেকে। মুণ্ডারা তীর ধনুকে শিকার করতে খুব পছন্দ করে। মুণ্ডাপাড়ার শিকারীরা লোহার পাত ঘষে ধারাল তীর বানায়। তাই দিয়ে খরগোশ শেয়াল এমন কি হরিণ পর্যন্ত শিকার করে আনে। বাগানের কুলিদের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে ছোট জাত। শেয়াল খায়। বেজী খায়। ঝটপট ডানার শব্দ করে বন মোরগের ঝাঁক উড়ে গেল। মেজাজটা খারাপ হল হরিয়ার। একটা মোরগ মেরে বাড়ি

নিয়ে গেলে চঞ্চলা কাকী কত খুশি হত। খুশি মনে মোরগের মাংস রাঁধত। একটু মাংস নিয়ে হরিয়া হরদেও বুড়োকেও খাওয়াতে পারত। সামনে জারুল গাছের ডালে একটা লেজঝোলা পাখি বসে আছে। পাখিটাকে তাগ্ করল হরিয়া। ধনুকের ছিলা টেনে ধরতেই পায়ের আঙুলে কি যেন জড়িয়ে গেল। হাত ফসকে তীরটা গাছের ডালের নিচে দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওপরে ডালে পাখিটা নিশ্চিন্ত বসে আছে। পায়ের দিকে এবার মনো যোগ দিল হরিয়া। একটা চিনে জোঁক আঙুলে জড়িয়ে রক্ত চুষতে শুরু করেছে। জোঁকটা টেনে ছাড়িয়ে দূরে ফেলে দিল হরিয়া। বর্ষা চলে যেতে বসেছে তবু এদের উৎপাত কমে না। বাগানে যারা কাজ করে তারা তো কারখানা থেকে আনা ডিজেল আর ফারনেস অয়েল পায় মেখে কাজে যায়। হরিয়া কোথায় তেল পাবে। তীরটার গতিপথ লক্ষ্য করে সামনে চলল হরিয়া। পাখিটা মারা পড়ল না। তীরটা না আবার হারিয়ে যায়। বড় বড় গাছগুলোর পাতায় পাতায় সকালের সোনালী রোদের ঝিলমিল। একটু ওপরে উঠে দাঁড়াল হরিয়া। এখানে ঝোপঝাড় কম। বড় গাছের ভিড় কিছুটা হালকা। গাছের আড়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছে চায়ের টিলা। যেন একটা সবুজ গালিচা গড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। স্নেহময়ী মায়েদের মত সবুজ ডানা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছায়া গাছ। হঠাৎ ঝংকার তুলে বনের পাতায় পাতায় শিহরণ জাগাল একটি সুরেলা নারী কন্ঠের হাসি। হরিয়া চমকাল। কে এমন মাতাল হাসি হাসছে সকালের জংগলে। আবার হাসির ঝাপটা। হরিয়ার বুকের মধ্যে শির শির করে ভয়ের কাঁপুনি উঠল। সারা শরীরে কাঁটা দিল। পেত্নী চৌন্নি কিনা কে জানে। কাঠ কাটার মেয়েরা তো এমন-ভাবে হাসে না। হরিয়া দু'পা পিছিয়ে এল। এবার একটি পুরুষালী কন্ঠের গুঞ্জন। শব্দটা খুব কাছে। হরিয়ার বুকের কাঁপুনি কিছুটা কমল। মনে হচ্ছে মানুষ-টানুষই হবে। সন্তর্পণে এগিয়ে দু'হাতে বেত ঝোপ সরিয়ে উঁকি দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর ঝিম ঝিম করে উঠল। সামনে নিম গাছটার নিচে এক টুকরো ঘাসের ওপর শুয়ে আছে শ্রীমতী আর ছত্রি হরিশ। শ্রীমতীর শরীরটা এক রকম অনাবৃত। সেই শরীরটা নিয়ে পাগলের মত করছে হরিশ। সারা শরীরে চুমু খাচ্ছে। এলোমেলো। অশ্রান্ত। দুজনের শরীরটা কি অদ্ভুতভাবে ক্রমে এক হয়ে যাচ্ছে। ভীষণ উত্তেজক দৃশ্যটায় হরিয়ার মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। প্রবল জোরে বুক ধড়ফড় করে গলা শুকিয়ে উঠল। হারানো ধনুকটি উদ্ধারের কথা ভুলে পেছন ফিরে ছুটতে শুরু করল। কিছুদূর এসে দাঁড়িয়ে পড়ল হরিয়া। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানল। আশ্চর্য উত্তেজক দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভয়ের সঙ্গে কি এক রকম ভাল লাগায় শরীরটা কেমন করে উঠল

হরিয়ার। চামেলী একদিন বলেছিল বটে যে হরিশ ছাত্র না কি রাত্রে লুকিয়ে শ্রীমতীর ঘরে যায়। হরিয়া শুনে অবাক হয়েছে—যায় তো কি হয়েছে? চামেলী ভেংচি কেটেছে—তা বুঝবি কেন! তুই তো একটা হাবা।

চামেলীটার বয়স কম হলেও হরিয়ার চেয়ে সে অনেক বেশি বোঝে। বলেছে—জানিস ধরা পড়লে পঞ্চায়েত ওদের বাগান ছাড়া করবে।

- কেন করবে। ও তো সুরেশের ঘরেও ছিল।

সুরেশ তো ওদের নিজের জাতের।

-বেশ তো ওরা হয় তো বিয়ে করবে?

করুক না। বুঝবে মজা। ছাত্ররা সব জাতের মেয়ে বিয়ে করতে পারে না।

এখন হরিয়া ভাবল হরিশ কি শ্রীমতীর ঘরে গিয়ে সারারাত শ্রীমতীকে নিয়ে ওরকম অদ্ভুত পাগলামি করে। হরিয়া এ মাসে চোদ্দ বছর ছাড়িয়ে পনেরতে পড়ল। রোগা বলে ওকে বয়সের তুলনায় বেশি রকম বালক দেখায়। লাইনে তার বয়সী ছেলেরা হরিয়ার চেয়ে অভিজ্ঞ। বনের মধ্যের ওই দৃশ্যে হরিয়া কেমন তীব্র নেশার আকর্ষণ অনুভব করল। ভীষণ ইচ্ছে হল বেতঝোঁপে ঢুকে আবার ওদের মাতাল পাগলামি দেখে। নারী পুরুষের মধ্যে এমন আশ্চর্য একটা ঘটনা থাকতে পারে অস্পষ্ট জানলেও এমন সরাসরি জানা ছিল না হরিয়ার। হঠাৎ এই জঙ্গলের সকালটা তাকে আশ্চর্য কোন জগতের দরজার এনে পৌঁছে দিল। মনে হল সে যেন একটা যুবক পুরুষ হয়ে উঠেছে। তীর ধনুক দিয়ে শিকার করতে আর ভাল লাগল না। ওদের দিকে না ফিরে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের টিলা থেকে নেমে এল হরিয়া। এদিকে একটানা চা বাগান শুরু হয়েছে। চার পাঁচটা মেয়ে মাটি কাটছে। ঝুড়ি করে নিয়ে ফেলছে রাস্তার মাঝখানে কালভার্টের পাশে। বৃষ্টিতে ওখানকার মাটি ধসে পড়ে ধুয়ে গেছে। লাল নীল সবুজ হলুদ শাড়ি পরা অল্প বয়সী মেয়েগুলো কালিন্দী পাড়ার। কালিন্দী সাঁওতাল মেয়েরা শৌখিন। ভাত না খেয়ে প্রসাধনী রঙিন শাড়ি কেনে। মেয়েগুলো আঁটসাঁট খোপায় ফুল গুঁজে ফুরফুরে হয়ে বেরিয়েছে সকালেই। হরিয়া সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। বিশাল সবুজের পটভূমিতে খোপায় ফুল আর রঙিন শাড়ি পরা কয়েকটি মেয়েকে জীবনে যেন এই প্রথম দেখল। শরীরে কেমন আকর্ষণীয় ঢেউ তুলে ঝুড়ি মাথায় হাঁটছে ওরা। কথায় কথায় খিল খিল করে হাসছে। ওদের হাসি ওদের ভঙ্গী হরিয়ার শরীরে আবার সেই কাঁপন তুলল। জঙ্গলের দৃশ্যটি যে কাঁপন তুলেছিল। মেয়েরা ঝুড়ির মাটি রাস্তার মাঝখানে ছুঁড়ে দিয়ে

ঘুরে দাঁড়াল একটি মেয়ে। ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে বিদ্যুৎ চমকাল হরিয়ার সারা শরীরে। মেয়েটা খালি ঝুড়ি হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। হাসতে হাসতে বলল -এই হরিয়া, তুই ওখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে?

হরিয়া সচকিত হল। কথা বলছে চামেলী। কি আশ্চর্য! চামেলীকে সে চিনতে পারে নি। চারিদিকের সবুজের মধ্যে সে যেন শুধু কতগুলো রং দেখছিল। অবয়ব দেখছিল। সেই রং অবয়ব হাসি আর চামেলী আবার এক হয়ে গেল। তর তর করে সামনে উঠে এল চামেলী এই হাবা। এই বুদ্ধু। কি হয়েছে তোর?

এবারও হরিয়া কথা বলতে পারল না। মেয়েটা ঝরণার মত শব্দ তরঙ্গের ঝড় তুলে হেসে উঠল। হাসতে থাকল। হরিয়ার মনে হল ওই হাসির আঘাতে সারাটা বাগানের সবুজ কাঁপছে। হরিয়া কাঁপছে, ভয়ে নয়। আকাঙ্ক্ষায়। ঝুড়িটা নামিয়ে চামেলী হরিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল— কি হয়েছে রে হরিয়া! এমন হয়ে আছিস কেন?

হরিয়ার ঠোঁট নড়ল। ফিস ফিস করে বলল -চামেলী আমার সঙ্গে আয়। তোকে একটা জিনিস দেখাব।

চামেলী অবাক চোখে তাকাল -কি রে?

—আয় না। হরিয়া চামেলীর হাত ধরে আকর্ষণ করল। চামেলী কি একটু ভাবল। তারপর বলল—চল।

দুজনে বনের ভেতর চলে এল। চামেলী হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল - কি দেখেছিস রে? হরিণ?

চামেলীর পাশে হাঁটতে হাটতে হরিয়া কেমন এক ভাল লাগায় ভাসছে। মুখ ফিরিয়ে বলল—দুর, হরিণ নয়। শ্রীমতী আর হরিশ ছুরি... ..

আর বলতে পারল না হরিয়া। হরিয়ার মুখটা লাল হয়ে গেল। দুটো কান আর চোখ জ্বরের জ্বালার মত জ্বলতে লাগল - চামেলী খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর ভুরু বাঁকিয়ে বলল—তুই দেখ গিয়ে হাবারাম। আমার সময় নেই।

চামেলীর মুখে মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি ধরে হরিয়া বলল-তোকে খুব সুন্দর লাগছে রে চামেলী!

হরিয়ার মত ভাষায় হরিয়াকে ভেংচাল চামেলী তোতে খুব সুন্দার দুস্‌চি! তারপর ঠোঁটের ভঙ্গী বদলে হরিয়ার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল—কেমন দেখাচ্ছে রে? শ্রীমতীর মত?

হরিয়ার বুকে আবার যেন বিদ্যুৎ চমকাল। চামেলী হঠাৎ দুহাতে হরিয়াকে বুকে টেনে ধরল—আমাকে একটা চুমু খা তাহলে।

হরিয়ার মাথাটা আরো জোরে বুকে চেপে ধরল চামেলী। চামেলীর

শরীরটা কি নরম আর উষ্ণ। চামেলীর কোমল বুক আর শরীরে ঠোঁট লাগিয়ে অন্ধের মত কি যেন খুঁজতে লাগল হরিয়া। প্রচণ্ড আবেগে কাঁপছে তার শরীর। কৈশোরের নব জাগ্রত কামনায় দিশেহারা হরিয়া। কোথায় এর উৎস! কোথায় এর শেষ! হরিয়া দুটো হাতে চামেলীর শরীরটা আঁকড়ে ধরল। চামেলীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পুড়িয়ে দিচ্ছে তার মুখ। চামেলী খুব আলগা চুমু খেল হরিয়ার ঠোঁটে। তারপরই ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল—সরে যা।

হরিয়াকে কিসের এক তাড়না বেপরোয়া করে তুলল। একটা অজানা সুখের সন্ধান পেয়েছে সে। চামেলীর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিয়া। সবল হাতের ধাক্কায় হরিয়াকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঠাস করে চড় বসাল গালে হারামী কোথাকার। এসব কি করছিস?

হরিয়া চড় খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। কি অপরাধ হল তার! চামেলীই তো আগে ..

হরিয়া বলল মারলি কেন?

-মারব না তো কি তোর গলা ধরে শুয়ে থাকব? চামেলী ফোঁস করে উঠল।

হরিয়া রেগে গেল তা হলে তুই আগে ওরকম করলি কেন?

এবার চামেলী একটু হাসল খেলা করছিলাম। তুই তো একটা বাছুর। বাচ্চাদের সংগে লোকে তো খেলাই করে।

হরিয়ার কণ্ঠ অভিমানী হল আমি বাচ্চা। আর তুই বুঝি বুড়ি?

চামেলী খুব অভিজ্ঞ হাসি হাসল—তুই এখনও মরদ হয়ে উঠিস নি। চামেলী একটু চুপ করে আবার বলল আসলে আমার খুব ভয় করছিল। লাল ঠোঁটের ফাঁকে চামেলীর সাদা দাঁতের ঝিলিকে আবার হরিয়ার বুকে একটা অবাধ্য ঝড় উঠল। বলল আয় না চামেলী আবার!

চামেলী পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলল আজ না। আর এক দিন।

চামেলীর লাল শাড়ির রং সবুজ গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল।

হরিয়া নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তীর ধনুক গরুর পাল কিছুই এই মুহূর্তে মনে পড়ল না। কি যেন শ্রীমতীরা নিম গাছের নিচে সেই ভাল-লাগার সময়ে ডুবে আছে কি না। সকাল অনেক আলো নিয়ে বনে ঢুকে পড়েছে' কিশোরী রোদ যৌবনে ঝলসে উঠেছে। ঝোপঝাড় ঠেলে কুড়াল হাতে লক্ষ্মণ উঠে এল। হরিয়াকে দেখে থামল -এই হরিয়া। এখানে বসে হাওয়া খাচ্ছিস। ওদিকে গরুগুলো ধান ক্ষেতে নেমে সব তছনছ করে ফেলল। যা যা। গরু তাড়া গিয়ে।

হরিয়া ত্বরিৎগতিতে ছুটতে লাগল ধান ক্ষেতের দিকে। ক্ষেতের মালিক গরুগুলোকে খোঁয়াড়ে দিয়ে দিলে আর উপায় থাকবে না।

সারাদিন মাটি কেটে ঘর লেপতে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। এঁটেল মাটির গোলা পাতায় মুড়ে চঞ্চলা নাইতে চলল। টিউবওয়েলের পাশে ভিড় লেগে থাকে ছুটির দিন। সেখানে স্নান করা যায় না। তাছাড়া কলটা একেবারে সদর রাস্তার ওপরে। কুয়োর জলে এত কাদা, মাথায় ঢাললে চুলে চিটচিটে জটা ধরে যায়। বাগানের মধ্যে একটা ছড়ি আছে। মেয়েরা সবাই প্রায় সেখানে স্নান করে। কাজের দিনে অনেকে পাতা মাপার পর সোজা চলে যায় ছড়িতে। স্নান করে বাড়ি ফেরে। চঞ্চলা লছমীর উঠোনে এল ও লছমী! যাবি না কি স্নান করতে?

লছমী জঙ্গল থেকে এক বোঝা কাঠ কেটে এনেছে। সেগুলো উঠোনে গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল তুই যা। আমি একটু পরে আসছি। বিন্দিয়া গেছে?

চঞ্চলা বিল্লু আর বুধুয়াকে ডেকে নিয়ে ছড়িতে এল। ছড়িটা কুলি লাইন থেকে একটু দূরেই। পাহাড় থেকে নেমে বাগানের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে। বর্ষায় ভরে যায়। প্রবল স্রোত বয়। শীতে জল নেমে যায় অনেক নিচে। মেয়েদের গল্প আর কাপড় ধোয়ার শব্দে জায়গাটা মুখর। একটু দূরে কয়েকজন কুলি ছিপ ফেলে বসে আছে। মাঝে মাঝে বেশ বড় মাছ পাওয়া যায়। হরিয়া একদিন একটা মহাশোল ধরে নিয়ে দিয়েছিল চঞ্চলাকে। পাড়ের খাড়াই বেয়ে চঞ্চলা নেমে এল। বিনি ডেকে বলল ও চঞ্চলা দিদি। তোমার ঘরের কাজ শেষ হল?

পাতায় মোড়া মাটির ঢেলাটা পাথরের ওপর নামিয়ে রেখে চঞ্চলা বলল—কই আর শেষ হল। আমি একা মানুষ ক'ঝুড়ি মাটি আর কাটতে পারি দিনে। এখনও গোয়াল ঘরটা বাকি রয়েছে।

রজব মা পানিতে কোমর ডুবিয়ে শরীর রগড়াতে রগড়াতে বলল—তোর ওরানডাটা কি করে? সে পারে না ঘরের কাজ করতে!

বিনি কাচা কাপড় মেলে দিচ্ছিল ঘাসের ওপর। মুখ ফিরিয়ে হাসল - অর্জুন দাদার কথা বলছ! সে তো মেজাজী মানুষ। মর্জি মাফিক চলে।

চঞ্চলা ছেলে দুটোকে স্নান করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সারা সপ্তাহ ছেলেদের দিকে নজর দেবার সময় পায় না সে। ছুটির দিনে আবার এক'শ কাজ লেগে থাকে। সারাদিন মাঠে বন বাদাড়ে ঘুরে দুটো নোংরা বাঁদর হয়ে আছে দুজন। বিল্লুটা নাইতে চায় না। বকাবকি ধস্তাধস্তি করে ওদের

স্নান করাল চঞ্চলা। তারপর পানিতে পা ডুবিয়ে এঁটেল মাটি দিয়ে মাথা ঘষতে বসল। বিনি এসে বসল পাশে। সরু হয়ে যাওয়া এক চিলতে সাবানে হাত পা ডলতে লাগল। সাবান-স্নানটাই বিনির একমাত্র অভিজাত শখ। বিনির স্বামীর প্রচন্ড পাট্টার নেশা। পাট্টায় ধারের পাহাড় করে ফেলেছে। বিনির রোজগারে খাওয়া পরা চলে। শৌখীন জিনিস কিনতে পারে না বিনি। তবে তলব পেলে একটা সৌখীন সুগন্ধি সাবান কিনতে তার ভুল হয় না। বিনির সাবান মাখার প্রতি কটাক্ষ করে হরমতী বলল—দিনে দিনে আরো আরো কত বিবিয়ানা দেখব। কুলি কামিনেরা ঠোঁটে রং মেখে মেমসাহেবদের মত উঁচু জুতো পরে বাগানে পাতি তুলবে।

রুক্মিনি আর রত্নর মা কাপড় কাচতে কাচতে হাসল হরমতীর কথা শুনে। বিনি শান্ত স্বভাবের মেয়ে। তবু মুখিয়ে উঠল কেন মাসী! তোমার এত শরীর জ্বলুনি কেন! আমি তো আর তোমার তলবে হাত দিতে যাই নি। আমার পয়সায় আমি সাবান মাখছি। তাতে তোমার কি?

হরমতী মুখ বাঁকাল—আমার আবার কি! অত ঠাট বাটই যদি দেখাবি তবে বাবু পাড়ার কোয়ার্টারে না হয় সাহেবদের কুঠিতে থাকলেই পারিস। কুলি লাইনে কেন।

সাবান মাখা বন্ধ রেখে ক্ষেপে উঠল বিনি—কুলি পাড়ায় আর কেউ ঠাট বাট করে না। কেন শ্রীমতীরা নেই? মা কালীর দিব্যি দিয়ে কেউ বলুক দেখি কেউ কোন দিন আমাকে বাবুদের ঘরে সাহেবদের কুঠিতে যেতে দেখেছে কি না। চঞ্চলা বাধা দিল—আঃ থাম তো বিনি। বুড়ো মানুষ না হয় বলেছেই একটা কথা। তার জন্য অত ঝগড়া করছিস কেন?

মুখ কালো করে চুপ করে গেল বিনি। তখনই হাতে কাপড় ঝুলিয়ে বিন্দিয়া এল। চুলের বিনুনী খুলে শরীর থেকে ঘামে ভেজা কাঁচুলী খুলতে খুলতে ঘাটে বসল। খুব সরস ভঙ্গী করে বলল—এই চঞ্চলা ওদিকে যে মস্ত কান্ড ঘটে গেল। হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার একেবারে।

সবাই উৎসুক চোখে তাকাল। চঞ্চলা প্রশ্ন করল কি হয়েছে রে?

বিন্দিয়া চোখ মুখে খবরের কৃতিত্ব ফুটিয়ে বলল—ওই যে ঢেমনি শ্রীমতীটা, সারা বাগানের মরদগুলোর মাথা খাওয়াই যার কাজ। আজ একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়েছে। বিষ্ণুদাদা আর লক্ষ্মণ গিয়েছিল কাঠ কাটতে জঙ্গলে। দেখে শ্রীমতী আর ছত্রিপাড়ার হরিশটা খুব পীরিত লাগিয়েছে। বিষ্ণুদাদা তো ক্ষেপেই লাল।

রুক্মিনি স্নান করতে করতে বলল—এটা আর নতুন খবর কি। উড়ো উড়ো সবাই শুনেছে ওদের ব্যাপার। অনেকেই তো জানে হরিশ লুকিয়ে রাতে শ্রীমতীর ঘরে যায়।

বিন্দিয়া হাঁটুর ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে পানিতে পা ডুবাল—সেটা তো লুকোছাপি করে চলছিল। এখন ব্যাপার তো অন্যরকম হয়ে গেছে। নিষ্কুদাদার সংগে খুব ঝগড়া করেছে হরিশ।

হরমতীর স্নান হয়ে গেছে শুকনো কাপড় কোমরে জড়িয়ে বলল—সুরেশকে ছেড়ে রাজুকে ধরল। রাজু মুরলীকে বিয়ে করবার পর ছেমানিটা একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছিল। এসে জমলো সটে ওরা। হরিশের মত ভাল ছেলে যে কোনদিন রেন্ডীদের দিকে চোখ তুলে তাকাত না। কেমন করে তাকে ফাঁদে ফেলল।

বিন্দিয়া পানিতে নামল তোমার ভাল ছেলে হরিশ তো জোর গলায় বলছে শ্রীমতীকে বিয়ে করবে।

রজের মা বিস্ময়ে হা হয়ে গেল বলিস কি তুই বিন্দিয়া। এ বিয়ে কখনও হয়। সমাজ কখনও এ বিয়ে মানবে। মাঝখান থেকে দুটোই বাগান ছাড়া হবে।

শ্রীমতী আর হরিশের ব্যাপারটা নিয়ে ছড়ির ঘাটে অনেকক্ষণ আলোচনা চলল। আলাপ মোড় নিল অন্য বিষয়ে। রুক্মিনি বলল—ও হরমতী মাসী ঝড়ু না কি আবার বিয়ে করছে। শুনলাম কমলীর সংগে ওর ভাব লেগেছে।

বিন্দিয়া চমৎকৃত হল—খুব ভাল। যেমন দেবা তেমন দেবী। কমলীকে আর অশোবতী বানিয়ে মারতে পারবে না ঝড়ু।

রজের মা চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল কি যেন কিছুই বুঝি না। কমলীর মত ছেমানিটাকে বড়ু পছন্দ করল কি বলে।

বিনির স্নান শেষ হয়েছে। পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে দাঁড়াল সে—কমলীই বা ওই বুড়োটাকে পছন্দ করে কি বলে। ওর তো পয়সার কমতি নেই।

বিন্দিয়া হাসল—আরে ও কি ঝড়ুকে বিয়ে করছে? বিয়ে করছে তো ঝড়ুর টাকারে।

চঞ্চলার মনটা একটু খারাপ হল। বেচারা ঝড়ুর বউটা কি কষ্ট পেয়েই না মরল। ছোট বাচ্চাটাকে ওর মা নিয়ে গেছে।

ভীষণ উত্তেজিত চেহারা করে লছমী এসে উপস্থিত হল। চেঁচিয়ে বলল—হেই বিন্দিয়া! হেই চঞ্চলা! কলিকাল এসে গেছে রে!

সবাই হেসে উঠল। লছমী শুকনো কাপড় নামিয়ে রেখে বলল—হাসছিস তোরা। ওদিকে তো লংকা কান্ড! শ্রীমতীদের পাড়ার লোক-দের সংগে ছাতপাড়ার লোকের মারপিট হয়ে গেছে। বাবুরা পর্যন্ত এসে গেছে।

সবাই হতবাক হল। ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে কে ভেবেছিল। লছমী বসে পড়ে অবশিষ্ট চাল গরাটি গোছাল—এর মধ্যে সবার নাকের ডগা দিয়ে শ্রীমতী আর হরিশ হাত ধরাধরি করে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

কোথায় বেরিয়ে গেল রে? বিস্মিত প্রশ্নে তাকাল বিন্দিয়া।

কি জানি কোথায় ভগবান জানে। ভালই হল। ঢেমনিটা বাগানে একেবারে ঝড় তুলে দিয়েছিল।

লছমী স্নান করতে নামল। একটু আগে শ্রীমতীর বিরূপ সমালোচনায় মুখর ছিল যারা তারা সবাই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। বোধহয় মনে মনে ওরা ঠিক চায় নি যে শ্রীমতী বাগান ছেড়ে চলে যাক। ঝগড়া মারামারি বিচার আচার অভাব দুঃখ সব মিলিয়ে তারা সবাই একই সত্তা। এর থেকে বেরিয়ে যখন কেউ চলে যায় তখন বুকের কোথায় যেন ব্যথা বাজে। এ দেশের লোক তাদের আপন নয়। তারাও এখানে পরদেশী। তাই আপন পরিমণ্ডলীতে থাকবার জন্য বাগানে মাটি আঁকড়েই তারা পড়ে থাকে। ছাঁটাই হয়ে গেলেও বাগান ছাড়ে না কেউ। বাঁশ কাঠ কেটে পেটের খোরাক জোটায়। তবু এই চায়ের বাগানের সবুজের সীমানা তারা ছাড়তে চায় না। বিহার, উড়িষ্যা, সাঁওতাল পরগণা তাদের চেনা নয়। সেটা তাদের পূর্বপুরুষের দেশ। তারা এখন চায়ের মানুষ। এক বাগান বদলে অন্য বাগানে যায় অনেকে। কিন্তু বাগানের সীমানা ছেড়ে যে দূরে চলে যায়, সে তো দুর্দশায় পড়ে শেষ হয়ে যায়। চা বাগানের অভাব তাদের বুকটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। দুটি আচারভ্রষ্ট নরনারীর জন্য মমতা অনুভব করল সবাই।

দুপুরের পর উত্তেজনাটা ভুলল প্রায় অনেকেই। ছুটির দিনে কুলিরা অনেকে এ বাগানে সে বাগানে জ্ঞাতি স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যায়। সন্ধ্যায় যায় হাট করতে। লছমী আর চঞ্চলার ঘর খালি। চঞ্চলা দুই ছেলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ইটা চা বাগানে ওর বোনের বাড়ি গেছে। লছমীও গেছে দোলইতে ওর মায়ের কাছে। বিন্দিয়ার বড় ভাই আর বউ এসেছিল, ওদের নিয়ে সারা বিকেল ব্যস্ত ছিল বিন্দিয়া। ওরা চলে গেলে রামিন্দরকে পাঠাল হাটে। বিন্দিয়া জানে সুযোগ পেলেই ও পাট্টায় ছুটবে। স্বামীকে যথেষ্ট শাসন আর সতর্ক করে ঘরে এল বিন্দিয়া। তখনি এল বিষ্ণুর বউ চন্দনী। দাঁতে খৈনী টিপতে টিপতে বলল—ও বিন্দিয়া! তোদের এদিককার ঘর দেখি একেবারে খালি।

চন্দনীকে পিঁড়ি পেতে দিয়ে বিন্দিয়া বলল—পুজোয় বেশি বোনাস দেবে এবার কোম্পানী। মন মর্জি সবারই ভাল। সেই খুশিতে আগে থেকেই হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

চন্দনীর একটু পাড়া বেড়ান স্বভাব। সব ঘরের খবরাখবর তার নখদর্পণে। কিন্তু বিন্দিয়ার মুখরা স্বভাবের জন্য ওকে একটু এড়িয়ে চলে সে। কিন্তু এতবড় একটা উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটে থাকার পর চন্দনীর পক্ষে ঘরে বসে থাকা কি করে সম্ভব। রজর মা আর হরমতী গেছে হাটে। বাধ্য হয়েই বিন্দিয়ার ঘরে আসতে হয়েছে। চন্দনী বলল—জানিস না কি ওরা কোথায় গেছে?

—কারা?

—এই শ্রীমতী আর ছত্রিটা।

—আমি কেমন করে জানব। আমাকে তো আর বলে যায় নি। বিন্দিয়ার বাঁকা কথায় বিরক্ত হল চন্দনী। ছুকরীটার সঙ্গে রসিয়ে দু'টো গল্প করবারও উপায় নেই। এইজন্যই তো রাজিন্দর কমলীর পিছে পড়ে থাকত। তবু মুখে হাসি টেনে চন্দনী বলল—আচ্ছা ছত্রিটারই বা কি বুদ্ধি বল। নিজের জাতের মধ্যে কত ভাল মেয়ে ছিল। এখন বাগান ছেড়ে কোথায় ঘুরে মরবি। হরিশটার তো কারখানায় খুব নাম ডাক ছিল। সাহেবরা পছন্দ করত।

হরমতী হাট থেকে ফিরল। বিন্দিয়ার ঘরে চন্দনীকে দেখে এসে দাঁড়াল। হরমতীর চেহারা দেখে মনে হল একটা বড় কিছু ঘটে গেছে আবার। বিন্দিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল কি হয়েছে মাসী?

হরমতী শুকনো মুখে উত্তর দিল—হতে আর কিছু বাকি নেই।

হরমতী খুব দ্রুত উত্তেজিত ভঙ্গীতে ঘটনাটা শোনাল। কুলি লাইনে দুপুরে জটলা চলছিল। হাট থেকে ফিরবার সময় হরমতী ফয়েজ আলীর দোকানে গিয়েছিল ডাল ধার করতে। তখনি শ্রীমতী আর হরিশ এসে উপস্থিত। দু'জনে মুসলমান হয়ে বিয়ে করে ফিরে এসেছে। সবার চোখের ওপর দিয়ে উঠেছে গিয়ে মুণ্ডা পাড়ার কুলি ব্যারাকের খালি ঘরে। এখন অসামাজিক বিয়ের অজুহাতে পঞ্চায়েত ওদের বাগান ছাড়া করতে পারবে না। ওরা পঞ্চায়েতের নাগালের বাইরে এখন। বাগানের কাজ করবে দু'জনেই। কোন্ কুলি কোন্ ধর্মের তা নিয়ে বাগানের বড় সাহেবদের তো মাথা ব্যথা নেই।

হরমতীর বিবরণে কিছুক্ষণ একেবারে হতবাক হয়ে গেল বিন্দিয়া আর চন্দনী। ছত্রি হরিশটা সত্যি পাগল হয়ে গেছে। চন্দনী জিভ কেটে বলল—ছি! ছি! ভাল বংশের ছেলে হয়ে এই কাজ করলি শেষে। পঞ্চায়েতকে জব্দ করবার জন্য ধর্ম ছাড়লি!

হরমতী আফসোস করল—আহা মা-বাবার মনে এমন দুঃখ দিলি। ভাল হবে না তোদের।

বিন্দিয়া অল্প একটু হাসল—ভালই হল। পরবের আগে পাড়ায় পাড়ায়

রেষারেষি মারামারিটা বন্ধ হল। এখন হরিশের মা-বাবা আর শ্রীমতীর মা-বাবা গলাগলি ধরে কাঁদুক।

হরমতী ঝামটা দিল—এমন খারাপ খবরটায় তোর এত রং লাগল কেন রে বিন্দিয়া?

বিন্দিয়া কিছুটা নির্বিকার জবাব দিল—যা হবার তাতো হয়েই গেছে। আমরা কেন শুধু শুধু ভেবে মরি!

হরমতী আর উত্তর দেবার জন্য দাঁড়াল না। উত্তরটা দিল চন্দনী—

—কেন ভাবব না রে? বাগানের ভালমন্দর সঙ্গে যে আমাদেরও কপাল বাঁধা।

চন্দনী উঠে পড়ল। সব পাড়াতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আলোচনা করল অনেকক্ষণ। ওদের জব্দ করবার ফন্দীও ভাবল অনেকে। তারপর রাতের অন্ধকার নামতেই প্রত্যেকে নিজের আগামী ভাবনার ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিল। শুধু কালিন্দী বুড়ি ওর ভাঙা কুঁড়েতে বসে বলল—আহা সুখে থাকুক ওরা। থাক তোরা, বাগানের ছায়ায় থাক। বাগান হল মা জননী। মা জননীই তোদের বুকে রেখেছে। মায়ের বুক ছেড়ে যে যায় তার কি সুখ হয়। কালিন্দী বুড়ির ছানীপড়া চোখের মত ঝাপসা রাত সুখ-দুঃখ হয়ে রাত আলো-আঁধারের খেলা খেলতে থাকে বিশাল বিস্তৃত চায়ের বাগানে।

আকাশ জোড়া মেঘের জাল তুলে নিয়ে শরৎ উষাও আকাশ থেকে সোনা ঝরছে। সেই সোনালী আনন্দ সবার মুখে। মণ্ডপ ঘরের মাঠে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। ঠাকুর তৈরির জন্য কারিগর বায়না করে এনেছে পঞ্চায়েত। গরুগুলো মাঠে ছেড়ে উৎসাহের আতিশয্যে হরিয়া চলে এসেছে মণ্ডপ ঘরের মধ্যে। লাইনের সব ছোট ছেলেমেয়ের দল এসে ভিড় জমিয়েছে। হরিয়া বুধুয়াকে বলল—দেখেছিস কার্তিক ঠাকুর কেমন ময়ূর চড়ে আছে।

মা দুর্গার দশটা হাতে তাকিয়ে হরিয়া কারিগরকে বলল—আর কত-দিন লাগবে ঠাকুর শেষ হতে?

কারিগর জবাব দেয় না। সরস্বতীর চোখ আঁকতে আঁকতে তন্ময় হয়ে থাকে।

হরিয়া বিস্মিত আনন্দে তাকিয়ে থাকে সিংহ আর অসুরের যুদ্ধরত ভঙ্গীর দিকে। হঠাৎ অসুরের জন্য তার ভারি মায়া হয়। বাগানের কাজ এখনও বন্ধ হয় নি। আরো দু'চার দিন কাজ চলবে। তারপরই পুজোর

ছুটি। ছুটিতে তার বড়দিদি আসবে। হরিয়ার জন্য আনবে নতুন জামা আর ধুতি। হরিয়ার মনটা চমৎকার খুশিতে ভরে যায়।

হঠাৎ মণ্ডপ ঘরটা কেঁপে উঠল। সারা বাগানে প্রচন্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল যেন। সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাগানে অশুভ সংকেতের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল পাগলা ঘন্টির শব্দ। কাজে ব্যস্ত কুলি আর কামিনেরা থমকে এক পলক হতভম্ব হয়ে গেল। তারপরই সবাই ছুটে চলল আফিস ঘরের দিকে। যার যত কাজ থাকুক। যে যেখানেই থাকুক ঘন্টি শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই গুন্তির টাইমের মত সব কুলিকে আফিস ঘরের সামনে জমা হতে হবে।

অর্জুন ছুটছিল। সামনে আরো অনেক কুলি ছুটে যাচ্ছে। মুখে মুখে খবর এসে পেঁাছল অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ভাটিঘরের তিন নম্বর ড্রায়ার বার্স্ট করেছে। কারখানার সামনে অনেকেই এসে ভেঙে পড়েছে। কি করে কেমন করে ড্রায়ার বার্স্ট হয়েছে কেউ বুঝল না। শুধু দেখল তিন নম্বর ড্রায়ারের লোহার কপাট ছিটকে পড়েছে। আর হরিশের ঝলসান বিকৃত মৃতদেহটা পড়ে আছে ভাটিঘরের পেছনের দরজার সামনে। বিষ্ণু একটু দেরি করে ফেলেছিল। ততক্ষণে আরেকটা দুর্ঘটনা সবার সামনে। বিষ্ণু দেখল গুদাম ঘরের ওপরের আকাশটা কাল হয়ে গেছে। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাগলা হাতির পালের মত গাছপালার মাথায় আকাশটা অন্ধকার করে ফেলেছে। ভাটিঘর থেকে গুদাম বেশি দূরে নয়। ভাটি ঘরের আগুন ছিটকে গিয়ে গুদামে আগুন ধরিয়েছে। আশরাফ, অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার বাবুরা সবাই পাগলের মত ছুটোছুটি করছে। গুদাম ঘরটা বোঝাই চা। আগামী সপ্তাহে বুকিংয়ে যাবে। বিষ্ণু ছুটে গেল আশরাফের সামনে—সাহাব। হামাক চাবি দে। হামরা চায়ের বাক্স বাহির কইরে ফালাই। চা জ্বলই গেলে হামরা যে মইরে যামু সাহাব।

ঘটরটাকে চারিদিক থেকে আগুনে ঘিরে রেখেছে। ওর মধ্যে মানুষ ঢোকা অসম্ভব। আশরাফ উদ্ভ্রান্তের মত বলল—কি করে ঢুকবি আগুনের মধ্যে ?

এগিয়ে এল অর্জুন—চাবি দে সাহাব। চা হামাদের শরীরে খুন। হামরার বালবাচ্চার মুখের রোটি। চোখের সামনে গুদাম ভর্তি চা জ্বইলে যাবে। হামরা দেখতে পারব না রে সাহাব। ভগওয়ানের দোহাই চাবি দিয়ে দে।

ততক্ষণে বড় বড় হোস পাইপ এসে পড়েছে। বালতি বালতি বালি ঢালা হচ্ছে। বুড়ো সুখন বুক চাপড়ে বিলাপ করতে লাগল। যেন তার কোন প্রিয়জন চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অর্জুন, রাজিন্দর আরো

কয়েকজন এসে দাঁড়াল আশরাফের কাছে। তাদের মেহনতের চা পুড়ে ছাই হবে। নিরুপায় চোখে তাকিয়ে দেখা অসম্ভব। হোস পাইপের পানির ধারায় আগুনের শিখার বিস্তার কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। ম্যানেজারের হুকুমে গুদাম ঘরের দরজা খোলা হল। আগুনের পতঙ্গের মত ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন। বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল পোড়া আধপোড়া চায়ের বাক্স। একদল লোক বজ্রাহত বেদনায় মূক হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। আগুন নিভতে আরো সময় লাগল। বহু চায়ের বাক্স পুড়েছে। পোড়া চা-পাতা ঘিরে শোকাহত চেহারায় জটলা করতে লাগল সবাই। কি করে আগুন লাগল সেটা বুঝতে আর কারো অসুবিধা হল না। ভাটি ঘরের পাশে স্তূপ করে রাখা ফায়ার উড়ে আগুন ছিটকে পড়েছিল। গুদম সেখান থেকে দূরে নয়। গুদামে আগুন ছড়াতে দেরি হল না। ওদিকে হরিশের ঝলসান মৃত দেহটায় আছড়ে পড়ে বুক ফাটিয়ে কাঁদছে শ্রীমতী। চন্দনী একটু দূর থেকে দেখে আফসোস করল—কপালে সুখ সইল না ওর।

এত দুর্যোগের মধ্যেও মুখ বাঁকা করল লছমী—কেমন করে সইবে। অনাচারের শাস্তি তো পেতে হবে।

কেবল বিন্দিয়া কিছু বলল না। পুরো ব্যাপারটাই তার কেমন অশুভ মনে হল।

সন্ধ্যার পর অর্জুন এল রাজিন্দরের ঘরে। রাজিন্দর আজ পাট্টায় যায়নি তা ছাড়া একটা অসম্ভব কাজ করেছে। মৌলবী ডেকে মসজিদ থেকে লোক এনে হরিশের দেহ মুসলমানী নিয়ম অনুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অর্জুনকে বলল—আয় অর্জুন বস। পরবের আগে কি একটা ঘটনা ঘটে গেল।

অর্জুনের হাতে বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শরীরের কয়েক জায়গা ঝলসে গেছে তার। বলল—চল পাট্টায় যাবো।

রাজিন্দর অবাক হল—কি বলিস রে। এই শরীরে এমন দিনে যাবি পাট্টায়। তুই তো পাট্টাবাজ লোক না।

অর্জুনের চোখ লাল। কপালের রগ ফুলে আছে। বলল—পাট্টায় গিয়ে নেশা না করলে ওই হারামীর বাচ্চাটাকে খতম করব কি করে।

পাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বিড়ি টানছিল রাজিন্দর। এক ঝটকায় উঠে বসল। চুলোয় রুটি সেঁকছিল বিন্দিয়া। উদ্বিগ্ন মুখে সেও ফিরে তাকাল। রাজিন্দর বলল—কি ব্যাপার বল তো অর্জুন!

অর্জুন রুক্ষ জবাব দিল—ব্যাপার হল রেণ্ডী।

রাজিন্দর ঝাঁঝিয়ে উঠল—খোলাখুলি কথা বল। এত ঘোরপ্যাঁচ ভাল লাগে না।

খোলাখুলি ব্যাপারটা জানাল অর্জুন। ব্যাপার ঘটিয়েছে সুরেশ। শ্রীমতীর আগের প্রেমিক। ভাটিখানার চুলোয় ওর আর হরিশের দুজনেরই ডিউটি ছিল। শ্রীমতীকে নিয়ে মুসলমান হয়ে ঘর বাঁধবার পর ওদের দুজনের একটা বিষাক্ত সম্পর্ক চলছিল। কাল দুপুরের ছুটির আগে দুজনে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে। বদমেজাজী স্বল্পভাষী হরিশ প্রচণ্ড এক চড়ে সুরেশকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। শ্রীমতী সম্পর্কে কি একটা বিশ্রী কটূক্তি করেছিল সুরেশ। হরিশের রাগের কারণ সেটাই। সুরেশ অবশ্য অন্য এক অক্ষম হিংসার জ্বালায় জ্বলছিল। চড় খেয়ে সে কিছু বলে নি। তবে তখনি মনে মনে এর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করে ফেলেছিল। ভাটিঘরের কাজ শেষ হলে চুল্লীর ভেতরটা পরিষ্কার করে ওর গ্যাস বেরিয়ে যাবার জন্য পাল্লা দুটো খুলে রাখতে হয়। সে ডিউটি করে সুরেশ। কাল ভাটি বন্ধ হবার পর খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিল সুরেশ। তখন কে বুঝেছিল ইচ্ছে করেই চুলোর গ্যাস বাইরে আসতে দেয় নি সে। চুলো জ্বালাবার ডিউটি হরিশের। কিছুদিন থেকে ড্রায়ারে ফারনেস অয়েল ব্যবহার করা হচ্ছিল। হরিশ সকালে ভাটিঘরে গিয়ে ড্রায়ারে আগুন দিতেই ভেতরের গ্যাস প্রচণ্ড শব্দ নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাল।

রাজিন্দর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। তারপর বলল—কার কাছে শুনলি?

অর্জুন লাল চোখে জবাব দিল—সব ফাঁস হয়ে গেছে। ম্যানেজার সাহেবের কামরায় বিচার হচ্ছে ওর। শালা বেইমান। মরদের জোর না থাকলে রেণ্ডী রাখবি কি করে। আর তোদের হিংসাহিংসির জন্য কি আমাদের রুজী জ্বলে যবে। বড় সাহেবের কামরা থেকে বেরোলেই ওটাকে আমি দায়ের কোপে দুখানা করব।

অর্জুনের উত্তেজিত ভয়ংকর চেহারায় তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিন্দিয়া। ধীরে ধীরে বলল—ও তো তোমার একার সঙ্গে দুশমনী করে নি। করেছে কোম্পানীর সঙ্গেও। আফিস থেকেই ওর সাজা হয়ে যাবে।

হন হন করে এসে ঘরে ঢুকল লক্ষ্মণ। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—শুনেছিস সুরেশ থানায় চালান হয়ে গেছে।

রাজিন্দর বিড়িটা সজোরে নিক্ষেপ করে বলল—শালা দুশমনী করলি তুই কার সাথে! আগুন দিলি কুলিদের মেহনতে।

পুজোর মাত্র কয়েকদিন আগে কুলিরা জানল পুজোয় এবার যে বাড়তি পাঁচ টাকা বোনাস দেবার কথা বলেছিল কোম্পানী, তা আর দেওয়া হবে না। কারণ চা পাতা পুড়ে যাওয়ায় মোটা লোকসানের মুখোমুখি হতে হয়েছে কোম্পানীকে।

বাগানে হালকা ছাঁটাই শুরু হয়েছে। কামিনেরা কাজ করছিল সেখানে। ছাঁটাইর কাজে দ্রুত হাত চলছে কুলি পুরুষদের। মেয়েরা ছাঁটা ডাল সরাচ্ছে। গাছের গোড়া পরিষ্কার করছে। লছমী অনেক খবর রাখে। বলল—শুনেছিস চঞ্চলা এবার যে বোনাস কাটা গেল।

বিন্দিয়া ছাঁটা পাতাগুলো ঝুড়িতে তুলছিল। অবাক মুখ তুলল সে—কি বলছিল তুই?

—ঠিকই বলছি। কাল মহাজনের দোকানের সামনে সবাই বলাবলি করছিল। আজ আমি নিজে কানে সর্দার শিউরামকে বলতে শুনলাম। অনেকে বলছে তারা কাম বন্ধ করবে।

চঞ্চলা কাছেই কাজ করছিল। কথাটা কানে যেতেই শিহরিত হল সে। সেই যে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর একবার কাম বন্ধ হয়েছিল। কোথা থেকে যেন সব লীডাররা এসেছিল। কুলিরাও খুব মেতেছিল। এবার থেকে না কি নয়া দস্তুর। পুরানা দস্তুর আর চলবে না। বড় সাহেব, ছোট সাহেব বাবু এসব থাকবে না। কুলিরাই পুরা কাম কাজ চালাবে। ইংরেজ সাহেব রবার্টকে দুদিন ঘেরাও করে রাখল কুলিরা। পরে সেই লীডারদের সংগে কথা বলবার জন্য ঢাকা থেকে আরেক বড় সাহেব এল। কি সব কথাবার্তা হল সাহেবদের সংগে তাদের। লীডাররা বলল—কুলিরা এবার কাম কর।

কিন্তু কোম্পানীই বাগান বন্ধ করে দিল। কুলিদের সে কি দুর্দিন। ঘরে অনাহার। অনিশ্চয়তা। রবার্ট সাহেবই ছুটাছুটি করে আবার বাগান চালু করলেন। উঃ সেসব কথা মনে পড়লেও চঞ্চলার ভয় করে। না হয় বোনাস কাটা যাবে। তা যাক। ভগওয়ান কাম বন্ধ যেন না হয়। শুকনো মুখে বলল—সত্যি কাম বন্ধ হবে না কি রে?

লছমী জবাব দিল—কাম বন্ধ করলে কোম্পানীর কি! খাতা থেকে নাম কাটা যাবে কুলিদের। না খেয়ে মরবে সব। তখন আর মহাজন কর্জ দেবে না।

মুখিয়ে উঠল বিন্দিয়া—না দেবে তো না দেবে। না খেয়েই থাকব আমরা। কুলিরা আবার পেট ভরে কবে খায়! তাই বলে কোম্পানীর জবানের দাম নেই!

একটু দূরে গাছের গোড়া সাফ করছিল শ্রীমতী। হরিশের অপমৃত্যুর পর শ্রীমতী কেমন অসম্ভব রকম স্তব্ধ হয়ে গেছে। শ্রীমতীর

মাতাল হাসি এক সময় বাগানের সবুজের ঢেউয়ে নেশাল হাসির ঝাপটা দিত। সে কথা এখন সবাই প্রায় ভুলেই গেছে। উত্তপ্ত আলোচনাটায় তার যেন কোন ভূমিকা নেই। মাথা নীচু করে নির্বিকার মুখে কাজ করে যাচ্ছে। সে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটার জন্য শ্রীমতীকে দায়ী করে কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল বিন্দিয়া। শ্রীমতীকে এখন একটি অসহায় রোগাক্রান্ত বিবর্ণ চা পাতার মত করুণ লাগছে। তবু কথাটা ছাড়ল না বিন্দিয়া। বলল—আমরা কাম বন্ধ করলে পাতা উঠবে না। কারখানা চলবে না। তখন কি করবে কোম্পানী!

চণ্ডলা বলল—আজকাল কুমিল্লা বরিশাল থেকে লোক আসছে বাগানে পাতা তুলতে। কোম্পানী আমাদের ছাঁটাই করে তাদের নাম তুলে নেবে খাতায়।

বিন্দিয়া যেন কোন অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রুখে উঠল—কেন আসবে রে বাইরের লোক। বাপ-দাদার আমল থেকে আমরা পাতা তুলে আসছি। বাগান আমাদের। ইচ্ছা হলে আমরা কাম করব। ইচ্ছা হলে বন্ধ করব।

সর্দার দাঁতে খৈনী টিপে হুংকার ছাড়ল—হেই রেন্ডীরা। কাম ফেলে সব মিটিং শুরু করেছিস দেখি। হাত চালা। জবান সামাল দে।

আলোচনাটা চাপা পড়ে গেল।

বড়বাবু খুব লম্বা লম্বা পা ফেলে কোয়ার্টারে ফিরছিল। মনটা তার গভীর চিন্তাচ্ছন্ন। অ্যাকসিডেণ্ট নিয়ে কদিন খুব ঝামেলা গেল। ইন-কোয়ারি কমিটি বসল। ঢাকা থেকে রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর এল। প্রথমে একটু বিচলিতই হয়েছিল বড়বাবু। আজ ইফতেখার সাহেব তাকে ডেকে নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন। বড়বাবু এ বাগানে অনেক সাহেব আসতে যেতে দেখেছে। ইফতেখার চৌকস ছেলে বুঝতে তার অসুবিধে হয় নি। আশ-রাফের মত দুর্দান্ত সৎ মানুষ নয়। অ্যাকসিডেন্টের জন্য আশরাফ আর অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজারকে দায়ী করে ইফতেখার আবার চিঠি দিয়েছে রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরকে। এমনিতে তো আশরাফ আর ডিরেক্টরে ভাল বনা-বনি হচ্ছে না। এবার নির্ঘাৎ ফেসে যাবে। ইফতেখার একটু আশা দিয়েছে সে অ্যাকটিং ম্যানেজার হলে বড়বাবুকে প্রমোশন দিয়ে অ্যাসিসটেণ্ট ম্যানে-জার করে ফেলবে। মনটা আশায় দুলছে বড়বাবুর। ইংরেজ আমলের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী নিয়মই একরকম পালটেছে। একজন এল-ডি যদি প্রমোশন পেয়ে পেয়ে সেকশান অফিসার হতে পারে তবে চা বাগানের বাবুরা

কেন সারা জীবন অচ্ছুৎ র‍্যাংকার হয়ে থাকবে। আশরাফের ওপর মনটা তার এমনিতেই বিষিয়ে ছিল।

প্ল্যানটেশান বাড়াবার জন্য যে এলাকাটা কোম্পানী উনিশ'শ উনষাট সালে নিজস্ব এলাকাভুক্ত করবার এলটমেণ্ট পেয়েছিল সেটায় আর বাগান বসান হয় নি। কুলিদের চাষ-বাসের জন্য কিছু জমি দেওয়া হয়েছে সেখানে। বাকিটায় রয়েছে অনাবাদী জঙ্গল। গোপনে কিছু কুলিকে কাঠ বাঁশ কেটে বিক্রি করবার ইজারা দিয়েছেন বড়বাবু হায়াত আলী। বিক্রির অর্ধেক টাকা তার ছিল। এটা কেমন করে জানতে পেরেছে আশরাফ। বড়বাবু সামনে গলে জল হয়ে গেছে। পেছনে গালি দিয়েছে। কলম ঘষা আর তৈল মর্দনের গুণে এ বাগানের বড়বাবু হয়েছে। কত বাঘা বাঘা ইংরেজ গার্ডেনারদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে তাকে। ইংরেজ সাহেবরা তো কুলিদের চেয়ে নিকৃষ্ট জীব মনে করত সদা হাত জোড় করে থাকা এই বাবু শ্রেণীকে। সাহেবদের দেখলে দশ হাত দূর থেকে সালাম দেওয়া শুরু করত হায়াত আলী। সাহেবরা এমন ভাবে সালামের উত্তর দিতেন যেন পোষা কুকুরকে করুণা বিতরণ করছেন। অবশ্য তা নিয়ে আক্ষেপ নেই বড়বাবু হায়াত আলীর। কড়া আর দাপটওয়ালা না হলে আবার সাহেব কিসের। তবে এখন মানে বাংলাদেশ হবার পর হায়াত আলীর চিন্তার জগতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। চিরটা কাল বাবু কোয়ার্টারে কাটল। পাকা দেওয়ালের তিন কামরা ঘরটার মধ্যে যে এতদিন চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে বড় বাংলোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে। করবে নাই বা কেন। একই দেশের একই চামড়ার একই রক্তের লোক ম্যানেজারীর আয়েশ করছে। মন তার বিষিয়ে উঠবে না কেন। ইফতেখারের সঙ্গে নির্দ্বিধায় যোগ দিয়েছে বড়-বাবু। এইবার দেখা যাক আশরাফ আহমেদের জোর। ম্যানেজার হয়েই তো গোলমাল লাগিয়েছে। কুলিদের জন্য দরদের সীমা নেই তার। বড়বাবুকে তো ওয়ার্নিংয়ের ওপর ওয়ার্নিং। অভিযোগ অনেক। জঙ্গলের বাঁশ কাঠ বিক্রি করবার অপরাধ। কুলিদের নামে জমি লিখিয়ে নিজে বরগা দিয়ে ফসল তোলার অভিযোগ। তবে কত বাগানের বাবুরাই তো এসব করে। ম্যানেজার দেখেও দেখে না।

কোয়ার্টারে উঠতে গিয়ে হায়াত আলী দেখল শিউরাম বসে আছে বারান্দায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতের মত উঠে দাঁড়াল লোকটা—সালাম বড়বাবু।

বড়বাবু চারিদিকে দেখে নিয়ে বলল—ভেতরে আয়।

শিউরাম বড়বাবুর সঙ্গে ভেতরে এল। বড়বাবু নিজেই একটা মোড়া এগিয়ে দিল—বস শিউরাম। তারপর খবর কি রে?

শিউরাম গোঁফের আড়ালে হাসল—ঠিকঠাক মত কাম কইরে দিচ্ছি বাবু। কুলিদের বুঝাইছি কোম্পানী বোনাস বাড়াইয়ে আবার কাইটে দিল। লতুন বাগান বসাইছে না। এটা হামরা মানব না। কাম বন্ধ কইরে দেব।

বড়বাবু খুশি মনে একটা মোড়া টেনে বসল—বেশ। কুলিরা তা হলে খুব ক্ষেপেছে।

—হ বাবু। পুজোর পর আর কাম করবে না কেউ!

—কেন? পুজোর পর কেন? কাল থেকেই কাম বন্ধ করিয়ে দে।

—সবাই বলে পরবের আগে কাম বন্ধ করা যাবে না।

বড়বাবু একটু চিন্তিত হল। ম্যানেজার সাহেব ঢাকায় গেছে এইসব ব্যাপারে রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করতে। তার মধ্যেই গোলমালটা লাগিয়ে দিতে পারলে ভাল হত।

শিউরাম ধূর্ত চোখে তাকাল—বাবু হামি কাম বন্ধ করাইয়ে দিব। তার আগে হামার লতুন জমিনের বন্দবস্ত করাইয়া দিতে হোবে।

বড়বাবু উদার হাসল—আরে দেব দেব! নতুন ম্যানেজার এলে তোকে তিন রোজের তলবে সুপারভাইজার বানিয়ে দেব।

কি মনে করে বড়বাবু পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে শিউরামের হাতে দিয়ে বলল—যা পাট্টায় গিয়ে চাঙ্গা হয়ে নে।

শিউরাম উঠে দাঁড়াতেই অর্জুন আর রাজিন্দর এসে উঠল বারান্দায়। শিউরাম দ্রুত পাশ কাটিয়ে নেমে গেল। বড়বাবু মুহূর্তে মুখের রেখা তলবঘরের কাঠের টেবিলের মত শক্ত করে ফেলল। রুক্ষ কণ্ঠে বলল—কি রে কি চাস তোরা?

রাজিন্দর সালাম দিয়ে বলল—বাবু হামরার বোনাসের টাকা কম্‌তি হয়ে যাবে শুনলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত মুখ করল বড়বাবু না করে উপায় আছে। এতবড় লোকসানের ধাক্কাটা গেল কোম্পানীর। এরপর হয় তো ম্যানেজার সাহেব হফ্‌তার তলব কমিয়ে দেবার হুকুম দেবেন। কপাল খারাপ তোদের। আমি কি করব বল।

অর্জুন এবারে কথা বলল—কপাল তো হামাদের সারা জনমই খারাপ বাবু। কারখানায় অ্যাকসিডেন হইল, গুদামে আগুন লাগল। আসামী তো সাজা পাইল। তবে হামরা কি কসুর করলাম?

বড়বাবু নৈর্ব্যক্তিক মুখটা কিছু নরম করল—কোম্পানীর লস তাদের ঘাড়ে চাপল। বড় দুঃখের কথা। কি যেন পুরো বোনাসই না বন্ধ হয়ে যায়।

বোনাসের বিল পাস হয়ে গেছে। সেটা ইচ্ছে করেই চেপে গেল হায়াত আলী।

অর্জুন শুকনো মুখে বলল—বাবু সারা বছর বালবাচ্চা পরবের বোনাসের আশায় থাকে। বোনাস না হলে পরব হবে কি করে ?

রাজিন্দর বলল—তা হইলে বাবু হামরা ম্যানিজার সাহেবের কাছে যাবো ?

বড়বাবু চমকে উঠলেন। সাহস কত ব্যাটাদের। কুলি হয়ে নালিশ নিয়ে যাবে ম্যানেজারের কাছে। হবে না-ই বা কেন। ইংরেজ সাহেবরা চলে গিয়ে আইন-কানুন সব পান্তা ভাতের মত ঠান্ডা হয়ে গেছে।

ধমক দিয়ে উঠল বড়বাবু—খুব যে বড় বড় কথা বলছিস। দু'পয়সার কুলি যাবে ম্যানেজার সাহেবের কাছে।

অর্জুন দৃঢ় কণ্ঠে বলল—যাবই তো। ম্যানিজার সাহাব আমাদের দেওতার মত লোক।

বড়বাবুর মেজাজ খিঁচড়ে গেল—দেওতার মত লোক। বেশ তো যা দেবতাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো কর। তবে বোনাস বেড়ে পাহাড় হয়ে যাবে। আমার কাছে এসেছিস কেন।

—হুঃ। খুব যে গরম। ব্যাটারা আমার কাছেই বা আসিস কোন্ সাহসে। তোদের পঞ্চায়েত কি নেশা করে ঘুমিয়ে গেছে না কি ?

অর্জুন মাথা তুলল—আমরা জানি বাবু কে আমাদের শত্রু আর কে আমাদের বন্ধু। আমাদের রুজী যারা মারবে চা গাছ ছাঁটার মত তার মাথাটাও ঘাড়ের ওপর থেকে হেটে দেব।

বড়বাবু মনে মনে বিচলিত হল। তেরোত্তুরের লেবার ট্রাবলের পর কুলিরা অনেক সাহসী হয়ে গেছে। এখন তাদের কুলি বলা যায় না। বলতে হয় লেবার।

বড়বাবু কণ্ঠস্বর নরম করল আবার—আমার এখানে কেন ঝামেলা করিস। দরকার হলে কাম বন্ধ করে দে। কোম্পানী তোদের সব দাবি মেনে নেবে।

অর্জুন আর রাজিন্দর এক পলক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল বড়বাবুর ধূর্ত চোখে।

অর্জুন ধীরে ধীরে বলল—কাম কেন বন্ধ করব রে বাবু। কাম বন্ধ হলে আমরাই না খেয়ে মরব।

বড়বাবু এবার প্রচন্ড রেগে উঠল—যা তাহলে মর গিয়ে। আগামী হফ্‌তায় তলব নিতে আসবি যখন তখন বুঝবি বড় বড় কথা কোথায় থাকে।

বড়বাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে রাজিন্দর বলল—কাজটা ভাল হল না রে অর্জুন।

অর্জুন কড়া মেজাজে কথা বলল—কি ভাল হল না ?

—বড় বাবুকে চটান। সামনের হফ্তায় দেখিস ঠিক তোর আর আমার তলব কাটা যাবে।

অর্জুন রাগে জ্বলতে জ্বলতে উত্তপ্ত জবাব দিল—কাটা যায় তো যাবে। শালা ঘুঘু।

নীরবে হাঁটতে লাগল দুজন। কিছুক্ষণ পর অর্জুন বলল—শালা সুরেশটা হরিশকে মারল। আর আমরা এখন ঝামেলা করি। ঘুঘু বড়-বাবুটা বলে কি না কাম বন্ধ করে দে। তাহলে তো ওর পোয়া বারো। ইচ্ছেমত অপছন্দের কুলিদের ছাঁটাই করে দেবে।

রাজিন্দর বলল—শালা এত ঝামেলা আমার ভাল লাগে না। তুই বাড়ি যা। আমি পাট্টায় চললাম।

অর্জুন আবার ক্ষেপে উঠল—রাখ তোর পাট্টা। এদিকে সবার রুজির মামলা।

রাজিন্দর হাসল—আরে পাট্টায় গিয়ে বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মাথাটা হালকা হয়ে মন ফূর্তিতে ভরে উঠবে।

রাজিন্দরকে পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে চলল অর্জুন। রাজিন্দরও এল ওর পিছনে। সামনেই মহাজন ফয়েজ আলীর দোকান। মাদ্রাজী পাড়ার সুখন কি সব সওদা করছিল। অর্জুনকে ডেকে বলল—হেই অর্জুন, এবার পুজোয় চপ যাত্রা হবে তো ?

রাজিন্দর হাসল—বুড়োটা আছে ভাল। সারা বছর মহাজনের দোকানে শুয়ে শুয়ে টাকা বাকি খাচ্ছে। মহাজনটা গালি দেয় আবার কর্জও দেয়।

অর্জুন এতক্ষণে হাসল—তা বটে। এদিকে বাড়ির সব কিছু বন্ধক দেওয়া হয়ে গেছে। হালের গরু দুটোও বন্ধক রেখেছে! জমিটা চাষ করতে দিয়েছে ওদেরই পাড়ার কাকে যেন।

—করবে কি। সংসারটা তো কম বড় না। ছোট ছেলেমেয়েগুলো তিন টাকা রোজে পাতা তুলত। বাগানে পাতা কমে যাবার পর ছাঁটাই হয়ে গেছে।

—আরে সুখনটাও ছন্নছাড়া। যা পায় একদিনেই খেয়ে ফেলে।

—কুলি পাড়ার সবাই তো তাই করে। টাকা পায়, খায়। মহাজনের দেনা শোধ করে। তারপর যা আবার তাই!

সুখন চাল ডাল আটার পোঁটলা বাঁধতে বাঁধতে বলল—এবার কিন্তু যাত্রাটা ভাল করে করতে হবে রে।

মহাজন হিসেবের খাতায় চোখ রেখে বলল—এ্যাই সুখন। এবার তোর বউ ছেলেমেয়ে সবার বোনাসের টাকা দিয়ে আমার দেনা শোধ করবি।

মনে থাকে যেন।

সুখন পোঁটলা মাথায় তুলে জবাব দিল—সে কথা আর তোমাকে বলে দিতে হবে না।

সুখন চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। তখনি একদল কুলি দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। দলের মধ্যে থেকে বৃন্দাবন ছত্রি বলল—কোথায় বোনাস। এবার তো কোম্পানী বোনাস দেবে না।

ফয়েজ আলী হিসেব থেকে মুখ তুলে বিস্ফারিত চোখে তাকাল—কে বলল ?

—বলবে আবার কে। শিউরাম এইমাত্র বড়বাবুর কাছ থেকে শুনে এল। কাল থেকে আমরা কাম বন্ধ করব।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল ফয়েজ আলী—বলছিস কি তোরা। কাম বন্ধ করলে যে না খেয়ে মরবি।

কে একজন কুলি খুব উষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—মরি তো মরব। কাল থেকে কাম বন্ধ।

হল্লা অর হট্টগোলের মধ্যে দ্রুত পায়ে সুখন সরে পড়ল। কুলিরা চিৎকার করতে লাগল—কাম বন্ধ। কাম বন্ধ। কেউ কাল থেকে গুন্তির হাজিরায় যাবে না।

অর্জুন রুখে দাঁড়াল—না। কাম আমরা বন্ধ করব না। আগে মানিজার সাহাবের সঙ্গে ফয়সলা করব। তারপর যা হয় হবে।

শিউরাম এসে দাঁড়াল অর্জুনের সামনে—তুই তো বড় সর্দার লীডার বনে গেছিস দেখছি। আমি বলছি কাম বন্ধ।

রাজিন্দর তেড়ে উঠল—তোমার কথা কেন শুনব। আগে পঞ্চায়েত ফয়সলা করুক। তারপর কাম বন্ধ করব আমরা।

ভীষণ হট্টগোল আর হৈ চৈ বেধে গেল। বিষ্ণু এল ছুটতে ছুটতে—এই তোরা হল্লা করিস না। মানিজার সাহাব এসে গেছে। আমরা পঞ্চায়েতের মেম্বাররা যাচ্ছি তার সঙ্গে কথা বলতে। তোরা ঠাণ্ডা হয়ে বস।

শিউরাম কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। পঞ্চায়েতকে হাত না করার আফ-সোসে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হল তার। পঞ্চায়েত কখনই কাম বন্ধ হতে দেবে না। তার তিন রোজ তলবের সুপারভাইজারির আশাটা মাঠে মারা যায় কি না কে জানে।

পরদিন সবাই শুনল পঞ্চায়েত সুখবর এনেছে। বোনাস কাটা যাবে না। পুজোর খরচ অর্ধেক কোম্পানী দেবে। সকালে নিশ্চিন্তমনে গুনতির টাইমে তলব ঘরের সামনে হাজিরা দিল সবাই রোজকার মত। গুনতিতে

সুখনকে পাওয়া গেল না। খবরটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল বাগানে। কুলি লাইনের সব পাড়ায়। সুখন বউ ছেলেমেয়ে সব নিয়ে পালিয়েছে। রাতের অন্ধকারে কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। খবরটা ভয়ংকর দুঃসংবাদের মত হয়ে পেঁাছল ফয়েজ আলীর কাছে। চিৎকার করে দোকান মাথায় তুলল ফয়েজ আলী। ফয়েজ আলী কি এমনি ছাড়বে না কি! বড়বাবুর কাছে নালিশ দিয়ে থানায় ডাইরী করে এল। একবার ধরা পড়ুক বাছাধন। ওকে যদি জেলের ভাত না খাইয়েছে তো ফয়েজ আলীর মহাজনী কারবারই মিথ্যে। সুখনকে উপলক্ষ্য করে গোটা কুলিজাতের গোষ্ঠী উদ্ধার করতে লাগল ফয়েজ আলী। বাকির টাকা যারা ফেলে রেখেছে এবার থেকে গলায় গামছা দিয়ে তাদের টাকা আদায় করবে ফয়েজ আলী। অনেকে বলাবলি করল—বোকা সুখনটা বোনাস পাওয়া যাবে না শুনে ভয়েই পালিয়েছে। বোনাসের টাকায় ও কিছু ধার শোধ করবে ভেবেছিল। সকলে ধরে নিল দু'একদিনের মধ্যেই সুখন ফিরে আসবে। কোথায় আর যাবে। আশেপাশের কোন বাগানে গিয়ে হয় তো উঠেছে।

হালকা ছাঁটায়ের পর কলম ছাঁটাই শুরু হয়েছে। বাগানে কাজ কম। পুজোর উৎসবের আনন্দে আছে সকলে। প্রচুর জামা কাপড় প্রসাধনী বিক্রি হচ্ছে ফয়েজ আলীর। কিন্তু সুখনের টাকার শোক সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কলম কাটতে কাটতে অর্জুন বলল লক্ষ্মণকে—ব্যাটা শিউরাম সর্দার না কি বড়বাবুর সঙ্গে শলা করে কাজ বন্ধ করিয়ে আমাদের রুজী মারবার ব্যবস্থা করেছিল।

রাজিন্দর একটু দূরে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল। বলল—সুখনটার কোন খবর পাওয়া গেল না। এমন করে পালাল।

অর্জুন সুখনের জন্য দুঃখবোধ করল—না পালিয়েই বা করবে কি। এত ধারের বোঝা ও জীবনেও শোধ করতে পারত না। তা না হলে শত দুঃখেও কেউ বাগান ছেড়ে যায় না।

সামনে পুজোর পরব। মনটা খারাপ হল সবার। কি যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

দিন কয়েক পরেই সুখনের পরিবার একটা দুর্ঘটনা হয়ে ফিরে এল। ধারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সুখন সপরিবারে পালিয়েছিল। কিন্তু পালিয়ে যেতে পারে নি। তেলিয়াপাড়ার বাগানের বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকবার মুখে আগরতলা সীমানায় বি. এস. এফ-এর গুলীতে মারা পড়েছে সুখন। রাতের অন্ধকারে বি. এস. এফ. ক্যাম্পের রক্ষীরা স্মাগলার ভেবে

দাঁড়াতে বলেছিল ওদের। দীর্ঘ পথ হেঁটে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর সুখন এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মিলিটারীর আওয়াজে সবাই লুকিয়ে পড়েছিল। আর সুখন কেমন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। উলটোপালটা ছুটতে শুরু করেছিল। বাধ্য হয়ে রক্ষীরা গুলী করেছিল। ধরা পড়েছিল সুখনের পরিবারের সবাই। দিন কয়েক পরে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পেয়ে যাবে আর কোথায়! আবার বাগানেই ফিরে এসেছিল। বেচারা সুখন ভেবেছিল আগরতলার বাগানে কাজ নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবে। মহাজন করোত দালালীর হাত থেকে বাঁচবে। পুজোর আগে পরপর দুটো দুর্ঘটনায় সবাই কিছু বিচলিত হল। বিষণ্ণতা ছড়িয়ে রইল কুলিদের মুখে। সেই বিষণ্ণতার ছায়া সরিয়ে আনন্দের আগমনী জানিয়ে মহামায়ার আগমন বার্তার ঢোল বেজে উঠল। বাগানে কদিন আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। নতুন কাপড় পরে সবাই প্রতিমা দেখতে এল। চণ্ডলা গড় হয়ে চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে দিল।

—মা আমাদের অমঙ্গল দূর করে দাও। বাগানে সুদিন আসুক।

খোলা করতালের ঐক্য তানে ধূপধুনোর আরতির মধ্যে মা দুর্গার চোখে তাকিয়ে শঙ্কমনের সর্দার শিউরামের বুক কাঁপল। হাত জোড় করে কাঁপা ঠোঁটে বিড়বিড় করল সে—মা, আমার কোন দোষ নেই। আমি বাগানের সঙ্গে কুলিদের সঙ্গে দুশমনী করতে চাই নি। ওই বড় বাবুটা আমাকে লোভ দেখাল।

ধুমধাম খাওয়া-দাওয়া হল। বিজয়ার পর তিন রাত ধরে হ্যাজাকের আলোয় যাত্রা হল। চুয়ানী আর হাঁড়িয়ার নেশায় মাতাল হয়ে ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়ো সব দুঃখ অভাব ভুলে গেল। পুজোয় পাওয়া বাড়তি বোনাস এক সপ্তাহেই খরচ হয়ে গেল সবার। তারপর ফিরে এল আবার আগেকার দিন। এক বেলা রুটি আর লবণ গোলা রং চা।

পুজোর পর লক্ষ্মণ এল পঞ্চায়েত আফিসে সঙ্গে আরো কিছু কুলি। বিষ্ণু পঞ্চায়েতের মেম্বার হয়েছে। তাকেই ধরে পড়ল সবাই। এবার আর নতুন বাগান না বসালে চলবে না। শীতের মৌসুমটায় কাজ এমনিতেই কমে গেছে। অনেকেই বেকার। নতুন বাগান বসালে কুলিরা কাজ পাবে। তিন বছরের মধ্যেই আরো বেশি পাতা উঠতে শুরু করবে। ম্যানেজার সাহেবকে আবার বলতে হবে। তা না হলে কি খেয়ে কেমন করে বাঁচবে কুলিরা। দেনার ভারে সুখনের মত সকলকেই বেঘোরে মরতে হবে যে।

দশ

থানিয়া জয়ন্তিয়ার উন্মুক্ত সবুজের ওপর দুপুরের রোদ জ্বলছে। রবার্ট মাইক্রোটেকারেপ তলায় একটা চা পাতা রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। আশরাফ ভেতরে এল—হ্যালো বব।

রবার্ট অন্যমনস্ক আত্মগত জোবাব দিল—হ্যালো।

আশরাফ বুঝল রবার্ট মুখে স্বাগত জানালেও কারো উপস্থিত সম্পর্কে সচেতন নয় ও এখন। রবার্টের টেবিলে অনেকগুলো কাঁচা চা পাতা। ট্রের ওপর কিছু মাটি। কাচের জারে এক ঝাঁক উরচুংগা পোকা। আরেকটা জারে চা গাছের মাটির উই। আশরাফ নিঃশব্দে বারান্দায় চলে এল। মোড়া টেনে বসল। শেষ শরতের নীল রং ছায়া ফেলেছে শীর্ণকায়া পাহাড়ীর নদীর বুকে। ওপারে বনে বাতাসের উদাস মর্মর ধ্বনি। নদীর আর পাতা ঝরার মর্মর ধ্বনি সত্ত্বেও চারিদিকে কেমন এক নির্জনতা আচ্ছন্নের মত ছড়িয়ে পড়ে আছে। আশরাফ একটা সিগারেট ধরাল। গাড়ি চালাবার দীর্ঘ পথক্লান্তি আর মানসিক অবসন্নতা নিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইল ডাউকীর সবুজে। মনের এক অস্থির উৎক্ষিপ্ততা তাকে রবার্টের এখানে নিয়ে এসেছে। একটু পরেই রবার্ট বেরিয়ে এল—হ্যালো! তুমি কখন এলে?

আশরাফ হাসল—এই তো কিছুক্ষণ। তুমি ব্যস্ত দেখলাম। তাই আর ডাকলাম না।

রবার্ট আবার চিন্তিত অন্যমনস্কতায় ডুবল। কিছুক্ষণ পরে বলল—জানো পালাতুরা বাগানের তিন চারটে সেকশানে বুশগুলো মরে যাচ্ছে। টি এল ওয়ার্মের আক্রমণ মনে করে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। তবে আমার কি মনে হচ্ছে জানো, এটা বোধহয় এক ধরনের নতুন কোন অসুখ।

আশরাফ এক দৃষ্টিতে রবার্টের দিকে তাকিয়ে রইল। রবার্টের চেহারায় ভীষণ উদ্বেগ। যেন রবার্টের কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন রোগাক্রান্ত হয়েছে। আসলে বোধহয় চা গাছই ওর একমাত্র আত্মীয়। তাদের জন্য ভাবনার অন্ত নেই রবার্টের।

চা গাছগুলোই যেন ওর সন্তান-সন্ততি। মানুষের মত ওদের অসুখ বিসুখ শত্রু আছে। উরচুংগা পোকা, লেদা পোকা, উই, লাল মাকড়সার দল সুযোগ পেলেই চা গাছকে আক্রমণ করে। তাছাড়া পরিচর্যা উপযুক্ত ছায়া আর সূর্যালোকের অভাবে অসুস্থ হয় চা গাছ। রক্তশূন্য রোগীর

মত নিষ্প্রাণ বিবর্ণ হয়ে মরে যায়। সেসব নিয়েই রবার্টের চিন্তা ভাবনার গবেষণার অন্ত নেই। কোন বাগানে একটু কিছু দেখা দিলেই রবার্ট সেখানে উপস্থিত। চা বাগানের বাতাসেই রবার্ট বুঝি সব কিছুর গন্ধ পায়।

আশরাফের আঙুলে সিগারেট পুড়ছে। রবার্ট হঠাৎ মুখ তুলল—কি হয়েছে আশরাফ?

সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল আশরাফ- -কিছু না।

রবার্ট কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আশরাফের দিকে। তারপর মৃদু হাসল—আশরাফ চায়ের সেই সফ্‌স্টিকেটেড্ জোকটা তো জান নিশ্চয়ই। একজন উঁচুদরের চা-খোর চায়ের পেয়ালায় একটা সীপ করলেই বলতে পারেন যে ট্রাকটর পাতা নিয়ে লীফ হাউসে আসবার পথে চাকা বার্স্ট করেছিল। তাতে চায়ের স্বাদের পরিবর্তন ঘটেছে।

আশরাফ হেসে ফেলল- জানি।

—তাহলে বুঝতেই পারছ যে তোমাকে দেখেও আমি অনুমান করতে পারছি কিছু একটা গোলযোগ ঘটেছে।

আশরাফ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—ভাবছি চাকরি ছেড়ে দেব। কোম্পানীর সঙ্গে আমার মতে মিলছে না।

রবার্ট আবার মৃদু হাসল -সিনসিয়ার ম্যানেজারদের কোনদিন মেলে না।

আশরাফ এবার উত্তেজিত হল--কোম্পানী যে পলিসীতে কাজ করছে তা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন অফ সীজন। অর্ধেক লেবার ছাঁটাই হয়ে বসে আছে। অথচ আমার কিছু করবার নেই। বাগানের অর্ধেক গাছের বয়স পঞ্চাশ ষাটের বেশি। ওগুলো তুলে নতুন ইনভেস্টমেন্টে ডিরেক্টর মোটেই রাজী নয়। প্ল্যানটেশানে খরচ বাড়ালে আমার মনে হয় প্রতি একরে আরো দু'তিন গুণ বেশি প্রডাকশান হবে। অথচ আমার প্ল্যান প্রোগ্রামে কিছুতেই আগ্রহী নয় তারা। লাভের লাভ আদায় করতে তারা অন্ধ।

—তোমার ওই অ্যাকসিডেন্টের ঝামেলাটা মিটে গেছে?

—মিটেছে। তবে আজকাল জুনিয়ার ম্যানেজার লোয়ার স্টাফরা কাজের চেয়ে পার্টিবাজী করতেই আগ্রহী বেশি। হেডক্লার্কটাকে স্যাক করব ভেবেছিলাম। চিন্তা করে দেখ এদের পাঠান কমপ্লেনের জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হয় ডিরেক্টরের কাছে। ওসব নিয়ে অবশ্য আমি খুব একটা বিচলিত নই। চা পুড়ে যাওয়াটা নেহাত একটা দুর্ঘটনা এটা রেসিডেন্ট ডিরেক্টর ইনকোয়ারীতে এসে জেনে গেছেন। তবে বাগানের পলিসীর ব্যাপারে তিনি অনড়। ডিরেক্টরদের বোর্ড এ ব্যাপারে নতুন কোন চিন্তা ভাবনা করতে একেবারেই রাজী নয়। ইনভেস্টমেন্টের টাকা উঠে গেছে।

এখন প্রফিটের ওপর ব্যবসা করছে তারা। সীলোনে যে পলিসী নিয়ে তারা কাজ করেছিল ওখানকার বাগান সরকার নিয়ে নেবার আগে এখানেও তাই করছে। আসলে কথাটা সত্যি ব্রিটিশরা বেনিয়ার জাত।

রবার্ট মন দিয়ে আশরাফের কথা শুনছিল। বলল—তুমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। বস একটু চা তৈরি করে নিয়ে আসি।

রবার্ট উঠে ভেতরে গেল। আরেকটা সিগারেট ধরাল আশরাফ। মাথার ভেতরটা দুপুরের রৌদ্রদগ্ধ বনের মত জ্বলছে। আশরাফ তো ভাল করেই জানে লস খাচ্ছে বলে কোম্পানী যতই দোহাই দিক আসলে এটা একটা ভাওতা। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর কিছুদিন লসের ধাক্কা সামলাতে হয়েছে বটে। কিন্তু এখন তো সুসময় তাদের। মাটির বুক থেকে কুলিদের বুক থেকে রস টেনে যে পাতা উঠছে তা এখানকার সরকারের খাতায় খরচের নীচের দাগের ধরে রেখেছে কোম্পানী। আর ইংলণ্ডের বাজারে তার পরিমাণ যাদুমন্ত্রে বলে স্ফীত হয়ে যাচ্ছে। এতদিনের খরচ বিন্দু বিন্দু করে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইংলণ্ডের চা বাগানের ব্যবসায়ীরা। সিলোনের বাগান সিলোন সরকার ন্যাশনালাইজ করবার পর সবাই ভেবেছিল ব্রিটিশ চা ব্যবসায়ীরা বোধহয় পথে বসবে। এতদিনের শ্রম আর পয়সার বদলে যে বাগান গড়ে তুলেছে তাদের সে বাগান হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাতে ব্রীফকেস দুলিয়ে হাসিমুখে দেশে ফিরে গেল তারা। সাংবাদিকদের বলল--আমাদের কোন ক্ষতি হয় নি। সিলোনের বাগানে যে পয়সা ঢেলেছি আমরা তার চাইতে অনেক বেশি দেশে পাঠিয়েছি। আমরা বুঝেছিলাম কলোনী হাত ছাড়া হয়ে যাবার পর একদিন ব্যবসা গুটিয়ে আমাদের চলে আসতেই হবে। সুতরাং একটা বাড়তি পয়সা ইনভেস্ট করি নি আমরা। বাংলাদেশেও ঠিক তাই করছে ব্রিটিশ কোম্পানী।

রবার্ট চা নিয়ে এল। আশরাফের দিকে চায়ের পেয়ালা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—যে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ইংলণ্ডে, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ডের লোকের দিন শুরু হয় তারা অনেকেই জানে না এই এক পেয়ালা চায়ের পেছনে রয়েছে কত ইতিহাস। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাতই তো হয়েছিল প্রথমে চা-কে কেন্দ্র করে। বোস্টন বন্দরে ইংরেজের আমদানী করা এক জাহাজ চা ক্ষিপ্ত আমেরিকানরা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল।

রবার্ট ধূসর নীল দৃষ্টি মেলে তাকাল—আশরাফ তুমি কি তাদের কথাও ভাবো নিজের জীবন তুচ্ছ করে যারা এই বাগানের উন্নতি করে গেছে?

আশরাফ মাথা তুলল—কিছু মনে কোর না বব। তুমি তো ইংরেজ শাসনের সোনালী যুগে এ দেশে এসেছিলে। বিভেদটা তোমার চোখে

পড়ে নি। স্পেনসার কোম্পানীর মালিকের ছেলের ঘুম ভাঙত বিরাট প্যালেসে রুপোর চায়ের কেটলি বিছানার পাশে নিয়ে। অথচ এই বাগানে একটি ক্রীতদাসের মত কুলির ঘুম ভাঙত কাঁচা চা পাতার বুনো গন্ধে। দিন শুরু হত এক মগ নিকৃষ্ট লবণ গোলা কালো চা দিয়ে। এখনও কি এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে?

রবার্ট ধূসর নীল দৃষ্টি মেলে তাকাল—আশরাফ তোমার কি মনে হয় যে সব ইংরেজ এই চা বাগানে কাজ করে গেছে তারা সবাই কি ওই একই দৃষ্টিভঙ্গীর ছিল? কেবল রুপোর পটে সোনালী চায়ে তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল? দিনের পর দিন বছরের পর বছর যে সব ইংরেজ গার্ডেনার পড়ে থাকত এখানে চা ছাড়া আর কোন চিন্তা তাদের অনেকেরই ছিল না। ক্রমে এইসব মেশিনপত্র কারখানা তারাই উদ্ভাবন করেছে। চায়ের উন্নতিই ছিল তাদের চেষ্টা। এমন কি অনেকে শেষ বয়সে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েও নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে নি। যেমন আমি......

হঠাৎ থেমে গেল রবার্ট। তারপর হাসল· আমরা চায়ের লোক। কোন দেশের নই। টেলরের কথা মনে আছে তোমার? মনে আছে মারডকের কথা?

আশরাফ মাথা নাড়ল। টেলরকে সে দেখেছে। মারডকের গল্প শুনেছে। মারডক চা বাগানের মালিকের ছেলে। সোনার চামচ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে চলে এসেছিল আসাম সিলেটের চা বাগানে। বাগানের এক কুলি মেয়েকে বিয়ে করেছিল সে। বাংলো ছেড়ে থাকতো কুলি লাইনে। ইংরেজের আভিজাত্যের খোলসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কুলিদের হয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে সে আর দেশে ফেরে নি। এদেশেই মৃত্যু হয়েছিল তার। আর স্কটিশ টেলরের বিখ্যাত কঞ্জুস বলে নাম ডাক ছিল। কোনদিন ক্লাবে যেত না বিল দিতে হবে এই ভয়ে। একটা মুরগী কিনে হিসেব করে তিন দিন খেত। খরচ আর ঝামেলা বাড়াবার ভয়ে বিয়ে করে নি। কেউ তাকে কোনদিন স্যুট পরতে দেখে নি। একটা সবুজ জাম্পার পরেই না কি তার সারাটা জীবন কেটেছে। সেই টেলরকে লোকে নতুন করে চেনল তার মৃত্যুর পর। সারাজীবনের সঞ্চয় সে ইণ্ডিয়ার এক অন্ধকল্যাণ সমিতিকে দান করে গেছে।

রবার্ট আবার বলল—বুশের কথা ভাবো। সারাদিন বাগানে পড়ে থাকত। সারারাত মাথা ঘামিয়ে নতুন মেশিন উদ্ভাবনীর কাজে লেগে থাকত। আর নিজের মায়নাটা সম্পূর্ণ দান করে দিত কুলিদের। শেষ বয়সে তাকে এক রকম স্টার্ভ করতে হয়েছে। লেগ এর কথা শুনেছ তো যে নিজেই ওই লেগকাট মেশিন আবিষ্কার করতে নিরন্তর পরিশ্রম

করেছে। সার্ভিসের খাতায় এরা কেউ হয় তো ফুলমার্ক পায় নি কিন্তু হিউম্যানিটির খাতায় তারা পুরো নম্বরই রেখে গেছে। চায়ের মানুষ হিসেবে তারা সাকসেসফুল হয়েছে। সুতরাং পিছিয়ে যেও না। আশরাফ। তুমি তো আর ম্যানেজারদের মত নও। তুমি হচ্ছ চায়ের মানুষ। চায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তোমার ঘুম ভাঙবে। ঘুমিয়েও তুমি চায়ের স্বপ্ন দেখবে।

আশরাফ এতক্ষণে কথা বলল—কিন্তু বব। পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও অনেক বদলেছে। মনে কর যে ইংল্যান্ডকে তরুণ বয়সে তুমি ছেড়ে এসেছিলে একদিন। ফিরে গিয়ে সেই ইংল্যান্ডকে তুমি পাও নি। তোমাদের জেনারেশানের কাছে যে এক্সপ্লয়টেশান স্বাভাবিক মনে হয়েছে। আমি তা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারি না। কারণ আমি এ যুগের মানুষ।

রবার্টের লালচে চুল উড়ে পড়েছে কপালে। থেমে থেমে ভেবে ভেবে কথা বলল রবার্ট—কনফ্লিকট আর কনফিউশানটা সব যুগেই ছিল আশরাফ। ওয়েল তোমার ডিসিশান সম্পর্কে আবার তুমি দ্বিতীয় চিন্তা করে দেখবে আশা করছি। তবে আমি যদি তুমি হতাম তা হলে চায়ের বাগান ছাড়তাম না। দরকার হলে দেশী ওনারের বাগানে চাকরি নাও। জানি না সেখানে কতটুকু সুবিধা হবে।

আশরাফ জবাব দিল না।

অনেক রাতে ফিরে রিণাকে সিদ্ধান্তের কথাটা বলল আশরাফ। রিণা দুর্বোধ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর রেগে উঠল।—ওই পাগলা রবার্ট নিশ্চয়ই এসব ঢুকিয়েছে তোমার মাথায়।

আশরাফ দৃঢ় উত্তর দিল—শুধু শুধু রবার্টকে দোষ দিও না। আমি নিজে কি ভাল মন্দ বুঝি না।

রিণা এবার ভয় পেল—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

ঘরে অল্প পাওয়ারের সবুজ আলো জ্বলছে। সাদা নাইটগাউন পরা রিণাকে মনে হচ্ছে একটা সবুজ প্রজাপতি। রিণা আঁকা ভ্রূ নিক্ষেপ করল আশরাফের উদ্দেশ্যে—স্পেনসারের চাকরি ছেড়ে তুমি যাবে নেটিভ গার্ডেনে। লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে আমি। ওঃ হরিবল।

একটু থেমে আবার বলল—সব চেয়ে বেশি হাসবে ইফতেখার। এমনিতে তো ও নানারকম শত্রুতা করছে। তুমি সরে গেলেই ও ম্যানেজার হয়ে বসবে। কখনই তা হতে দেব না আমি।

যেন যুদ্ধ ঘোষণা করল রিণা। ক্ষোভে দুঃখে তার প্রায় চোখে পানি এসে যাবার জোগাড়। যতই ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে হোক চা বাগানের পরিবেশ এর মোহ তবু গ্রাস করেছে রিণাকে। এই মোহের জাল ছিঁড়তে কিছুতেই দেবে না রিণা। কার কাছে এখন সাহায্য চাইবে রিণা। কাকে বলবে আশরাফের পাগলামি থামাতে। আশরাফ নিস্তব্ধ হয়ে আছে। চা পাতা পুড়বার ইনকোয়ারিতে এসে রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর অবশ্য বলেছেন--এটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট হিসেবেই ধরা হচ্ছে। তবে একজন ম্যানেজারকে যতখানি সতর্ক থাকা দরকার ততখানি সতর্কতা ভবিষ্যতে তোমার কাছ থেকে পাবো আশা করছি। যদিও তোমার নামে অনেক কমপ্লেন আমি পেয়েছি।

নার্সারীর গাছগুলো সতেজ হয়ে উঠছে না। চারা বসাবার সময় মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিমিনাশক ওষুধ দেওয়া হয় নি। আশরাফ তো জানিয়েই দিয়েছে গাছের জন্য ওষুধপত্র কেনা বাবদ যে টাকা লাগে তা তাদের মঞ্জুরীকৃত টাকায় হয়ে ওঠে না। ফিরে গিয়ে ডাইরেক্টর জানিয়েছেন নতুন প্লানটেশান বসান একেবারেই বন্ধ। ওদিকে পঞ্চায়েত আসছে রোজ দাবি নিয়ে। বেকার কুলিদের একটা ব্যবস্থা না করলে কুলিরা না খেয়ে মরবে।

আশরাফ হঠাৎ উঠল। লেখার প্যাড আর কলম টেনে নিল। রিণা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে কাছে এল--কি লিখছ?

আশরাফ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল--রেজিগনেশান লেটার।

রিণা চোখ নামিয়ে নিল। রিণার সারা মুখে সবুজ আলো কেমন ভেজা কুয়াশার রাত নিথর হয়ে পড়ে আছে। রিণার মনে হল কেমন একটা অনিশ্চয়তার কুয়াশায় ডুবে যাচ্ছে সে। এই বাগান ছেড়ে চলে যেতে হবে। এতদিনে রিণার মনে হল দুটি সবুজ পাতা আর একটি শিশু কুঁড়ি দুবাহু বাড়িয়ে যেন কাঁদছে। ধীরে ধীরে এসে আশরাফের কাঁধে হাত রাখল রিণা। মৃদু স্বরে বলল শোন।

আশরাফ মুখ না তুলে বলল--বল।

—তোমাকে একটা খবর দেবার ছিল।

এবারে চোখ তুলল আশরাফ—কি খবর?

রিণা চোখ নামিয়ে নিল। রিণার সারা মুখে সবুজ আলো কেমন আশ্চর্য মোহনীয়তায় ছড়িয়ে গেল। ভীষণ স্নিগ্ধ ভীষণ কোমল এখন রিণা। আশরাফের বুকের মাঝখানে হঠাৎ স্নিগ্ধ বাতাস মর্মরিত হল। কত দিন! কতদিন পরে রিণা আবার একটা কোমল ডানার প্রজাপতি হয়ে উঠেছে। রিণা খুব আস্তে বলল আমাদের সংসারে একজন আসছে। সেই নতুন মানুষটার কথা ভাব।

রিণা মুখ তুলল। আশরাফ মুগ্ধ। নার্সারীর চারাগাছগুলো কুয়াশা-মাখা সূর্যের আলোয় যেন চোখ খুলেছে। রিণা সতেজ চা গাছের মত সবুজ আলো ছড়িয়ে হাসছে। খুশির মত আসন্ন অপেক্ষায় হাসছে। আসন্ন নবীন পাতার সংবাদে। একটি কুঁড়ির সংবাদে।

দু'হাত বাড়িয়ে রিণাকে বুকে নিয়ে এল আশরাফ। মসৃণ কপালে চুমু খেল—রিণা এই মুহূর্তে হয় তো তুমিই আমাকে পথ দেখালে। আমার এ বাগানে নিশ্চয়ই অনেক সবুজ কুঁড়ি সবুজ পাতা হাসবে। আমি বাগানি ছেড়ে যাবো না রিণা। নতুনের কথা ভাবব।

রেজিগনেশান লেটারটা ছিঁড়ে ফেলে. নতুন করে চিঠি লিখতে বসল আশরাফ নতুন প্ল্যানটেশানের জন্য। লণ্ডন অফিসে।

এগারো

লণ্ডন থেকে পারমিশন নিয়ে চিঠি এসেছে। পুরোন বাগানের কিছু অংশে নতুন বাগান বসান হবে। পৌষের মিষ্টি রোদ কুলিদের কলরবে মুখর। হরিয়া ভারি খুশি। কুলির খাতায় নাম উঠে গেছে তার। একটা টিলায় পুরোন গাছগুলো তুলে ফেলার কাজ শেষ হয়েছে। জঙ্গল কেটে বাগানের সীমানাও বাড়ান হচ্ছে। জঙ্গল সাফ করা হবে। মাটি তৈরি হবে। তরপর বর্ষায় নতুন চারা লাগানর কাজ চলবে। বেকার কুলিরা সবাই প্রায় কাজ পেয়ে গেছে। হরিয়া সবার সঙ্গে বাগান পরিষ্কার করছে। ডরিশ আর লুবেক গাছের পাতা ঝরিয়ে শির শির করে বইছে শীতের বাতাস। ঝোপ ঠেলে চামেলী এল—এই হরিয়া দুপুরের ছুট্টি হয়ে গেল। তুই এখনও কাম করছিস। নতুন কামে এসে ভারি ফুর্তি দেখছি তোর!

ঝুড়ি নিড়ানী নিয়ে উঠে দাঁড়াল হরিয়া। তাইত। বাগান যে খালি। সবাই দুপুরের ছুট্টি করতে চলে গেছে। চামেলীর সঙ্গে বাগানের বাইরে এল হরিয়া।

মালখানা গাছের ধারে বসে পড়ল চমেলী। বলল—বস। খাবার এনেছিস?

হরিয়া বসল। মাথা নেড়ে বলল—না। এখনও হফ্তার তলব পাইনি। এখন তো গরু চরাই না। কেউ আর আটা দেয় না। অর্জুন কাকার বউ একটা করে রুটি দেয় রোজ তাই খাই।

চামেলী খাবারের পোটলা খুলতে খুলতে বলল—তুই তো নতুন কুলি। মহাজন এখন তোকে কর্জও দেবে না।

হরিয়া শীতের মৃদু রোদ মাখা আকাশে তাকাল। চারিদিকে পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে বাতাস। এক ঝাঁক মুনিয়া নানা রঙের ঝলক নিয়ে লাফা-লাফি করে উড়ছে মালখানা গাছের ডালে।

হরিয়া বলল—আমি কোনদিন কর্জ নিয়ে খাবো না দেখিস। পাট্টায় যাবো না। অনেক টাকা জমাব। বাগান থেকে জমিন পেলে গরু কিনব। লাঙল কিনব।

চামেলী হাসতে শুরু করল - সবাই তাই বলে। তারপর আস্তে আস্তে বদলে যায়। পাট্টা আর মহাজনের দোকানে বাঁধা পড়ে।

পোটলা খুলে ভুট্টার ছাতু এগিয়ে দিল চামেলী—খা হরিয়া।

হরিয়া এক মুঠো ছাতু মুখে দিয়ে উদাস হয়ে গেল। শিরশিরে শীতের বাতাস নিঃশব্দে শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন ঘুঘু ডাকছে। শীতের দুপুরটা এখন ভারি নিস্তব্ধ। হরিয়া ভাবল কেন সবাই একরকম হয়ে যায়। মহাজন আর পাট্টায় বাঁধা পড়ে। অর্জুন কাকা তো বলেছিল যে নতুন চারা বসিয়ে নতুন বাগান তৈরি হবে। নতুন বাগানে না কি অনেক ভালো পাতা উঠবে। অনেকদিন ধরে পাতা তুলতে থাকলে সে গাছ কম-জোর হয়ে যায়। ভালো পাতা দিতে পারে না। তাই নতুন করে বাগান বসান হচ্ছে। আচ্ছা কুলিদের জীবনটাও কি ওই পাট্টার নেশা আর মহা-জনের ধারের মাটি থেকে উপড়ে তুলে নতুন করে শুরু করা যায় না ?

খাওয়া শেষ করে চামেলী বলল—এই হরিয়া। তুই তো খুব ভাল গান গাইতে পারিস। এবার টুসুর পরবে গান গাইবি না ? আমাদের পাড়ায় টুসু দেওতা তৈরি হয়ে গেছে। এবার পরবে আমি আর তুই কিন্তু কম্‌লীর চুয়ানী খাবো নাচব।

হরিয়া উৎসাহিত হল না—আমি চুয়ানী হাঁড়িয়া এসব কোনদিন খাব না।

চামেলী খিল খিল করে হাসল—তবে কি খাবি? সাহেবদের পাগলা পানি ?

হরিয়া মুখ ফিরিয়ে তাকাল—না। ওসব কিছু খাব না। তুইও খাবি না।

চামেলী আবার হাসল—নতুন কাম পেয়ে তোর মাথাটা গরম হয়ে গেছে। হাঁড়িয়া চুয়ানী না খেলে তো দুদিনেই শরীর ভেঙে যাবে। কাম করবি কেমন করে ?

—কাম ঠিকই করব। শরীর আমার ভাঙবে না। তুইও আর ওসব খাবি না।

চামেলী অবাক হয়ে তাকাল হরিয়ার দিকে। তার মনে হল হরিয়া সত্যি অনেক বড় হয়ে গেছে। হরিয়া আর আগের মত নেই। তাকে যেন ঠিক চিনতে পারছে না চামেলী।

বাগানে কাজ বন্ধ। টুসু পরবের ছুটি। টুসু তৈরি করা হয়েছে অনেক যত্নে। ছোট্ট দোলায় ছোট আকৃতির জোড়া ঠাকুর বসিয়ে পথে বের হল সবাই। টুসু ঠাকুরের দোলার পাশে হাঁটতে হাঁটতে চিকন সুরে গান ধরল মেয়েরা—

টুসু আয় না দেশে।
রাঙা চরণ দুটি ধুয়াবো গো
মাথার কেশে।
অর্ঘ দিব নয়ন জলে
পূজা দিব বনফুলে গো......॥

টুসুর মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে চোখজোড়া সজল হয়ে উঠল হরমতীর। সত্যি বনফুল আর চোখের জল ছাড়া আর কি আছে তাদের। প্রতি বছর টুসু দেবী আসে। মাথার কেশের পরিচর্যার প্রতিশ্রুতি নয়নের জল আর বন কুসুমের অর্ঘের দীনতায় এক বছরের জন্য অভিমানভরে বিদায় নেয়। ছেঁড়া শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল হরমতী। দলের পেছনে ছেঁড়া ময়লা জামা পরা ছেলে-মেয়ের দল মহা উৎসাহে খুশি মুখে হাঁটছে। বড় সাহেবের বাংলো, ছোট সাহেবের বাংলো, বাবু পাড়া সব জায়গায় টুসু দেখিয়ে বখশিস নিল মেয়েরা। তারপর টুসুকে পোড়াতে নিয়ে যাওয়া হল। এক বছর পরে আবার সুখ সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে টুসু দেবী আসবে। গান গাইতে গাইতে চলল সবাই। রজর মা টুসু পোড়ান দেখে পুণ্য অর্জন করবার আশায় অনেকটা পথ হেঁটে এসেছিল। অবসন্ন হয়ে চা গাছের ধারে বসে পড়ল। টুসুর গান ছড়িয়ে পড়ছে কমলা রংয়ের শীত বিকেলের বাতাসে। এবার বর্ষা চলে যাবার পর থেকে রজর মার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। একটু কাজ করলেই বুক ধড়ফড় করে। হাত-পা জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা নিয়ে ভারি হয়ে আসে। ভয়ে ডাক্তারখানায় যায় না রজর মা। ডাক্তার সাহেব যদি তাকে পুরোপুরি সিকম্যানের চিঠি দিয়ে দেয়। তখন খাবে কি সে? সর্দার তো সেদিন টিলাবাবুকে বলেছে—বুড়িয়াটাকে খাতা থেকে নাম কাটাইয়ে দ্যান বাবু। উ একদম কাম করতে পারে না।

সন্ধ্যা নামছে। দূর থেকে টুসু পোড়ানর উৎসবের হৈ চৈ ভেসে আসছে। টুসু দেখানোর বখশিসের টাকা দিয়ে সন্ধ্যায় সবাই চুয়ানী খাবে। নাচ গান ফুর্তি করবে। রজর মা উঠে দাঁড়াল। বাড়িতে বুড়টা একা আছে। পেটভরে না খেয়ে বুড়টাটা যেমন দুর্বল হয়েছে তেমন হয়েছে খিটখিটে। কিন্তু ঘরে যে তার একমুঠো ছাতুও নেই আজ। রজর মার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। যোয়ান ছেলেটা আজ ঘরে থাকলে আর কিছু না হোক এক বোঝা কাঠ কেটে বিক্রি করে দিলেও চলত। মহাজনের দোকানটা একবার হয়ে যাবে না কি ? যদি কিছু চাল কর্জ পাওয়া যায়। শরীরটা ঝিম-ঝিম করছে। সকালে হাঁড়ি ঝেড়ে একমুঠো চালভাজা বের করেছিল। তা তো বুড়োই খেয়ে ফেলেছে। দুর্বল পায় উঠে দাঁড়াল রজর মা। সংগে সংগে বুকের মধ্যে কেমন ফিক ধরা ব্যথায় চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। রজর মার মনে হল চোখের সামনে থেকে কুয়াশা নামা বিকেলটা কেমন অচেনা ঘোলাটে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। অবশ হয়ে আসা দুহাতে একটা চা গাছকে আঁকড়ে ধরল রজর মা। চোখের সামনে আলোর রশ্মি কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল।

টুসু পুড়িয়ে হৈ চৈ করতে করতে ফিরছিল সবাই। চঞ্চলাই প্রথম দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। চা গাছের ঝোপের ওপর মানুষের মত ওটা ঝুলে আছে কি ? ততক্ষণে আর সকলে দেখতে পেল। বিন্দিয়া একটু কাছে এগিয়ে বলল -আরে এ যে রজর মা।

বিন্দিয়া অবাক হল। দুহাতে গাছ জড়িয়ে গাছের ওপর মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। কি হয়েছে রজর মার। বিন্দিয়া রজর মার গায় হাত দিয়ে ডাকল—হেই মাসী।

সংগে সংগে চিৎকার করে সরে এল সে। সবাই ছুটে এসে ঘিরে ধরল চারিদিক থেকে। ব্যাপারটা বুঝতে কারো বাকি রইল না। কিন্তু এ কি অদ্ভুত ভঙ্গীর মৃত্যু! মনে হয় চা গাছকে জড়িয়ে চা গাছের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে রজর মা।

পৌষ ফাল্গুন বৈশাখ কেটে গেল। বর্ষা এসে আকাশ নীল মেঘে ভরিয়ে দিল। এবার বর্ষা শুরু হল তাড়াতাড়ি। নার্সারীতে নতুন চারা তোলা হচ্ছে। বীজ ভাসছে জলে। চারা উঠছে। নার্সারী পেরিয়ে রোপিত হচ্ছে নতুন মাটির বুকে। পুরোন গাছ আর নেই। নতুন চারা আগামী সম্ভাবনায় সূর্যের আলোয় তাকিয়ে থাকে। নতুন কুলি হরিয়া পাতার ডালে তাই পাততি তুলতে তুলতে মাথা তুলে আকাশ দেখে। রজ এসে রজর বাবাকে নিয়ে গেছে। রজর মায়ের ঘরখানা পেয়েছে হরিয়া। দুটো পাতা একটা কুঁড়ি তুলতে তুলতে হরিয়া স্বপ্নে ডুবে যায়। আর

একটা ঘর তুলবে সে। তারপর চামেলী আসবে তার ঘরে। রঙিন মাটির নকশা তুলবে মাটির দেওয়ালে। হরিয়া একজোড়া বলদ কিনবে। চাষের জমি হবে তার। হরিয়ার সরু হাতের আঙুল অনভ্যস্ত দ্রুততায় পাতা তোলে।

হরিয়া পাতা তুলছে।

হরিয়ার হাত আশান্বিত।

হরিয়া পাতা তুলছে।

হরিয়ার হাত দৃপ্ত যৌবনমত্ত।

হরিয়া পাতা তুলছে। হরিয়ার হাত শ্রান্ত।

হরিয়া পাতা তুলছে।

হরিয়ার হাত অবসন্ন। হরিয়া তবু পাতা তুলছে।

হরিয়ার হাত দু'টোতে যুগ-যুগান্তরের ক্লান্তিভর করছে।

শিরদাঁড়া বাঁকা প্রৌঢ় হরিয়া মাথা নীচু করে ঘাড় গুঁজে পাতা তোলে। হরিয়া এখন সোজা হয়ে ওপরে তাকাতে ভুলে গেছে। হরিয়া দাঁড়িয়ে আছে সেই পুরোন মাটিতে। হরিয়ার পরণে ছেঁড়া ধুতির টুকরো। সারাদিনে পেটে পড়েছে এক পেয়ালা লবণ গোলা রং চা। আর একমুঠো ছাতু। কাল হরিয়া তলব পাবে। তার সবটাই চলে যাবে মহাজনের কাছে আর পাট্টায়। হরিয়ার অনেক ধার। হরিয়ার ছেলেটা বাগানের গরুর পাল নিয়ে জঙ্গলে চরায়। চামেলী পাতা তোলে। আঙুল কেটে ঝরলে চায়ের পাতা ছিঁড়ে ঘসে দেয় আঙুলে। তবু ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে। জড়িয়ে যায় দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ শরীরে। চামেলীর হাতের রক্ত ঝরে বাংলাদেশে, ভারতে, শ্রীলংকায়। চায়ের পেয়ালায়।